মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত

রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত

[পঞ্চম রাজসংস্করণ]

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
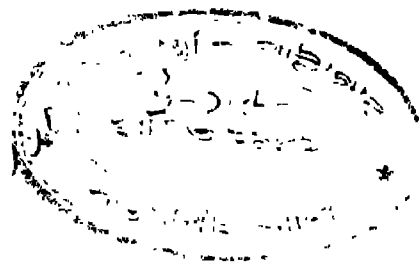
বিদ্যানোৎসাহী, সংযতমনা, উদারচরিত্র,

কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দত্ত

প্রিয় ভ্রাতঃ!

ইউরোপ হইতে তুমি যে নানা ভাষা ও নানা বিদ্যা আহরণ করিয়া আসিয়াছ, তাহা যখন চিন্তা করি, তখনই আনন্দিত হই। কিন্তু তুমি ইহা অপেক্ষাও অমূল্য রত্নের অধিকারী। সে রত্ন, নির্ম্মল উদারচরিত্র, মনঃসংযমে অসাধারণ ক্ষমতা, বিদ্যানুচর্চ্চায় আনন্দনীয় উৎসাহ ও জীবনব্যাপী চেষ্টা।

এই অসাধারণ সদ্গুণ-সমূহ দ্বারা স্বদেশের মঙ্গলসাধন কর, ভ্রাতার এই মঙ্গলেচ্ছা। ভ্রাতার জীবনব্যাপী স্নেহের সামান্য নিদর্শন-স্বরূপ এই পুস্তকখানি তোমাকে অর্পণ করিতেছি।

দক্ষিণ শাহবাজপুর, }
১২৮৪ বঙ্গাব্দ }

তোমার চিরস্নেহাভিলাষী
শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত

মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত

প্রথম পরিচ্ছেদ

জীবন-ঊষা

দেও করতালি, জয় জয় বলি,
করিয়া অঞ্জলি কুসুম লহ।
ঐ যে প্রাচীতে, হাসিতে হাসিতে
উদয় অরুণ উষার সহ॥

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে মুহম্মদ ঘোরী আর্য্যাবর্ত্ত প্রদেশ জয় করেন। সেই বিপুল ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্য অধিকার করিয়া মুসলমানেরা এক শতাব্দী ক্ষান্ত থাকিল, বিন্ধ্যাচল ও নর্ম্মদারূপ বিশাল প্রাচীর ও পরিখা পার হইয়া দাক্ষিণাত্য জয় করিবার কোন উদ্যম করে নাই। অবশেষে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে দিল্লীর যুবরাজ আলাউদ্দীন খিলিজী অষ্ট সহস্র অশ্বারোহী সেনার সহিত নর্ম্মদা নদী পার হইলেন, এবং সহসা হিন্দু-রাজধানী দেবগড়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেবগড়ের রাজপুত্র বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আলাউদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তুমুল সংগ্রামে হিন্দুসেনা পরাস্ত হইল,

এবং হিন্দুরাজা বহু অর্থ ও ইলিশপুর প্রদেশ প্রদান করিয়া সন্ধি ক্রয় করিলেন। পরে আলাউদ্দীন দিল্লীর সম্রাট্ হইলে তাঁহার সেনাপতি মালীক কাফুর তিনবার দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিয়া নর্ম্মদাতীর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করেন। দেবগড় প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজ্য দিল্লীর মুসলমান-সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিল।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মহম্মদ টোগলক দিল্লীর সম্রাট্ হইয়া রাজধানী দিল্লী হইতে দেবগড়ে আনিবার প্রয়াস করেন, এবং দেবগড়ের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া দৌলতাবাদ রাখিলেন। কিন্তু দক্ষিণের হিন্দু ও মুসলমান সকলে বিরক্ত হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। হিন্দুগণ বিজয়নগরে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া, একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিল, এবং মুসলমানগণ দৌলতাবাদে একটি স্বতন্ত্র মুসলমানরাজ্য স্থাপন করিল। কালক্রমে বিজয়নগর ও দৌলতাবাদ দাক্ষিণাত্যের মধ্যে দুইটি প্রধান রাজ্য হইয়া উঠিল। প্রায় তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত দিল্লীর সম্রাট্গণ দাক্ষিণাত্য হস্তগত করিবার আর কোন চেষ্টা করেন নাই।

কিন্তু দিল্লীর উপদ্রব হইতে নিস্তার পাইলেও দক্ষিণে হিন্দুসাম্রাজ্য বিপদ্শূন্য ছিল না। হিন্দুগণ গৃহের মধ্যে দৌলতাবাদস্বরূপ মুসলমান রাজ্যকে স্থান দিয়াছিল। সে সময়ে হিন্দুদিগের জাতীয় জীবন ক্ষীণ ও অবনতিশীল, বিজয়ী মুসলমানদিগের জাতীয় জীবন উন্নতিশীল ও প্রবল; সুতরাং একে অন্যের ধ্বংসসাধন করিল। কালক্রমে দৌলতাবাদরাজ্য বর্দ্ধিতায়তন হইয়া খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইল ও একটির স্থানে বিজয়পুর, গলখন্দ ও আহম্মদনগর নামক তিনটি মুসলমানরাজ্য হইয়া উঠিল। তখন মুসলমান-রাজগণ একত্র হইয়া ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে

তেলিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগরের সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া সেই হিন্দু-রাজ্যের লোপসাধন করিলেন। এইরূপে দাক্ষিণাত্যে হিন্দু-স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল; বিজয়পুর, গলখন্দ ও আহম্মদনগর নামক তিনটি মুসলমান-রাজ্য প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া উঠিল; কর্ণাট ও দ্রাবিড়ের হিন্দু-রাজগণও ক্রমে বিজয়পুর ও গলখন্দের অধীনতা স্বীকার করিলেন।

১৫৯০ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ আকবর পুনরায় সমগ্র দাক্ষিণাত্য দিল্লীর অধীনে আনিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই সমস্ত খন্দেশ ও আহম্মদনগর-রাজ্যের অধিকাংশ দিল্লী-সৈন্যের হস্তগত হয়। তাঁহার পৌত্র শাহজিহান ১৬৩৬ খৃঃ অব্দের মধ্যে সমগ্র আহম্মদনগর-রাজ্য অধিকার করেন, সুতরাং এই আখ্যায়িকাবিবৃতকালে দাক্ষিণাত্যে কেবল বিজয়পুর ও গলখন্দ এই দুইটি পরাক্রান্ত স্বাধীন মুসলমান-রাজ্য ছিল।

এই সমস্ত রাজ্যবিপ্লবের মধ্যে দেশীয় লোকদিগের অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয়দিগের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা আমাদিগের জানা আবশ্যক। মুসলমান-রাজ্যের অধীনে অর্থাৎ আহম্মদনগর, বিজয়পুর ও গলখন্দের অধীনে হিন্দুদিগের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। বস্তুতঃ, মুসলমান-দিগের দেশশাসন-কার্য্য অনেকটা মহারাষ্ট্রীয় বুদ্ধিবলেই পরিচালিত হইত। প্রত্যেক রাজ্য কতকগুলি সরকারে, ও প্রত্যেক সরকার কতকগুলি পরগণায় বিভক্ত ছিল। সেই সমস্ত সরকার ও পরগণায় কখন কখন মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইতেন, কিন্তু অধিক সময়ে মহারাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারিগণই কর আদায় করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতেন। মহারাষ্ট্রদেশ পর্ব্বতসঙ্কুল, এবং পর্ব্বতচূড়ায় অসংখ্য দুর্গ নির্ম্মিত ছিল। মুসলমান-সুলতানগণ সেই সকল পার্ব্বত্য দুর্গও মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে রাখিতে সঙ্কুচিত হইতেন

না, এবং মহারাষ্ট্রীয় কিল্লাদারগণ প্রায়ই জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তাহারই আয় হইতে দুর্গরক্ষার জন্য আবশ্যকীয় ব্যয় করিতেন। এই সমস্ত কিল্লাদার ও দেশমুখ ভিন্ন অনেক হিন্দু মনসবদার রাজদরবারে নিয়োজিত থাকিতেন, তাঁহারা শত, কি দ্বিশত, কি পঞ্চশত, কি সহস্র, কি তদধিক অশ্বারোহীর সেনাপতি, সুলতানের আদেশ মতে সেই পরিমাণ সৈন্য লইয়া যুদ্ধসময়ে উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিলেন। তাঁহারাও সৈন্যের বেতন ও আবশ্যকীয় ব্যয়ের জন্য এক একটি জায়গীর ভোগ করিতেন।

বিজয়পুরের সুলতানের অধীনে চন্দ্ররাও মোরে দ্বাদশ সহস্র পদাতিকের সেনাপতি ছিলেন। তিনি সুলতানের আদেশে নীরা ও বার্ণা নদীর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন; সুলতান পরিতুষ্ট হইয়া সেই দেশ চন্দ্ররাওকে অল্পমাত্র কর ধার্য্য করিয়া জায়গীরস্বরূপ দান করেন; এবং চন্দ্ররাওয়ের সন্তান-সন্ততিগণ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত রাজা খেতাবে সেই প্রদেশ স্বচ্ছন্দে সুশাসন করেন। এইরূপ রাওনায়েক নিম্বালকরবংশীয়েরা পুরুষানুক্রমে ফুলতন দেশের দেশমুখ হইয়া সেই দেশ শাসন করেন। এইরূপে মল্লরী প্রদেশে, মুশ্বর প্রদেশে, কাপসী ও মুধোল দেশে, ঝট্টু প্রদেশে ও ওয়ারি প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় বংশ অবস্থান করিতেন। তাঁহারা ঐ সকল প্রদেশে পুরুষানুক্রমে বিজয়পুরের সুলতানের কার্য্যসাধন করিতে থাকেন, ও সময়ে সময়ে আপনাদিগের মধ্যেও তুমুল সংগ্রাম করিতেন। জ্ঞাতি-বিরোধের ন্যায় আর বিরোধ নাই, সুতরাং পর্ব্বতসঙ্কুল কঙ্কণ ও মহারাষ্ট্র-প্রদেশে সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বকালেই স্থানীয় বড় বড় বংশীয়দিগের মধ্যে আত্মবিরোধ দৃষ্ট হইত। বহু শোণিতপাত হইলেও সেগুলি কুলক্ষণ নহে, সেগুলি সুলক্ষণ। পরিচালনার দ্বারা আমাদের শরীর যেরূপ সুবদ্ধ ও দৃঢ়ীকৃত হয়, কার্য্য, উপদ্রব ও বিপর্য্যয় দ্বারা জাতীয়

বল ও জাতীয় জীবন সেইরূপ রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয়। এইরূপে মহা-রাষ্ট্রীয় জীবন-উষার প্রথম রক্তিমচ্ছটা শিবজীর আবির্ভাবের অনেক পূর্ব্বেই ভারত-আকাশ রঞ্জিত করিয়াছিল।

আহম্মদনগরে স্থলতানের অধীনে যাদবরাও ও ভঁসলা নামক দুইটি পরাক্রান্ত বংশ ছিল। সিন্ধুক্ষীরের যাদবরাওয়ের ন্যায় পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রবংশ সমস্ত মহারাষ্ট্র প্রদেশে আর কোথাও ছিল না, এবং অনেকে বিবেচনা করেন, দেবগড়ের প্রাচীন হিন্দু রাজবংশ হইতেই এই পরাক্রান্ত বংশ সমুদ্ভূত। ভঁসলাবংশ যাদবরাওয়ের ন্যায় উন্নত না হইলেও একটি প্রধান ও ক্ষমতাশালী বংশ ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। এই স্থানে এইমাত্র বলা আবশ্যক যে, যাদবরাওয়ের বংশ হইতে শিবজীর মাতা ও ভঁসলা-বংশ হইতে তাঁহার পিতা সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রঘুনাথজী হাবিলদার

কাঞ্চন জিনিয়া তার অঙ্গের বরণ।
শ্রবণ তাহার দিব্য পঙ্কজ নয়ন॥
শ্রবণে কুণ্ডলযুগ্ম দীপ্ত দিনকর।
অভেদ্য কবচে আবরিল কলেবর॥
দুই দিকে দুই তূণ বামে ধরে ধনু।
আজানুলম্বিত ভুজ অনিন্দিত তনু॥

কাশীরাম দাস।

কঙ্কণপ্রদেশে বর্ষাকালে প্রকৃতি অতি ভীষণ রূপ ধারণ করে; ১৬৬৩ খৃঃ অব্দের বসন্তকালের একদিন সায়ংকালে সেইরূপ ঘোরঘটা দৃষ্ট হইয়াছিল। সূর্য্য এখনও অস্ত যায় নাই, অথচ সমস্ত আকাশ দীর্ঘবিলম্বী অতি কৃষ্ণ মেঘরাশিতে আবৃত, চারিদিকে পর্ব্বতশ্রেণী ও অরণ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। পর্ব্বতে, উপত্যকায়, অরণ্যমধ্যে, প্রান্তরে, আকাশ বা মেদিনীতে শব্দমাত্র নাই। যেন অচিরে প্রচণ্ড বাত্যা আসিবে জানিয়া সমস্ত জগৎ ভয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। নিকটস্থ পর্ব্বতের উপর দিয়া গমনাগমনের পথগুলি ঈষৎ দেখা যাইতেছে, দূরস্থ বিশাল পাদপাবৃত পর্ব্বতগুলি গাঢ়তর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে, আর নীচে উপত্যকা অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে।

পর্ব্বত-প্রবাহিনী জলপ্রপাতগুলি কোথাও রৌপ্যগুচ্ছের ন্যায় দেখা যাইতেছে, কোথাও অন্ধকারে লীন হইয়া কেবল শব্দমাত্রে আপন পরিচয় দিতেছে।

সেই পর্ব্বত-পথের উপর দিয়া একমাত্র অশ্বারোহী বেগে অশ্বচালন করিয়া যাইতেছিলেন। অশ্বের সমস্ত শরীর ফেনপূর্ণ ও ঘর্ম্মাক্ত। অশ্বারোহীর বেশ কর্দ্দমময়, দেখিলেই বোধ হয়, তিনি অনেক দূর হইতে আসিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বর্শা, কোষে অসি, বাম-হস্তে বল্‌গা ও বাম-বাহুতে ঢাল, পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষ রাজস্থানদেশীয়। অশ্বারোহীর বয়ঃক্রম অষ্টাদশবর্ষ হইবে, অবয়ব উন্নত ও গৌরবর্ণ, কিন্তু পরিশ্রম ও রৌদ্র-উত্তাপে এই বয়সেই তাঁহার মুখমণ্ডলের উজ্জ্বল বর্ণ কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ হইয়াছে। শরীর সুবদ্ধ ও দৃঢ়ীকৃত, ললাট উন্নত, চক্ষুর্দ্বয় জ্যোতিঃপূর্ণ। মুখমণ্ডল ঔদার্য্যব্যঞ্জক ও অতিশয় তেজঃপূর্ণ। যুবক অশ্বকে অল্প বিশ্রাম দিবার জন্য লম্ফ দিয়া ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন, বল্‌গা বৃক্ষোপরি নিক্ষেপ করিলেন, বর্শা বৃক্ষশাখায় হেলাইয়া রাখিলেন ও হস্ত দ্বারা ললাটের ঘর্ম্ম মোচন করিয়া নিবিড়কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ পশ্চাদ্দিকে সরাইয়া ক্ষণেক আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আকাশের আকৃতি অতি ভয়ানক, অচিরাৎ তুমুল বাত্যা আসিবে, তাহার সংশয় নাই। মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে আরম্ভ হইতেছে এবং অনন্ত পর্ব্বত ও পাদপশ্রেণী হইতে গভীর শব্দ উত্থিত হইতেছে। দুই একটি স্তিমিত মেঘগর্জ্জন শুনা যাইতেছে এবং যুবকের শুষ্ক ওষ্ঠে দুই এক বিন্দু বৃষ্টিজলও পতিত হইল। এখন যাইবার সময় নহে, আকাশ পরিষ্কার হওয়া পর্য্যন্ত কোথাও অপেক্ষা করা উচিত, কিন্তু যুবকের চিন্তা করিবার সময় ছিল না। তিনি যে কার্য্যে আসিয়াছিলেন, তাহাতে বিলম্ব সহে না, তিনি যে প্রভুর কার্য্য করিতেছেন, তিনি

কোন আপত্তি শুনেন না, যুবকেরও বিলম্ব বা আপত্তি করার অভ্যাস নাই, পুনরায় বর্শা হস্তে লইয়া লম্ফ দিয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে উঠিলেন, আর এক মুহূর্ত্ত আকাশের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, পরে পুনরায় বেগে অশ্বচালন করিয়া সেই নিঃশব্দ পর্ব্বত-প্রদেশের সুপ্ত প্রতিধ্বনি জাগরিত করিয়া চলিলেন।

অল্পক্ষণমধ্যেই ভয়ানক বাত্যা আরম্ভ হইল। আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুল্লতা চমকিত হইল। মেঘের গর্জ্জনে সেই অনন্ত পর্ব্বতপ্রদেশ যেন শতবার শব্দিত হইল। অচিরাৎ কোটি রাক্ষস-বল বিদ্রূপ করিয়া ভীষণ-গর্জ্জনে পবন প্রবাহিত হইয়া যেন সেই অনন্ত পর্ব্বতকেও সমূলে আলোড়িত করিতে লাগিল। শত পর্ব্বতের অসংখ্য পাদপশ্রেণী হইতে কর্ণভেদী শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল, জলপ্রপাত ও পর্ব্বত-তরঙ্গিণীর জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে বিকীর্ণ হইতে লাগিল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ-আলোকে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রকৃতির এই ঘোর বিপ্লব দৃষ্ট হইতে লাগিল, ও মধ্যে মধ্যে বজ্রশব্দে জগৎ কম্পিত ও স্তব্ধ হইতে লাগিল। ত্বরায় মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িয়া পর্ব্বত, অরণ্য ও উপত্যকা প্লাবিত করিল, জলপ্রপাত ও তরঙ্গিণী সমুদয়কে স্ফীতকায় ও উচ্ছলিত করিয়া তুলিল।

অশ্বারোহী কিছুতেই প্রতিরুদ্ধ না হইয়া সাবধানে চলিতে লাগি-লেন। সময়ে সময়ে বোধ হইল যেন অশ্ব ও অশ্বারোহী বায়ুবেগে পর্ব্বত হইতে সজোরে নীচে নিক্ষিপ্ত হইবে। বায়ুপীড়িত বৃক্ষশাখার সজোর আঘাতে অশ্বারোহীর উষ্ণীব ছিন্ন হইল, তাঁহার ললাট হইতে দুই এক বিন্দু রুধির পড়িতে লাগিল, তথাপি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাতে অপেক্ষা করা দুঃসাধ্য, সুতরাং যুবক মুহূর্ত্তমাত্রও চিন্তা না করিয়া যতদূর সাধ্য, সতর্কভাবে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। দুই

তিন দণ্ড মুষলধারায় বৃষ্টি হওয়াতে ক্রমে আকাশ পরিষ্কার হইতে লাগিল, অচিরাৎ বৃষ্টি থামিয়া গেল। অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যের আলোকে সেই পর্ব্বতরাশি ও নবস্নাত বৃক্ষসমূহের চমৎকার শোভা দৃষ্ট হইল।

যুবক দুর্গে উপস্থিত হইয়া একবার অশ্ব থামাইলেন ও সিক্ত কেশ-গুচ্ছ পুনরায় সুন্দর প্রশস্ত ললাট হইতে অপসৃত করিয়া নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। যত দূর দেখা যায়, দুই তিন সহস্র উন্নত পর্ব্বত-শিখরগুলি শোভা পাইতেছে, ও সেই পর্ব্বতসমূহের পার্শ্বে, মস্তকে, চারিদিকে নবস্নাত, নিবিড় হরিদ্বর্ণ অনন্ত পাদপশ্রেণী সূর্য্যালোকে চিক্-চিক্ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে জলপ্রপাত দশগুণ স্ফীতকায় হইয়া বর্দ্ধিত-গৌরবে শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গান্তরে নৃত্য করিতেছে, ও সূর্য্যের সুবর্ণ রশ্মিতে বড় সুন্দর ক্রীড়া করিতেছে। পর্ব্বত ও শিখরের উপর সূর্য্যরশ্মি নানাবর্ণ ধারণ করিয়াছে, জলপ্রপাতের উপর রামধনু খেলা করিতেছে, আকাশে প্রকাণ্ড ধনু নানাবর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে, ও বহুদূরে বায়ু দ্বারা তাড়িত হইয়া মেঘরাশি বৃষ্টিরূপে গলিত হইতেছে।

যুবক ক্ষণমাত্র এই শোভায় মুগ্ধ রহিলেন; পরে সূর্য্যের দিকে অবলোকন করিয়া শীঘ্র দুর্গের উপর উঠিতে লাগিলেন। অচিরে আপন পরিচয় দিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন। তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, অমনি ঝন্‌ঝনা শব্দে দুর্গদ্বার রুদ্ধ হইল।

দ্বাররক্ষকগণ দ্বার বন্ধ করিয়া যুবকের দিকে চাহিয়া কহিলেন, অধিক সকালে পৌঁছেন নাই; আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে অদ্য রাত্রে প্রাচীরের বাহিরে অতিবাহিত করিতে হইত।

যুবক। সেই এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় নাই; ভবানীর প্রসাদে প্রভুর

নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা রাখিব, অদ্যই কিল্লাদারের নিকট প্রভুর আদেশ জানাইতে পারিব।

দ্বাররক্ষক। কিল্লাদারও আপনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন।

যুবক তৎক্ষণাৎ কিল্লাদারের প্রাসাদে যাইলেন, ও সম্যক্ অভিবাদন করিয়া নিজ কটিদেশ হইতে বন্ধন খুলিয়া কতকগুলি লিপি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। কিল্লাদার মাউলীজাতীয় একজন শিবজীর বিশ্বস্ত যোদ্ধা, তিনি লিপিগুলির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, দূতের দিকে না চাহিয়াই মনোনিবেশ পূর্ব্বক সেইগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন।

দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধারম্ভ, যুদ্ধের আধুনিক অবস্থা, কিরূপে কিল্লাদার শিবজীর বিশেষরূপে সহায়তা করিতে পারেন, ও কোন্ বিষয়ে শিবজীর কি কি আদেশ, লিপিপাঠে সমস্ত অবগত হইলেন। অনেকক্ষণ সেই লিপি পাঠ করিয়া কিল্লাদার অবশেষে পত্রবাহকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। অষ্টাদশবর্ষীয় যুবকের বালকোচিত উদার মুখমণ্ডল ও আনয়নবিলম্বী গুচ্ছ গুচ্ছ নিবিড় কৃষ্ণ কেশ দেখিয়া কিল্লাদার একবার চকিত হইলেন। লিপির দিকে দেখিলেন, আবার বালক বা যুবার দিকে মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ নয়নদ্বয় উঠাইলেন। অবশেষে বলিলেন,—হাবিলদার! তোমার নাম রঘুনাথজী? তুমি জাতিতে রাজপুত?

রঘুনাথজী বিনীতভাবে শির নামাইয়া প্রশ্নের উত্তর করিলেন।

কিল্লাদার। তুমি আকৃতি ও বয়সে বালকমাত্র। কিন্তু বিবেচনা করি, কার্য্যকালে পরাঙ্মুখ নহ।

রঘুনাথজী। যত্ন ও চেষ্টামাত্র মনুষ্যসাধ্য বোধ হয়, তাহাতে প্রভু আমার ত্রুটি দেখেন নাই। সিদ্ধি ভবানীর ইচ্ছাধীন।

কিল্লাদার। তুমি সিংহগড় হইতে তোরণ-দুর্গে এত শীঘ্র আসিলে কিরূপে?

রঘুনাথজী। প্রভুর নিকটে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।

কিল্লাদার এই উত্তরে পরিতুষ্ট হইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—জিজ্ঞাসা অনাবশ্যক, কার্য্যসাধনে তোমার যেরূপ যত্ন, তোমার আকৃতি তাহার পরিচয় দিতেছে। রঘুনাথজীর সমস্ত বস্ত্র ও শরীর এখনও সিক্ত, ও ললাটের ঈষৎ ক্ষত দেখা যাইতেছিল।

পরে কিল্লাদার সিংহগড়ের ও পুনার সমস্ত অবস্থা, মহারাষ্ট্রীয়, মোগল ও রাজপুতসেনার অবস্থা ও সংখ্যা তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রঘুনাথজী যতদূর পারিলেন, উত্তর দিলেন।

কিল্লাদার বলিলেন,—তবে কল্য প্রাতে আমার নিকট আসিও, আমার পত্রাদি প্রস্তুত থাকিবে। আর প্রভু শিবজীকে আমার নাম করিয়া জানাইও যে, তিনি যে তরুণ হাবিলদারকে এই বিষম কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, সে হাবিলদার কার্য্যের অনুপযুক্ত নহে। এই প্রশংসাবাক্যে রঘুনাথ মস্তক নত করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন।

রঘুনাথজী বিদায় পাইয়া চলিয়া গেলেন। রঘুনাথকে এরূপ পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য এই যে, কিল্লাদার শিবজীকে অতিশয় গূঢ় রাজকীয় সংবাদ ও কতকগুলি গূঢ় মন্ত্রণা পাঠাইবার মানস করিতেছিলেন; সেগুলি লিপির দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, লিপি শত্রুহস্তে পড়িতে পারে। রঘুনাথজীকে সেগুলি বাচনিক বলা যাইতে পারে কি না, অর্থবলে বা কোন উপায়ে শত্রুর বশবর্ত্তী হইয়া গূঢ় মন্ত্রণা শত্রুর নিকট প্রকাশ করা রঘুনাথের পক্ষে সম্ভব কি না, কিল্লাদার তাহাই পরীক্ষা করিতেছিলেন। রঘুনাথ নয়নপথের বহির্ভূত হইলে পর কিল্লাদার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—শিবজী এ বিষয়ে অসাধারণ পণ্ডিত, উপযুক্ত কার্য্যে যথার্থই উপযুক্ত লোক পাঠাইয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সরযূবালা

সজনি! ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঙ্গে তড়িতলতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল॥
আধ আঁচল খসি, আধবদনে হাসি, আধহি নয়ন তরঙ্গ।
আধ উজর হেরি, আধ আঁচর ভরি, তব ধরি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা কনয় কটোরা অতনু কাচল উপাম।
হরি হরি কহ মন, জনু বুঝি ঐছন ফাস পসারল কাম॥
দশন মুকুতাপাতি অধর মিলায়ত মৃদু মৃদু কহ তাহি ভাষা
বিদ্যাপতি কহ, অতবে সে দুঃখ রহ, হেরি হেরি না পূরাল আশা॥

বিদ্যাপতি।

রঘুনাথ কিল্লাদারের নিকট বিদায় পাইয়া ভবানীদেবীর মন্দিরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। এই দুর্গজয়ের অল্পদিন পরে শিবজী ভবানীর একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ও অম্বরদেশীয় অতি উচ্চ কুলোদ্ভব এক ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া দেবসেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে এই দেবীর পূজা না দিয়া কোনও কার্য্যে লিপ্ত হইতেন না।

রঘুনাথ যৌবনোচিত উল্লাসের সহিত আপন কৃষ্ণকেশগুলি নাচাইতে নাচাইতে একটি যুদ্ধগীত মৃদুস্বরে গাইতে গাইতে মন্দিরাভিমুখে আসিতেছিলেন।

যখন মন্দিরের নিকটে আসিলেন তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। পশ্চিমদিকের আকাশের স্তিমিত আলোকে শ্বেতমন্দির সুন্দর শোভা পাইতেছে, মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র উদ্যান প্রায় অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে। মন্দিরের পুরোহিত তখন বাটীতে নাই, সুতরাং রঘুনাথ উদ্যানে একটি প্রস্তরের উপর বসিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার সময়ে সেই উদ্যানে একজন বালিকা ফুল তুলিতে আসিলেন। রঘুনাথ দেখিয়া ঈষৎ বিস্মিত হইলেন। কেন না, বালিকা এ দেশের নহে, পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝিলেন বালিকা রাজপুত। বহুদিন পরে একজন স্বদেশীয় রমণীকে দেখিয়া রঘুনাথের হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, রাজপুত বালিকার নিকটে যাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু রঘুনাথ সে ইচ্ছা দমন করিলেন, বৃক্ষ-তলে সেই প্রস্তরের উপর বসিয়া ক্ষণেক সেই বালিকার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যত দেখিতে লাগিলেন, রঘুনাথের হৃদয় আরও সেই দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

বালিকা অনুমান ত্রয়োদশবর্ষীয়া। তাঁহার রেশমবিনিন্দিত সুমার্জ্জিত অতি কৃষ্ণ কেশপাশ গণ্ডস্থলে ও পৃষ্ঠদেশে লম্বিত রহিয়াছে, এবং উজ্জ্বল মুখমণ্ডল ও ভ্রমরবিনিন্দিত চক্ষুর্দ্বয় কিঞ্চিৎ আবৃত করিয়াছে। ভ্রূযুগল যেন তুলি দ্বারা লিখিত, কি সুন্দর বক্রভাবে ললাটের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে! ওষ্ঠদ্বয় সূক্ষ্ম ও রক্তবর্ণ, হস্ত ও বাহু সুগোল, এবং সুবর্ণের বলয় কঙ্কণ দ্বারা সুশোভিত। কন্যার ললাটে আকাশের রক্তিমচ্ছটা পতিত হইয়া সেই তপ্তকাঞ্চন বর্ণকে সমধিক উজ্জ্বল করিতেছে। কণ্ঠ ও ঈষদুন্নত বক্ষস্থলের উপর একটি কণ্ঠমালা দোদুল্যমান রহিয়াছে। রঘুনাথ অনিমেষলোচনে সেই সায়ংকালের

স্তিমিত আলোকে সেই অপূর্ব্বদৃষ্টা রাজপুতকন্যার দিকে চাহিয়াছিলেন; তাঁহার হৃদয় পূর্ব্বে অননুভূত আনন্দস্রোতে সিক্ত হইতেছিল।

কন্যা ফুল তুলিয়া গৃহে যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, অনতিদূরে একজন দীর্ঘকায় রাজপুত যুবক তাঁহার দিকে অনিমেষলোচনে দেখিতেছেন। ঈষৎ লজ্জায় কন্যার মুখ রঞ্জিত হইল, তিনি মুখ অবনত করিলেন। আবার চাহিয়া দেখিলেন। যুবক তখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ যুবকের উন্নত ললাট ও জ্যোতিঃপূর্ণ নয়নদ্বয় আবৃত করিয়াছে, কোষে খড়্গ, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্শা। যুবক অনিমেষলোচনে তখনও তাঁহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। বহুদিন পরে একজন দেশীয় যোদ্ধাকে এই মহারাষ্ট্র-দুর্গে দেখিয়া রাজপুতবালা প্রথমে বিস্মিত হইলেন, যুবকের আকৃতি ও উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি চকিত হইলেন, মুখমণ্ডল নত করিয়া ফুলের সাজি লইয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তখন রঘুনাথ যেন চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন। মন্দিরের পুরোহিতের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ধীরে ধীরে চিন্তিতভাবে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও পুরোহিতের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে আমরা পাঠককে পুরোহিতের পরিচয় দিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরোহিত অম্বরদেশীয় উচ্চকুলোদ্ভব রাজপুত ব্রাহ্মণ। তাঁহার নাম জনার্দ্দন দেব। তিনি অম্বরের প্রসিদ্ধ রাজা জয়সিংহের একজন সভাসদ্ ছিলেন, পরে শিবজীর বহু অনুরোধে, জয়সিংহের অনুমত্যনুসারে শিবজীর সর্ব্বপ্রথম বিজিত তোরণদুর্গে আগমন করেন। তাঁহার পুত্রকন্যা কেহই ছিল না, কিন্তু স্বদেশত্যাগের অচিরকাল পূর্ব্বেই তিনি এক ক্ষত্রিয়কন্যার লালনপালনের ভার লইয়াছিলেন। কন্যার পিতা জনার্দ্দনের আশৈশব পরমবন্ধু ছিলেন, কন্যার

মাতাও জনার্দ্দনের স্ত্রীকে ভগিনী সম্বোধন করিতেন। কন্যার পিতা-মাতার কাল হওয়ায় নিঃসন্তান জনার্দ্দন ও তাঁহার গৃহিণী ঐ শিশু ক্ষত্রিয়বালার লালন-পালনভার লইলেন, ও তোরণদুর্গে আসিয়া সেই শিশুকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন।

পরে জনার্দ্দনের স্ত্রীর কাল হইলে কন্যা সরযূ ভিন্ন বৃদ্ধের স্নেহের দ্রব্য আর কেহ রহিল না, সরযূবালাও জনার্দ্দনকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন ও ভালবাসিতেন। কালক্রমে সরযূবালা নিরুপমা লাবণ্যবতী হইয়া উঠিলেন, সুতরাং দুর্গের সকলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ জনার্দ্দনকে কণ্ব মুনি ও তাঁহার পালিতা নিরুপমা লাবণ্যময়ী ক্ষত্রিয়বালাকে শকুন্তলা বলিয়া পরিহাস করিতেন। জনার্দ্দনও কন্যার সৌন্দর্য্য ও স্নেহে পরিতুষ্ট হইয়া রাজস্থান হইতে নির্ব্বাসনের দুঃখ বিস্মৃত হইলেন।

দেবালয়ে রঘুনাথ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলে পর জনার্দ্দন দেবমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশৎ বৎসর হইয়াছে, অবয়ব দীর্ঘ ও এখনও বলিষ্ঠ, চক্ষুর্দ্বয় শান্তিরসপূর্ণ, বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহুদ্বয় দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। জনার্দ্দনের বর্ণ গৌর এবং স্কন্ধ হইতে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। পূজকের পবিত্র মন ও সরল হৃদয় তাঁহার মুখ দেখিলেই বোধগম্য হইত। জনার্দ্দন ধীরে ধীরে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া রঘুনাথ সসম্ভ্রমে আসনত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

সংক্ষেপে মিষ্টালাপ করিয়া উভয়ে আসন গ্রহণ করিলেন ও জনার্দ্দন শিবজীর কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। রঘুনাথ যতদূর পারিলেন যুদ্ধের বিবরণ বলিলেন, ও শিবজীর প্রণাম জানাইয়া পূজকের হস্তে কয়েকটি সুবর্ণমুদ্রা দিয়া বলিলেন,—প্রভুর প্রার্থনা যে, তিনি এক্ষণে মোগলদিগের সহিত রণে নিযুক্ত হইয়াছেন, আপনি তাঁহার জয়ের

জন্য ভবানীর নিকটে পূজা করিবেন। দেবীপ্রসাদ ভিন্ন মনুষ্যচেষ্টা বৃথা।

জনার্দ্দন তাঁহার নৈসর্গিক স্থির গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,—সনাতন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য মাদৃশ লোকের চিরকালই যত্ন করা বিধেয়, সেই ধর্ম্মের প্রহরিস্বরূপ শিবজীর বিজয়ের জন্য অবশ্যই পূজা দিব। মহাত্মাকে জানাইও, সে বিষয়ে ত্রুটি করিব না।

রঘুনাথ। দেবীপদে প্রভুর আর একটি আবেদন আছে। তিনি ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার ফলাফল কথঞ্চিৎ পূর্ব্বে জানিবার আকাঙ্ক্ষা করেন। ভবাদৃশ দূরদর্শী দৈবজ্ঞ এ বিষয়ে অবশ্যই তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারেন।

জনার্দ্দন ক্ষণেক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন, পরে পুনরায় গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—রজনীযোগে দেবীপদে শিবজীর বাসনা জানাইব, কল্য প্রাতে উত্তর জানিতে পারিবে।

রঘুনাথ ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে জনার্দ্দন বলিলেন,—তোমাকে ইতিপূর্ব্বে এই দুর্গে দেখি নাই, অদ্য কি এই প্রথম এ স্থলে আসিয়াছ?

রঘুনাথ। অদ্যই আসিয়াছি।

জনার্দ্দন। দুর্গে কাহারও সহিত পরিচয় আছে? থাকিবার স্থান আছে?

রঘুনাথ। পরিচয় নাই, কিন্তু কোন এক স্থানে রজনী অতিবাহিত করিব, কল্য প্রাতেই চলিয়া যাইব।

জনার্দ্দন। কি জন্য অনর্থক ক্লেশ সহ্য করিবে?

রঘুনাথ। প্রভুর অনুগ্রহে কোন ক্লেশ হইবে না, আমাদিগকে সর্ব্বদাই এইরূপে রাত্রি অতিবাহিত করিতে হয়।

জনার্দ্দন। বৎস! যুদ্ধ সময়ে ক্লেশ অনিবার্য্য, কিন্তু অন্য ক্লেশ-সহনের কোন আবশ্যকতা নাই। আমার এই দেবালয়ে অবস্থিতি কর, আমার পালিতকন্যা তোমার খাদ্যের আয়োজন করিয়া দিবে। পরে রাত্রিতে বিশ্রাম করিয়া কল্য শিবজীর নিকটে দেবীর আজ্ঞা লইয়া যাইবে।

রঘুনাথজীর বক্ষঃস্থল সহসা স্ফীত হইল, তাঁহার হৃদয়ে যেন কে সজোরে আঘাত করিল। এ যাতনা, না আনন্দের উদ্বেগ? জনার্দ্দনের পালিতকন্যা কে? তিনি কি সেই পুষ্পোদ্যানে দৃষ্টা লাবণ্যময়ী রাজপুতবালা?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কণ্ঠমালা

মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

ভারতচন্দ্র রায়।

রজনী প্রায় এক প্রহর হইলে সরযূবালা পিতার আদেশে অতিথির খাদ্যের আয়োজন করিয়া দিলেন। রঘুনাথ আসন গ্রহণ করিলেন, সরযূ পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহারাষ্ট্রদেশে অদ্যাবধি আহুত ব্যক্তিকে পরিবারের মধ্যে কোন এক জন রমণী আসিয়া ভোজন করাই-বার রীতি আছে।

রঘুনাথ আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু রঘুনাথের হৃদয় আজি চাঞ্চল্য-পরিপূর্ণ ও অস্থির। সরযূ যত্ন করিয়া অনেক প্রকার আহার প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু রঘুনাথ অদ্য কি খাইলেন, ঠিক জানেন না। জনার্দ্দন ঔৎসুক্য-সহকারে রাজস্থানের কথা কহিতে লাগিলেন, রঘুনাথ সময়ে সময়ে উত্তর দেন, সময়ে সময়ে একটু অন্যমনস্ক হয়েন।

আহার শেষ হইল। শ্বেতপ্রস্তরবিনির্ম্মিত আধারে সরযূ মিষ্ট সরবৎ আনিয়া দিলেন, রঘুনাথ পাত্রধারিণীর দিকে সোদ্বেগচিত্তে চাহিলেন, যেন তাঁহার হৃদয় সে দৃষ্টির সহিত মিলিত হইয়া সেই কন্যার দিকে ধাবমান হইল। চারি চক্ষুর মিলন হইল, সরযূর মুখমণ্ডল লজ্জায় ঈষৎ রক্তবর্ণ হইল, মুখ অবনত করিয়া সরযূ ধীরে ধীরে

সরিয়া গেলেন। রঘুনাথও যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া অধোবদন হইলেন।

হস্তমুখ প্রক্ষালনের জন্য সরযূ জল আনিয়া দিলেন। রঘুনাথ বর্ব্বর নহেন, এবার তিনি মুখ অবনত করিয়া রহিলেন, কেবল সরযূর সুন্দর সুবর্ণবলয়-বিজড়িত হস্ত ও কঙ্কণ-বিজড়িত সুগোল বাহুমাত্র দেখিতে পাইলেন। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

রঘুনাথের শয্যারচনা হইল। রঘুনাথ শয়ন করিলেন না, ঘরের দ্বার ধীরে ধীরে উদ্ঘাটন করিয়া নক্ষত্রালোকে সেই পুষ্পোদ্যানে পদচারণ করিতে লাগিলেন।

সেই গম্ভীর অন্ধকারে নক্ষত্রবিভূষিত নৈশ আকাশের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া অল্পবয়স্ক যোদ্ধা কি চিন্তা করিতেছেন? নিশার ছায়া ক্রমে গভীরতর হইতেছে, সেই সুস্নিগ্ধ ছায়ায় মনুষ্য, জীব, জন্তু, সমগ্র জগৎ সুপ্ত হইয়াছে। দুর্গে শব্দমাত্র নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে প্রহরিগণের শব্দমাত্র শুনা যাইতেছে, ও প্রহরে প্রহরে ঘণ্টারব সেই নিস্তব্ধ দুর্গে ও চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতে প্রতিহত হইতেছে। এ গভীর অন্ধকার রজনীতে রঘুনাথ অনিদ্র হইয়া কি চিন্তা করিতেছেন?

রঘুনাথ অদ্য কেন সেই উদ্যানে পদচারণ করিতেছেন, তাহা রঘুনাথ জানেন না। এতদিন রঘুনাথ বালক ছিলেন, অদ্য যেন সহসা তাঁহার শান্ত, নীল জীবনাকাশের উপর একটি নূতন আলোক উদিত হইল, তাঁহার সুপ্ত চিন্তা ও বেগবতী মনের বৃত্তি সহসা জাগরিত হইল। শতবার সেই রাজপুতবালার আনন্দময়ী মূর্ত্তি তাঁহার মনে আসিতে লাগিল, সেই আলেখ্যলিখিত ভ্রূযুগল, সেই পুষ্পবিনিন্দিত মধুময় ওষ্ঠ, সেই নিবিড় কেশপাশ, সেই সুগোল বাহুযুগল, সেই আয়ত স্নেহপূর্ণ নয়ন, সেই চিত্তহারী অতুল লাবণ্য। রঘুনাথ! এ সুন্দরী কি তোমার

হইবে? তুমি এক জন সামান্য হাবিলদার মাত্র, জনার্দ্দন অতি উচ্চকুলোদ্ভব রাজপুত, তাঁহার পালিতকন্যা রাজাদিগেরও প্রার্থনীয়। কি জন্য এরূপ আশায় হৃদয় বৃথা ব্যথিত করিতেছ? রঘুনাথ! এ বৃথা তৃষ্ণায় কেন হৃদয় দগ্ধ করিতেছ?

কিন্তু যৌবনকালে আশাই বলবতী হয়, শীঘ্র আমাদের নৈরাশ হয় না, অসাধ্যও আমরা সাধ্য বিবেচনা করি, অসম্ভবও সম্ভব বোধ হয়। রঘুনাথ আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পর দণ্ডায়মান হইলেন. আপন হৃদয়ের উপর উভয় বাহু স্থাপন করিয়া ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহিলেন, মনে মনে বলিলেন,—

"ভগবন্, সহায় হও, অবশ্য কৃতকার্য্য হইব। যশ, মান, খ্যাতি, মনুষ্যসাধ্য, কি জন্য আমার অসাধ্য হইবে? আমার শরীর কি অন্য অপেক্ষা ক্ষীণ? বাহু কি অন্য অপেক্ষা দুর্ব্বল? দেবগণ আমার সহায় হও, আমি যুদ্ধে পিতার নাম রক্ষা করিব, রাজপুতের উচিত সম্মান লাভ করিব, তাহার পর? যদি কৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে সরযূ! আমি তোমার অযোগ্য হইব না। তখন সরযূ! তোমাকে গল্পচ্ছলে অন্যকার এই সকল কথা বলিব, তখন তোমার সুন্দর হস্তদ্বয় আমার এই কম্পিত হস্তদ্বয়ে স্থাপন করিব, তখন ঐ লাবণ্যময়ী দেহলতা এই উদ্বিগ্ন হৃদয়ে ধারণ করিব, তখন ঐ সুন্দর বিম্ব-বিনিন্দিত ওষ্ঠদ্বয়"— রঘুনাথ! রঘুনাথ! উন্মত্ত হইও না।

তখন রঘুনাথ কথঞ্চিৎ শান্ত-হৃদয়ে গৃহের দিকে ফিরিলেন। সহসা দেখিলেন, একটি কণ্ঠমালা পড়িয়া রহিয়াছে,—দুইটি করিয়া মুক্তা, পরে একটি করিয়া পলা,—রঘুনাথ সে মালা চিনিলেন। সেই মালা পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে সরযূ কণ্ঠে ও বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছিলেন, বোধ হয়, অসাবধানতা বশতঃ ঐ স্থানে ফেলিয়া গিয়াছেন। রঘুনাথ আকাশের

দিকে চাহিয়া বলিলেন,—ভগবন্! এ কি আমার আশা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বলক্ষণ দান করিলেন ?

মালাটি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রঘুনাথ নিদ্রা গেলেন। পরদিন প্রাতে রঘুনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। জনার্দ্দনদেবের নিকট ভবানীর আজ্ঞা জানিলেন,—"ম্লেচ্ছদিগের সহিত যুদ্ধে জয়, স্বধর্ম্মীদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজয়।"

দুর্গত্যাগের পূর্ব্বে রঘুনাথ একবার সরযূর সহিত দেখা করিলেন। সরযূ যখন পুনরায় উদ্যানে ফুল তুলিতে আসিয়াছেন, ধীরে ধীরে রঘুনাথও তথায় যাইলেন। হৃদয়ের উদ্বেগ কথঞ্চিৎ দমন করিয়া ঈষৎ কম্পিতস্বরে রঘুনাথ বলিলেন,—ভদ্রে! কল্য নিশিযোগে এই কণ্ঠ-মালাটি এই স্থানে পাইয়াছি, সেইটি দিতে আসিয়াছি, অপরিচিতের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন।

এই বিনীতবাক্য শুনিয়া সরযূ ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন, সেই কমনীয় উদার মুখমণ্ডল, সেই কেশাবৃত উন্নত ললাট, সেই উজ্জ্বল নয়নদ্বয়, সেই তরুণ যোদ্ধা! রমণীর গৌর মুখমণ্ডল পুনরায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

রঘুনাথ পুনরায় ধীরে ধীরে বলিলেন,—যদি অনুমতি করেন, তবে এই সুন্দর মালাটি উহার অভ্যস্ত স্থানে পরাইয়া দি। এই অনুগ্রহটি আমাকে প্রদান করুন, ভগবান্ আপনাকে সুখে রাখিবেন।

সরযূ সলজ্জনয়নে একবার রঘুনাথের দিকে চাহিলেন, সে বিশাল আয়ত নয়নের ক্ষণদৃষ্টিতে রঘুনাথের হৃদয় কম্পিত হইল। তৎক্ষণাৎ রঞ্জিতমুখী লজ্জায় আবার চক্ষু মুদিত করিলেন। সম্মতি লক্ষণ পাইয়া রঘুনাথ ধীরে ধীরে সেই কণ্ঠমালা পরাইয়া দিলেন, কন্যার পবিত্র শরীর স্পর্শ করিলেন না।

ক্ষণেক পরে রঘুনাথ ধীরে ধীরে বলিলেন,—তবে অতিথিকে বিদায় দিন।

সরযূ এবার লজ্জা ও উদ্বেগ সংযম করিয়া ধীরে ধীরে রঘুনাথের দিকে চাহিলেন, আবার ধীরে ধীরে ভূমির দিকে নয়ন ফিরাইয়া অতি মৃদু অস্পষ্টস্বরে কহিলেন,—আপনার নিকট অনুগৃহীত রহিলাম, পুনরায় যদি দুর্গে আইসেন, ভরসা করি, পুনরায় পিতার এই মন্দিরে অবস্থান করিবেন।

পিপাসার্ত্ত চাতকের পক্ষে প্রথম বৃষ্টিবিন্দুর ন্যায়, পথভ্রান্ত পথিকের পক্ষে উষার প্রথম রক্তিমচ্ছটার ন্যায়, সরযূর প্রথমোচ্চারিত এই অমৃত কথাগুলি রঘুনাথের হৃদয় আনন্দলহরীতে প্লাবিত করিল। তিনি উত্তর করিলেন,—ভদ্রে, আমি পরের দাস, যুদ্ধ আমার ব্যবসা, পুনরায় কবে আসিতে পারিব, কখনও আসিতে পারিব কি না, জানি না। কিন্তু যত দিন জীবিত থাকিব, তত দিন আপনার সৌজন্য, আপনার যত্ন, আপনার দেবনিন্দিত মূর্ত্তি মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইব না।

সরযূ উত্তর দিতে পারিলেন না, রঘুনাথ দেখিলেন, সেই আয়ত নয়ন দুইটি ছল্ ছল্ করিতেছে, তাঁহার আপনার নয়নও শুষ্ক ছিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সায়েস্তা খাঁ

কেন চিন্তাকুল আজি নবাবের মন।

নবীনচন্দ্র সেন।

যদিও কয়েক বৎসর অবধি শিবজীর ক্ষমতা, রাজ্য এবং দুর্গসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল, তথাপি ১৬৬২ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহাকে বশীভূত করিবার অভিপ্রায়ে বিশেষ কোন যত্ন করেন নাই। সেই বৎসর সায়েস্তা খাঁ আমীর উল উমরা খেতাব প্রাপ্ত হইয়া দক্ষিণদেশের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইয়া শিবজীকে একেবারে জয় করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। সায়েস্তা খাঁ সেই বৎসরেই পুনা, চাকনদুর্গ ও অন্য কয়েক স্থান অধিকার করেন। পরবৎসর অর্থাৎ এই আখ্যায়িকা বিবৃত সময়ে সায়েস্তা খাঁ শিবজীকে একেবারে ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প করেন। দিল্লীর সম্রাটের আদেশানুসারে মাড়ওয়ারের রাজা প্রসিদ্ধনামা যশোবন্তসিংহও এই বৎসরে (১৬৬৩ খৃঃ) বহু সৈন্য লইয়া সায়েস্তা খাঁর সহিত যোগ দিলেন, সুতরাং শিবজীর বিপদের সীমা ছিল না। মোগল ও রাজপুত সৈন্য পুনা নগরের নিকটে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিল ও সায়েস্তা খাঁ স্বয়ং দাদাজী কানাইদেবের গৃহে, অর্থাৎ যে গৃহে শিবজী বাল্যকালে মাতার সহিত বাস করিতেন, সেই গৃহেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। সায়েস্তা খাঁ শিবজীর চাতুরী বিশেষরূপে জানিতেন, সুতরাং তিনি আদেশ করিলেন যে, অনুমতিপত্র বিনা

কোন মহারাষ্ট্রীয় পুনানগরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। শিবজী নিকটবর্ত্তী সিংহগড় নামক এক দুর্গে সসৈন্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা সে সময়ে যুদ্ধব্যবসায়ে অধিক পরিপক্ক হয় নাই, দিল্লীর শিক্ষিত সেনার সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ করা কোনমতেই সম্ভব নহে, সুতরাং শিবজী কৌশল ভিন্ন স্বাধীনতা রক্ষা ও হিন্দুরাজ্যবিস্তারের অন্য উপায় দেখিলেন না।

চৈত্র মাসের শেষভাগে এক দিন সায়ংকালে পরাক্রান্ত মোগল-সেনাপতি সায়েস্তা খাঁ আপন অমাত্য ও মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া সভায় বসিয়াছেন। কিরূপে শিবজীকে পরাজয় করিবেন, তাহারই পরামর্শ হইতেছিল। দাদাজী কানাইদেবের বাটীর মধ্যে সভাগৃহে এই সভা হইয়াছিল। চারিদিকে উজ্জ্বল দীপাবলী জ্বলিতেছে। জানালার ভিতর দিয়া সায়ংকালে শীতল বায়ু উদ্যানের পুষ্পগন্ধ বহিয়া আনিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। আকাশ অন্ধকার, কেবল দুই একটি নক্ষত্র দেখা যাইতেছে।

আন্ওরী নামে সায়েস্তা খাঁর এক জন চাটুকার বলিল,—আমীরের সেনার সম্মুখে মহারাষ্ট্রীয় সেনা যেন মহা বাত্যার সম্মুখে শুষ্ক পত্রের ন্যায় আকাশে উড়িয়া যাইবে, অথবা ভীত হইয়া পৃথিবীর ভিতরে প্রবেশ করিবে।

চাঁদ খাঁ নামক এক জন প্রাচীন সেনা কয়েক বৎসর অবধি মহারাষ্ট্রীয়দিগের বল-বিক্রম দেখিয়াছিলেন; তিনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—আমি বোধ করি, তাহাদের ঐ দুইটি ক্ষমতাই আছে।

সায়েস্তা খাঁ। কেন?

চাঁদ খাঁ। গতবৎসর কতিপয় পার্ব্বতীয় মহারাষ্ট্রীয় যখন চাকন-দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, আমাদের সমস্ত সৈন্য দুই মাস অবধি

চেষ্টা করিয়া কিরূপে তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দুর্গজয় করিয়াছে, তাহা জহাঁপনার স্মরণ আছে। একটি দুর্গ হস্তগত করিতে অনেক মোগলের প্রাণনাশ হইয়াছে। আবার এ বৎসর সর্ব্বস্থানে আমাদের সৈন্য থাকাতেও নিতাইজী আসমান দিয়া আহম্মদনগর ও আরাঙ্গাবাদ পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইয়া দেশ ছারখার করিয়া আসিয়াছে।

সায়েস্তা খাঁ। চাঁদ খাঁর বয়স অধিক হইয়াছে, তিনি এক্ষণে পর্ব্বত-ইন্দুরকে ভয় করেন? পূর্ব্বে তাঁহার এরূপ ভয় ছিল না।

চাঁদ খাঁর মুখমণ্ডল আরক্ত হইল, কিন্তু তিনি নিরুত্তর রহিলেন।

আন্‌ওরী। জহাঁপনা ঠিক আজ্ঞা করিয়াছেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা ইন্দুর-বিশেষ, তাহারা যে পর্ব্বত-ইন্দুরের ন্যায় গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া থাকিতে পারে, তাহা আমি অস্বীকার করি না।

চাঁদ খাঁ। পর্ব্বত-ইন্দুর পুনার ভিতর গর্ত্ত করিয়া বাহির না হইলে রক্ষা!

সায়েস্তা খাঁ। এখানে দিল্লীর সহস্র সহস্র নখায়ুধ বিড়াল আছে, ইন্দুরে সহসা কিছু করিতে পারিবে না।

সভাসদ্ সকলেই "কেরামৎ কেরামৎ" বলিয়া সেনাপতির এই বাক্যের অনুমোদন করিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিষয়ে এইরূপ অনেক রহস্য হইলে পর কি প্রণালীতে যুদ্ধ হইবে, তাহাই স্থির হইতে লাগিল। চাকন-দুর্গ হস্তগত হওয়া অবধি সায়েস্তা খাঁ দুর্গ হস্তগত করা একেবারে দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—এই প্রদেশ দুর্গপরিপূর্ণ, যদি একে একে সমস্ত দুর্গ হস্তগত করিতে হয়, তবে কত দিনে যে দিল্লীশ্বরের কার্য্য সিদ্ধ হইবে, কখনও সিদ্ধ হইবে কি না, তাহার স্থিরতা নাই।

চাঁদ খাঁ। জহাঁপনা! দুর্গই মহারাষ্ট্রীয়দিগের বল, উহারা সম্মুখ-রণ করিবে না, অথবা রণে পরাস্ত হইলেও উহাদিগের ক্ষতি নাই। কেন না, দেশ পর্ব্বতময়, উহাদিগের সেনা এক স্থান হইতে পলায়ন করিয়া কোন্ দিক্ দিয়া অন্য স্থানে উপস্থিত হইবে, আমরা তাহার উদ্দেশ পাইব না। কিন্তু দুর্গগুলি একে একে হস্তগত করিতে পারিলে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে অবশ্যই দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে।

সায়েস্তা খাঁ। কেন? মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিলে কি আমরা পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিব না? আমাদের কি অশ্বারোহী সেনা নাই, পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সমস্ত মহারাষ্ট্রসেনা ধ্বংস করিতে পারিবে না?

চাঁদ খাঁ। যুদ্ধ হইলে অবশ্যই মোগলদের জয়, ধরিতে পারিলে মহারাষ্ট্রীয় সেনা বিনাশ করিব, তাহার সংশয় নাই; কিন্তু এই পর্ব্বত-প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহীকে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ধরিতে পারে, এমন অশ্বারোহী হিন্দুস্থানে নাই। আমাদের অশ্বগুলি বৃহৎ, অশ্বারোহী বর্ম্মাবৃত ও বহু অস্ত্রসমন্বিত, সমভূমিতে, সম্মুখক্ষেত্রে তাহাদের তেজ দুর্দ্দমনীয়, তাহাদের গতি অপ্রতিহত, কিন্তু এই পর্ব্বত-প্রদেশে তাহাদিগের যাতায়াতের ব্যাঘাত জন্মে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহারাষ্ট্রীয় অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ যেন ছাগের ন্যায় তুঙ্গশৃঙ্গে লম্ফ দিয়া উঠে ও হরিণের ন্যায় উপত্যকা ও বৃক্ষশাখের মধ্য দিয়া পলায়ন করে। জহাঁপনা, আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন। সিংহগড়ে শিবজী আছেন, সহসা সেই স্থান অবরোধ করুন, এক মাস কি দুই মাস কালের মধ্যে দুর্গ জয় করিব, শিবজী বন্দী হইবে, দিল্লীশ্বরের জয় হইবে। নচেৎ এ স্থানে মহারাষ্ট্রীয়দিগের জন্য অপেক্ষা করিলে কি হইবে? তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবনের চেষ্টা

করিলেই বা কি হইবে? দেখুন, নিতাইজী অনায়াসে আমদের নিকট দিয়া যাইয়া আহম্মদনগর ও আরাঙ্গাবাদ ছারখার করিয়া আসিল, রুস্তম জমান তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কি করিল?

সায়েস্তা খাঁ সক্রোধে বলিলেন,—রুস্তম জমান বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে, ইচ্ছা করিয়া নিতাইজীকে পলাইতে দিয়াছে, আমি তাহার সমুচিত দণ্ড দিব। চাঁদ খাঁ, তুমিও সম্মুখ-যুদ্ধের বিরুদ্ধে পরামর্শ দিতেছ, দিল্লীশ্বরের সেনাগণের মধ্যে কি কেহই সাহসী নাই?

প্রাচীন যোদ্ধা চাঁদ খাঁর মুখমণ্ডল আবার রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া একবিন্দু অশ্রুজল মুছিয়া ফেলিলেন, পরে সেনাপতির দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—পরামর্শ দিতে পারি এরূপ সাধ্য নাই, সেনাপতি, যুদ্ধের প্রণালী স্থির করুন, যেরূপ হুকুম হইবে, তামিল করিতে এ দাস পরাঙ্মুখ হইবে না।

এই সময়ে এক জন ভৃত্য আসিয়া সমাচার দিল যে, সিংহগড়ের দূত মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী নামক ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন, নীচে অপেক্ষা করিতেছেন। সায়েস্তা খাঁ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাকে সভাগৃহে আনিবার আজ্ঞা দিলেন। সভাস্থ সকলে এই দূতকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন।

ক্ষণেক পর মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। ন্যায়শাস্ত্রীর বয়স এখনও চত্বারিংশ বৎসর হয় নাই, অবয়ব মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় ঈষৎ, খর্ব্ব ও কৃষ্ণবর্ণ। ব্রাহ্মণের মুখমণ্ডল সুন্দর, বক্ষঃস্থল বিশাল, বাহুযুগল দীর্ঘ, নয়ন গভীর বুদ্ধিব্যঞ্জক, ললাটে দীর্ঘ তিলকচন্দন, স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। শরীর তুলার কুর্ত্তিতে আবৃত, সুতরাং গঠন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে

না। মস্তকে প্রকাণ্ড উষ্ণীষ, এরূপ প্রকাণ্ড যে বদন-মণ্ডল যেন তাহার ছায়াতে আবৃত রহিয়াছে। সায়েস্তা খাঁ সাদরে দূতকে আহ্বান করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন।

সায়েস্তা খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন,—সিংহগড়ের সংবাদ কি?

মহাদেওজী একটি সংস্কৃত শ্লোক বলিলেন,—

সন্তি নদ্যো দণ্ডকেষু তথা পঞ্চবটীবনে।
সরযূ-বিচ্ছেদশোকং রাঘবস্ত কথং সহেৎ॥

অর্থাৎ দণ্ডকারণ্যে ও পঞ্চবটীবনে শত শত নদী আছে, কিন্তু তাহা দেখিয়া কি রাঘব সরযূ নদীর বিচ্ছেদ-দুঃখ ভুলিতে পারেন? সিংহগড় প্রভৃতি শত শত দুর্গ এক্ষণও শিবজীর হস্তে আছে, কিন্তু পুনা আপনার হস্তগত, সে সন্তাপ কি তিনি ভুলিতে পারেন?

সায়েস্তা খাঁ পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হ্যাঁ, তোমার প্রভুকে বলিও, প্রধান দুর্গ হস্তগত করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার যুদ্ধ করা বিফল, দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিলে বরং এখনও আশা আছে।

ব্রাহ্মণ ঈষদ্ধাস্য করিয়া পুনরায় একটি সংস্কৃত শ্লোক বলিলেন,—

ন শক্তো হি স্বাভিলাষং জ্ঞাতয়িতুঞ্চাতকঃ।
জ্ঞাত্বা তু তৎ বারিধরস্তোষয়তি যাচকম্॥

অর্থাৎ চাতক কথা কহিয়া আপন অভিলাষ মেঘকে জানাইতে পারে না, কিন্তু মেঘ সেই অভিলাষ বুঝিয়া আপনার দয়াবশতঃই তাহা পূর্ণ করে। মহজ্জনের যাচককে দিবার এইরূপ রীতি। প্রভু শিবজী এক্ষণে পুনা ও চাকন হারাইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিতেও লজ্জা বোধ করেন, কিন্তু ভবাদৃশ মহল্লোক তাঁহার অভিলাষ জানিয়া অনুগ্রহ করিয়া যাহা দান করিবেন, তাহাই শিরোধার্য্য।

সায়েস্তা খাঁ আনন্দ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন,—পণ্ডিতজী, তোমার পাণ্ডিত্যে আমি যে কতদূর পরিতুষ্ট হইলাম, বলিতে পারি না, তোমাদিগের সংস্কৃত ভাষা কি সুমধুর ও ভাবপরিপূর্ণ। যথার্থই কি শিবজী সন্ধির ইচ্ছা করিতেছেন?

মহাদেওজী বলিলেন,—

কেশরিণঃ প্রতাপেন ভয়বিদগ্ধচেতসঃ।
ত্রাহি দেব ত্রাহি রাজন্ ইতি ব্রুবন্তি ভূচরাঃ॥

অর্থাৎ দিল্লীশ্বরের সৈন্যের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া আমরা কেবল ত্রাহি ত্রাহি এই শব্দ করিতেছি।

সায়েস্তা খাঁ এবার আহ্লাদ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! আপনার শাস্ত্রালোচনায় সন্তুষ্ট হইলাম, এক্ষণে যদি সন্ধির কথাই বলিতে আসিয়া থাকেন, তবে শিবজী আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার নিদর্শন কৈ?

ব্রাহ্মণ তখন গম্ভীরভাবে বস্ত্রের ভিতর হইতে নিদর্শনপত্র বাহির করিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সায়েস্তা খাঁ সেইটি দেখিলেন। পরে বলিলেন,—হ্যাঁ, আমি নিদর্শনপত্র দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে কি কি প্রস্তাব করিবার আছে বলুন।

মহাদেওজী। প্রভুর এইরূপ আজ্ঞা যে, যখন প্রথমেই আপনাদিগের জয় হইয়াছে, তখন আর যুদ্ধ করা বৃথা।

সায়েস্তা খাঁ। ভাল।

মহাদেওজী। সুতরাং সন্ধির জন্য তিনি উৎসুক হইয়াছেন।

সায়েস্তা খাঁ। ভাল।

মহাদেওজী। এক্ষণে কি কি নিয়মে দিল্লীশ্বর সন্ধি করিতে সম্মত

হইবেন, তাহা জানিতে তিনি উৎসুক। জানিলে সেইগুলি পালন করিতে যত্নবান্ হইবেন।

সায়েস্তা খাঁ। প্রথম দিল্লীশ্বরের অধীনতা-স্বীকার। তাহাতে আপনার প্রভু স্বীকৃত আছেন?

মহাদেওজী। তাঁহার সম্মতি বা অসম্মতি জানাইবার আমার অধিকার নাই। মহাশয় যে যে কথাগুলি বলিলেন, তাহাই আমি তাঁহার নিকট জানাইব, তিনি সেইগুলি বিবেচনা করিয়া সম্মতি অসম্মতি পরে প্রকাশ করিবেন।

সায়েস্তা খাঁ। ভাল, প্রথম কথা আমি বলিয়াছি, দিল্লীশ্বরের অধীনতা-স্বীকার। দ্বিতীয়, দিল্লীশ্বরের সেনা যে যে দুর্গ হস্তগত করিয়াছে তাহা দিল্লীশ্বরেরই থাকিবে। তৃতীয়, সিংহগড় প্রভৃতি আরও কয়েকটি দুর্গ তোমরা ছাড়িয়া দিবে।

মহাদেওজী। সে কোন্ কোন্‌টি?

সায়েস্তা খাঁ। তাহা দুই এক দিনের মধ্যে পত্র দ্বারা জানাইব। চতুর্থ, অবশিষ্ট যে যে দুর্গ ও দেশ শিবজী আপন অধীনে রাখিবেন, তাহাও দিল্লীশ্বরের অধীনে জায়গীরস্বরূপ ভোগ করিবেন, তাহার জন্য কর দিতে হইবে। এইগুলি তোমার প্রভুকে জানাইও, ইহাতে তিনি সম্মত কি অসম্মত, তাহা যেন আমি দুই চারি দিনের মধ্যে জানিতে পারি।

মহাদেওজী। যেরূপ আদেশ করিলেন, সেইরূপ করিব। এক্ষণে যখন সন্ধির প্রস্তাব হইতেছে, তখন যত দিন সন্ধিস্থাপন না হয়, তত দিন যুদ্ধ ক্ষান্ত থাকিতে পারে?

সায়েস্তা খাঁ। কদাচ নহে। ধূর্ত্ত কপটাচারী মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আমি কদাচ বিশ্বাস করি না, এমত ধূর্ত্ততা নাই যে, তাহাদিগের অসাধ্য।

যত দিন সন্ধি একবারে স্থাপন না হয়, তত দিন যুদ্ধ চলিবে, আমরা তোমাদিগের অনিষ্ট করিব, তোমরা পার আমাদিগের অনিষ্ট করিও।

"এবমস্তু" বলিয়া ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছিল।

তিনি ধীরে ধীরে প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। প্রত্যেক দ্বার, প্রত্যেক ঘর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। এক জন মোগল প্রহরী কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—দূত মহাশয়, কি দেখিতেছেন?

দূত উত্তর করিলেন,—এই গৃহে প্রভু শিবজী বাল্যকালে ক্রীড়া করিতেন, তাহাই দেখিতেছি। এটিও তোমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, বোধ হয়, একে একে এই সমস্ত দুর্গগুলিই তোমরা লইবে। হা! ভগবান্!

প্রহরী হাস্য করিয়া বলিল,—সে জন্য আর বৃথা খেদ করিলে কি হইবে, আপন কার্য্যে যাও।

ব্রাহ্মণ শীঘ্রই বহু জনাকীর্ণ পুনানগরীর লোকের মধ্যে মিশিয়া গেলেন।

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শুভকার্য্যের পুরোহিত

অদূরে শিবিরে বসি নিশি দ্বিপ্রহরে,
কুমন্ত্রণা করিতেছে রাজদ্রোহিগণ।

নবীনচন্দ্র সেন।

ব্রাহ্মণ একে একে পুনার বহু পথ অতিবাহন করিলেন, যে যে স্থান দিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই সেই স্থান বিশেষ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দুই একটি দোকানে দ্রব্যক্রয়ের ছলে প্রবেশ করিয়া কথায় কথায় নানা বিষয় জানিলেন, পরে বাজার পার হইয়া গেলেন। প্রশস্ত রাজপথ হইতে একটি গলিতে প্রবেশ করিলেন, সেখানে রজনীতে দীপ সমস্ত নির্ব্বাণ হইয়াছে, নাগরিক সকলে দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিজ নিজ আলয়ে সুপ্ত।

ব্রাহ্মণ একাকী অনেক দূর যাইলেন। আকাশ অন্ধকারময়, কেবল দুই একটি তারা দেখা যাইতেছে, নাগরিক সকলে সুপ্ত, জগৎ নিস্তব্ধ। ব্রাহ্মণের মনে সন্দেহ হইল, তাঁহার বোধ হইল, যেন পশ্চাতে তিনি পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। স্থির হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, কিন্তু সে পদশব্দ আর শুনিতে পাইলেন না।

পুনরায় পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, ক্ষণেক পর পুনরায় বোধ হইল, যেন পশ্চাতে কে অনুসরণ করিতেছে। ব্রাহ্মণের হৃদয়

ঈষৎ চঞ্চল হইল। এই গভীর নিশীথে কে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে? শত্রু না মিত্র? শত্রু হইলে কি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে? উদ্বেগ-পরিপূর্ণ হৃদয়ে ক্ষণেক চিন্তা করিলেন, পরে নিঃশব্দে তুলা-নির্ম্মিত কুর্ত্তির আস্তিনের ভিতর হইতে একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিলেন, একটি পথের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। গভীর অন্ধকারের দিকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। কৈ কেহই নাই, সকলে সুপ্ত, নগর শব্দশূন্য ও নিস্তব্ধ!

সন্দিগ্ধমনা ব্রাহ্মণ পুনরায় আলোকপূর্ণ বাজারে ফিরিয়া গেলেন। তথায় অনেক দোকান, নানাজাতীয় বিস্তর লোক এখনও ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে, তাহার ভিতর মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। আবার তথা হইতে সহসা এক গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন, পরে ক্রতবেগে অন্যান্য গলির ভিতর দিয়া নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন; তথায় নিঃশব্দে অনেকক্ষণ শ্বাস রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; শব্দমাত্র নাই, চারিদিকে পথ, ঘাট, কুটীর, অট্টালিকা সমস্ত নিস্তব্ধ, নৈশ গগন গভীর দুর্ভেদ্য অন্ধকার দ্বারা সমস্ত জগৎকে আবৃত করিয়াছে। সহসা একটি চীৎকার শব্দ শ্রুত হইল, ব্রাহ্মণের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, তিনি নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন।

ক্ষণেক পর আবার সেই শব্দ হইল, মহাদেওজীর ভয় দূর হইল, সে নাগরিক প্রহরী পাহারা দিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে মহাদেও যে গলিতে লুক্কায়িত ছিলেন, সেই গলিতেই প্রহরী আসিল। গলি অতি সঙ্কীর্ণ, মহাদেওজী পুনরায় সেই ছুরিকা হস্তে লইয়া দুর্ভেদ্য অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রহরী ধীরে ধীরে এদিক্ ওদিক্ চাহিতে চাহিতে সেই স্থানে আসিল, মহাদেওজী যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই দিকে চাহিল।

মহাদেওজীর হৃদয় দুরু দুরু করিতে লাগিল, তিনি শ্বাস রুদ্ধ করিয়া হস্তে সেই ছুরিকা দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রহরী অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইল না, ধীরে ধীরে সে পথ হইতে চলিয়া গেল। মহাদেও ধীরে ধীরে তথা হইতে বাহির হইয়া ললাটের স্বেদ মোচন করিলেন, পরে নিকটবর্ত্তী একটি দ্বারে আঘাত করিলেন, শায়েস্তা খাঁর এক জন মহারাষ্ট্রীয় সেনা বাহির হইয়া আসিল। দুই জনে অতি সঙ্গোপনে নগরের মধ্যে অতি গোপনীয় ও মনুষ্যের অগম্য স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় দুই জনে উপবেশন করিলেন।

ব্রাহ্মণ। সমস্ত প্রস্তুত ?

সেনা। প্রস্তুত।

ব্রাহ্মণ। অনুমতি-পত্র পাইয়াছ ?

সেনা। পাইয়াছি।

আবার অস্পষ্ট পদশব্দ শ্রুত হইল। মহাদেওজী এবার ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া ছুরিকাহস্তে সম্মুখে যাইয়া দেখিলেন, অন্ধকারে অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, কিছুমাত্র দেখিতে পাইলেন না, ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে সেনাকে বলিলেন,—রিক্তহস্তে আসিয়াছ ?

সেনা বক্ষঃস্থল হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া দেখাইল। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—ভাল, সতর্ক থাকিও। বিবাহ কবে ?

সেনা। কল্য।

ব্রাহ্মণ। অনুমতি পাইয়াছ ?

সেনা। হাঁ।

ব্রাহ্মণ। কত জন লোকের ?

সেনা। বাদ্যকর দশ জন ও অস্ত্রধারী ত্রিশ জন, ইহার অধিক অনুমতি পাইলাম না।

ব্রাহ্মণ। এই যথেষ্ট, কোন্ সময়ে?

সেনা। রজনী এক প্রহর।

ব্রাহ্মণ। ভাল, এই দিক্ হইতে বরযাত্রা আরম্ভ হইবে।

সেনা। স্মরণ আছে।

ব্রাহ্মণ। বাদ্যকরেরা সজোরে বাদ্য করিবে।

সেনা। স্মরণ আছে।

ব্রাহ্মণ। জ্ঞাতি-কুটুম্ব যত পারিবে, জড় করিবে।

সেনা। স্মরণ আছে।

ব্রাহ্মণ তখন অল্প হাস্য করিয়া বলিলেন,—আমি সেই শুভকার্য্যের পুরোহিত! সে শুভকার্য্যের ঘটা সমস্ত ভারতবর্ষে রাষ্ট্র হইবে।

সহসা সজোরে নিক্ষিপ্ত একটি তীর আসিয়া ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থলে লাগিল। সে তীরে প্রাণনাশ নিশ্চয় সম্ভব, কিন্তু ব্রাহ্মণের কুর্ত্তির নীচে লৌহ-বর্ম্মে লাগিয়া তীর পড়িয়া গেল।

তৎপরেই একটি বর্শা। বর্শার আঘাতে ব্রাহ্মণ ভূমিতে পতিত হইলেন, কিন্তু সে দুর্ভেদ্য বর্ম্ম ভিন্ন হইল না, মহাদেও পুনরায় উঠিলেন। সম্মুখে দেখিলেন, নিষ্কোষিত অসিহস্তে এক জন দীর্ঘ মোগল যোদ্ধা,—তিনি চাঁদ খাঁ!

অদ্য সভাতে সেনাপতি সায়েস্তা খাঁ চাঁদ খাঁকে ভীরু বলিয়াছেন। যুদ্ধ ব্যবসায়ে চাঁদ খাঁর কেশ শুক্ল হইয়াছিল, এ অপবাদ কেহ তাঁহাকে কখনও দেয় নাই। মনে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়াছিলেন, অন্যকে তাহা কি জানাইবেন, মনে মনে স্থির করিলেন, কার্য্য দ্বারা এ অপবাদ দূর করিব, নচেৎ এই যুদ্ধেই এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণ ত্যাগ করিব।

ব্রাহ্মণের আচরণ দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল, তিনি শিবজীকে বিশেষ করিয়া জানিতেন, শিবজীর অসাধারণ ক্ষমতা, তাঁহার বহুসংখ্যক দুর্গ, তাঁহার অপূর্ব্ব ও দ্রুতগামী অশ্বারোহী সেনা, তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে আস্থা, হিন্দুরাজ্যস্থাপনে অভিলাষ, হিন্দুস্বাধীনতাস্থাপনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এ সমস্ত চাঁদ খাঁর অগোচর ছিল না। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধপ্রারম্ভেই যে শিবজী পরাজয় স্বীকার ও সন্ধি যাচ্ঞা করিবেন, এরূপ সম্ভব নহে, তথাপি এ ব্রাহ্মণ শিবজীর নিদর্শনপত্র দেখাইয়াছে। এ ব্রাহ্মণ কে? ইহার গুপ্ত অভিসন্ধিই বা কি?

ব্রাহ্মণের কথাগুলিতেও চাঁদ খাঁর সন্দেহ জন্মিয়াছিল, মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিন্দা শুনিয়া যখন ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্বলিত হয়, তাহাও তিনি দেখিয়াছিলেন। এ সমস্ত সন্দেহের কথা সায়েস্তা খাঁর নিকট বলেন নাই, সত্য বলিয়া কেন আবার তিরস্কার শুনিবেন? কিন্তু মনে মনে স্থির করিলেন, এই ভণ্ড দূতকে ধরিব। সেই অবধি দূতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন। পথে পথে, গলিতে গলিতে অদৃশ্যভাবে অনুসরণ করিয়াছিলেন। মুহূর্ত্তের জন্যও ব্রাহ্মণ চাঁদ খাঁর নয়ন-বহির্ভূত হইতে পারেন নাই। সেনার সহিত ব্রাহ্মণের যে কথা হয়, তাহা শুনিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি যোদ্ধা তখনই সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, এই দূতকে বিনাশ করিয়া সেনাকে সেনাপতিসদনে লইয়া যাইয়া প্রতিপত্তিলাভের সঙ্কল্প করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—সায়েস্তা খাঁ! যুদ্ধব্যবসায়ে বৃথা এ কেশ শুক্ল করি নাই, আমি ভীরুও নহি, দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচারীও নহি; অদ্য যে ষড়যন্ত্রটি ধরিয়া প্রকাশ করিয়া দিব, তাহার পর বোধ হয়, এ প্রাচীন দাসের কথা তুমি অবহেলা করিবে না। কিন্তু আশা মায়াবিনী।

মহাদেওজী ভূমি হইতে উঠিতে না উঠিতে চাঁদ খাঁ তীর ও বর্শা ব্যর্থ

দেখিয়া লম্ফ দিয়া তাঁহার উপর আসিয়া পড়িলেন ও খড়্গ দ্বারা সজোরে আঘাত করিলেন। খড়্গ বর্ম্মে লাগিয়া সেবারও প্রতিহত হইল।

"কুক্ষণে আমার অনুসরণ করিয়াছিলে," এই বলিয়া মহাদেওজী আপন আস্তিন গুটাইয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকা আকাশের দিকে উত্তোলন করিলেন। নিমেষমধ্যে বজ্রমুষ্টি চাঁদ খাঁর বক্ষঃস্থলে অবতীর্ণ হইল, চাঁদ খাঁর মৃতদেহ ধরাতলশায়ী হইল।

ব্রাহ্মণ স্বস্থ অধরোষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নি বহির্গত হইতেছিল। ধীরে ধীরে সেই ছুরিকা পুনরায় লুকাইয়া বলিলেন,—সায়েস্তা খাঁ! মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিন্দা করার এই প্রথম ফল, ভবানীর কল্যাণে দ্বিতীয় ফল কল্য ফলিবে।

যোদ্ধার কর্ত্তব্যকার্য্যে যে সময় চাঁদ খাঁ জীবনদান করিলেন, সেনাপতি সায়েস্তা খাঁ সে সময় বড় সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন শিবজীকে বশীকরণ বিষয়ে সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

মহারাষ্ট্রীয় সেনা এই সমস্ত ব্যাপারে বিস্মিত হইয়া বলিল,—প্রভু, কি করিলেন? কল্য এ বিষয়ে গোল হইবে, আমাদের সমুদয় সঙ্কল্প বৃথা হইবে।

ব্রাহ্মণ। কিছুমাত্র বৃথা হইবে না। আমি জানিয়াছি, চাঁদ খাঁ অদ্য সভায় অপমানিত হইয়াছেন, এখন কয়েক দিন সভায় না যাইলেও কেহ সন্দেহ করিবে না। এই মৃতদেহ ঐ গভীর কূপে নিক্ষেপ কর, আর স্মরণ রাখিও, কল্য রজনী একপ্রহর কালে।

সেনা। রজনী একপ্রহর কালে।

ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে পুনানগর ত্যাগ করিলেন। তিন চারি স্থানে প্রহরিগণ তাঁহাকে ধরিল, তিনি সায়েস্তা খাঁর স্বাক্ষরিত অনুমতিপত্র দেখাইয়া নিরাপদে পুনা হইতে বহির্গত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাজা যশোবন্ত সিংহ

কোন্ ধর্ম্মমতে কহ দাসে শুনি,
জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব জাতি—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়: পর পর সদা।

মধুসূদন দত্ত।

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় রাজপুত রাজা যশোবন্তসিংহ একাকী শিবিরে বসিয়া রহিয়াছেন। হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া এই গভীর নিশীথেও তিনি কি চিন্তা করিতেছেন। সম্মুখে কেবল একটিমাত্র দীপ জ্বলিতেছে, শিবিরে অন্য লোকমাত্র নাই। সংবাদ আসিল, মহারাষ্ট্রীয় দূত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। যশোবন্ত তাঁহাকে আনয়ন করিতে কহিলেন, তাঁহারই জন্য তিনি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

মহাদেওজী ন্যায়শাস্ত্রী শিবিরে আসিলেন, যশোবন্ত তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া উপবেশন করিতে বলিলেন। উভয়ে উপবেশন করিলেন।

ক্ষণেক যশোবন্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কি চিন্তা করিতেছিলেন। মহাদেও নিঃশব্দে রাজপুতের দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিতেছিলেন। পরে

যশোবন্ত বলিলেন,—আমি আপনার প্রভুর পত্র পাইয়াছি। তাহাতে যাহা লিখিত আছে, অবগত হইয়াছি, তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রস্তাব আছে?

মহাদেও। প্রভু আমাকে কোন প্রস্তাব করিতে পাঠান নাই, দেখা করিতে পাঠাইয়াছেন।

যশোবন্ত। কেবল পুনা ও চাকন-দুর্গ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে মাত্র, এই জন্য খেদ?

মহাদেও। দুর্গনাশে তিনি ক্ষুব্ধ নহেন, তাঁহার অনেক দুর্গ আছে।

যশোবন্ত। মোগল-যুদ্ধস্বরূপ বিপদে পড়িয়া তিনি খেদ করিতেছেন?

মহাদেও। বিপদে পড়িলে খেদ করা তাঁহার অভ্যাস নাই।

যশোবন্ত। তবে কি জন্য খেদ করিতেছেন?

মহাদেও। যিনি হিন্দুরাজতিলক, যিনি সূর্য্যকুলাবতংস, যিনি সনাতন ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহাকে অদ্য ম্লেচ্ছের দাস দেখিয়া প্রভু ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।

যশোবন্তের মুখমণ্ডল ঈষৎ আরক্ত হইল। মহাদেও তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না, গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন,—উদয়পুরের রাণার বংশে যিনি বিবাহ করিয়াছেন, মাড়ওয়ারের রাজছত্র যাঁহার মস্তকের উপর ধৃত হইয়াছে, রাজস্থান যাঁহার সুখ্যাতিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সিপ্রাতীরে যাঁহার বাহুবিক্রম দেখিয়া আরংজীব ভীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষ যাঁহাকে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ জ্ঞান করে, দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, মন্দিরে মন্দিরে যাঁহার জয়ের জন্য হিন্দুমাত্রেই, ব্রাহ্মণমাত্রেই জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, অদ্য তাঁহাকে মুসলমানের পক্ষ হইয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া প্রভু ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। রাজন্! আমি সামান্য দূতমাত্র, আমি কি বলিতেছি, জানি না, অপরাধ হইলে মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু এ যুদ্ধসজ্জা

কেন? এ সৈন্যসামন্ত কেন? এ সমস্ত বিজয়পতাকা কি জন্য উড্ডীন হইতেছে? স্বাধিকার বৃদ্ধি করিবার জন্য? হিন্দুস্বাধীনতা স্থাপন করিবার জন্য? ক্ষত্রিয়োচিত যশোলাভের জন্য? আপনি ক্ষত্রকুলর্ষভ! আপনি বিবেচনা করুন, আমি জানি না।

যশোবন্ত অধোবদনে রহিলেন। মহাদেও আরও বলিতে লাগিলেন,—আপনি রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়েরা রাজপুত-পুত্র, পিতাপুত্রে যুদ্ধ সম্ভবে না, স্বয়ং ভবানী এ যুদ্ধ নিষেধ করিয়াছেন। আপনি আজ্ঞা করুন, আমরা পালন করিব; রাজপুতের গৌরবই অনাথ ভারতবর্ষের একমাত্র গৌরব, রাজপুতের যশোগীত আমাদিগের রমণীগণ এখনও গাইয়া থাকে, রাজপুতদিগের উদাহরণ দেখিয়া আমাদের বালকগণ শিক্ষিত হয়। ক্ষত্রকুলতিলক! রাজপুত-শোণিতে আমাদিগের খড়্গ রঞ্জিত হইবার পূর্ব্বে যেন মহারাষ্ট্র নাম বিলুপ্ত হয়, রাজ্য বিলুপ্ত হয়, আমরা যেন বর্শা ও খড়্গ ত্যাগ করিয়া পুনরায় লাঙ্গল ধারণ করিতে শিখি!

যশোবন্তসিংহ তখন নয়ন উঠাইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—দূতপ্রধান! তোমার কথাগুলি বড় মিষ্ট, কিন্তু আমি দিল্লীশ্বরের অধীন, মহারাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ করিব বলিয়া আসিয়াছি, মহারাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ করিব।

মহাদেও। এবং শত শত স্বধর্ম্মীকে নাশ করিবেন, হিন্দু হিন্দুর মস্তকচ্ছেদন করিবে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের বক্ষে ছুরিকা বসাইবে, ক্ষত্রিয়ের শোণিতস্রোতে ক্ষত্রিয়-শোণিতস্রোত মিশাইবে, শেষে ম্লেচ্ছ সম্রাটের সম্পূর্ণ জয় হইবে।

যশোবন্তের মুখ আরক্ত হইল, কিন্তু উদ্বেগ সংবরণ করিয়া কিঞ্চিৎ কর্কশভাবে বলিলেন,—কেবল দিল্লীশ্বরের জয়ের জন্য যুদ্ধ নহে, আমি তোমার প্রভুর সহিত কিরূপে মিত্রতা করিব? শিবজী বিদ্রোহাচারী, চতুর শিবজী অদ্যকার অঙ্গীকার অনায়াসে কল্য ভঙ্গ করে।

এবার ব্রাহ্মণের নয়ন প্রজ্বলিত হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,— মহারাজ! সাবধান, অলীক নিন্দা আপনাকে সাজে না। শিবজী কবে হিন্দুর নিকট যে বাক্যদান করিয়াছেন, তাহার অন্যথা করিয়াছেন? কবে ব্রাহ্মণের নিকট যে পণ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়ের নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন? দেশে শত শত গ্রাম, শত শত দেবালয় আছে, অনুসন্ধান করুন, শিবজী সত্যপালন করিতে, ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দিতে, হিন্দুর উপকার করিতে, গোবৎসাদি রক্ষা করিতে দেব-দেবীর পূজা দিতে কবে পরাঙ্মুখ? তবে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ! জেতা ও বিজেতাদিগের মধ্যে কবে কোন্ দেশে সখ্যতা? বজ্রনখ যখন সর্পকে ধারণ করে, সর্প সে সময় মৃতবৎ হইয়া থাকে; মৃত বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবামাত্র জর্জ্জরিত শরীর নাগরাজ সময় পাইয়া দংশন করে। এটি বিদ্রোহাচরণ না স্বভাবের রীতি? কুক্কুর যখন খরগসকে ধরিবার চেষ্টা করে, খরগস প্রাণরক্ষার জন্য কত যত্ন করে, একদিকে পলাইবার উদ্যোগ করিয়া সহসা অন্য দিকে যায়। এটি চাতুরী না স্বভাবের রীতি? যাবতীয় জীব-জন্তুকে জগদীশ্বর যে প্রাণরক্ষার যত্ন ও উপায় শিখাইয়াছেন, মনুষ্যকে কি তিনি সে উপায় শিখান নাই? আমাদিগের প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবনস্বরূপ স্বাধীনতা যে মুসলমানেরা শত শত বৎসর অবধি হরণ করিয়াছে, হৃদয়ের শোণিতস্বরূপ বল, মান, দেশগৌরব ও ধর্ম্ম বিনাশ করিতেছে, তাহাদিগের সহিত আমাদিগের সখ্যতা ও সত্যসম্বন্ধ? তাহাদিগের নিকট হইতে যে উপায়ে সেই জীবনস্বরূপ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারি, স্বধর্ম্ম ও জাতিগৌরব রক্ষা করিতে পারি, সে উপায় কি চতুরতা? সে উপায় কি নিন্দনীয়? জীবনরক্ষার্থ পলায়নপটু মৃগের শীঘ্রগতি কি বিদ্রোহ? শাবককে বাঁচাইবার জন্য পক্ষী যে অপহারককে

অন্যদিকে লইয়া যাইতে যত্ন করে, সেটি কি নিন্দনীয়? ক্ষত্রিয়রাজ! দিনে দিনে মুসলমানদিগের নিকট মহারাষ্ট্রীয় চতুরতার নিন্দা শুনিতে পাই, কিন্তু হিন্দুপ্রবর! আপনি হিন্দু-জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়কে নিন্দা করিবেন না, শিবজীকে নিন্দা করিবেন না।—মহাদেওজীর জ্বলন্ত নয়নদ্বয় জলে প্লাবিত হইল।

ব্রাহ্মণের চক্ষে জল দেখিয়া যশোবন্ত হৃদয়ে বেদনা পাইলেন—বলিলেন,—দূতপ্রবর! আমি আপনাকে কষ্ট দিতে চাহি না, যদি অন্যায় বলিয়া থাকি, মার্জ্জনা করিবেন। আমি কেবল এইমাত্র বলিতেছিলাম যে, রাজপুতগণও স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে, কিন্তু তাহারা সাহস ও সম্মুখরণ ভিন্ন অন্য উপায় জানে না। মহারাষ্টীয়েরা কি সেই উপায় অবলম্বন করিয়া সেইরূপ ফললাভ করিতে পারে না?

মহাদেও। মহারাজ! রাজপুতদিগের পুরাতন স্বাধীনতা আছে, বিপুল অর্থ আছে, দুর্গম পর্ব্বত বা মরুবেষ্টিত দেশ আছে, সুন্দর রাজধানী আছে, সহস্র বৎসরের অপূর্ব্ব রণশিক্ষা আছে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের ইহার কোন্‌টি আছে? তাহারা দরিদ্র, তাহারা চিরপরাধীন, তাহাদের এই প্রথম রণশিক্ষা। আপনাদিগের দেশ আক্রমণ করিলে আপনারা পুরাতন রীতানুসারে যুদ্ধ দেন, পুরাতন দুর্দ্ধর্ব তেজ ও বিক্রম প্রকাশ করেন, অসংখ্যক রাজপুত সেনার সম্মুখে দিল্লীশ্বরের সেনা পলায়ন করে। আমাদিগের দেশ আক্রমণ করিলে আমরা কি করিব? পূর্ব্বরীতি বা রণশিক্ষা নাই, অসংখ্য সৈন্য নাই, যাহারা আছে, তাহারা কখনও রণ দেখে নাই। যখন দিল্লীশ্বর কাবুল, পাঞ্জাব, অযোধ্যা, বিহার, মালব, বীরপ্রসবিনী রাজস্থানভূমি হইতে সহস্র সহস্র পুরাতন রণদর্শী যোদ্ধা প্রেরণ করেন, যখন অপরূপ বৃহৎ ও অনিবার্য্য রণ-অশ্ব ও রণ-গজ প্রেরণ করেন, যখন তাঁহার কামান, বন্দুক, বারুদ, গোলা, রৌপ্যমুদ্রা, স্বর্ণমুদ্রা

সহস্র সহস্র শকটে আনিয়া রাশীকৃত করেন, তখন দরিদ্র মহারাষ্ট্রীয়েরা কি করিবে? তাহাদিগের সেরূপ অসংখ্য যুদ্ধদক্ষ সেনা নাই, সেরূপ অশ্ব-গজ নাই, সেরূপ বিপুল অর্থ নাই। ত্বরিতগতি ও পর্ব্বতযুদ্ধ ভিন্ন তাহাদিগের আর কি উপায় আছে? ক্ষত্রিয়রাজ! জীবনপ্রারম্ভে দরিদ্রজাতির এইরূপ আচরণ ভিন্ন উপায় নাই। জগদীশ্বর করুন, মহারাষ্ট্রীয়জাতি দীর্ঘজীবী হউক, তাহাদিগের অর্থ ও যুদ্ধায়োজনের উপায় সংস্থান হইলে, দুই তিন শত বৎসরের রণশিক্ষা হইলে, তাহারাও রাজপুতের অসাধারণ গুণ অনুকরণ করিবে।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া যশোবন্ত চিন্তায় অভিভূত হইয়া রহিলেন, হস্তে ললাট স্থাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহাদেও দেখিলেন, তাঁহার বাক্যগুলি নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই, আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—আপনি হিন্দুশ্রেষ্ঠ, হিন্দুগৌরবসাধনে সন্দেহ করিতেছেন কেন? হিন্দুধর্ম্মের জয় অবশ্যই আপনি ইচ্ছা করেন, শিবজীর ইচ্ছা ভিন্ন অন্য ইচ্ছা নাই। মুসলমান-শাসন ধ্বংসকরণ, হিন্দুজাতির গৌরব-সাধন, স্থানে স্থানে দেবালয় স্থাপন, সনাতন ধর্ম্মের গৌরববৃদ্ধি, হিন্দু-শাস্ত্রের আলোচনা, ব্রাহ্মণকে আশ্রয়দান, গোবৎসাদি রক্ষাকরণ, ইহা ভিন্ন শিবজীর অন্য উদ্দেশ্য নাই। এ বিষয়ে যদি তাঁহাকে সাহায্য করিতে বিমুখ হন, তবে স্বহস্তে এই কার্য্য সাধন করুন। আপনি এই দেশের রাজত্ব গ্রহণ করুন, মুসলমানদিগকে পরাস্ত করুন, মহারাষ্ট্রে হিন্দুস্বাধীনতা স্থাপন করুন। আদেশ করুন, দুর্গের দ্বার এইক্ষণেই উদ্ঘাটিত হইবে, প্রজারা আপনাকে কর দিবে, আপনি শিবজী অপেক্ষা সহস্রগুণ বলবান্, সহস্রগুণ দূরদর্শী, সহস্রগুণ উপযুক্ত। শিবজী সন্তুষ্টচিত্তে

আপনার একজন সেনাপতি হইয়া মুসলমানদিগের ধ্বংসসাধন করিবেন। তাঁহার অন্য বাসনা নাই।

এই প্রস্তাবে উচ্চাভিলাষী যশোবন্তের নয়ন যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইল। অনেক চিন্তা করিলেন, কিন্তু অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন,—মাড়ওয়ার ও মহারাষ্ট্র অনেক দূর, এক রাজার অধীনে থাকিতে পারে না।

মহাদেও। তবে আপনার উপযুক্ত পুত্র থাকিলে তাঁহাকে এই রাজ্য দিন। নচেৎ কোন আত্মীয় যোদ্ধাকে দিন। শিবজী ক্ষত্রিয়-রাজার অধীনে কার্য্য করিবে, কিন্তু কদাচ ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করিবে না।

যশোবন্ত। এই বিপদ্‌কালে আরংজীবের সহিত যুদ্ধ করিয়া এ দেশ রাখিতে পারিবে, এমত আত্মীয নাই।

মহাদেও। কোন ক্ষত্রিয় সেনাপতিকে নিযুক্ত করুন। হিন্দুধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষা হইলে শিবজীর মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, শিবজী আনন্দচিত্তে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন।

যশোবন্ত। সেইরূপ সেনাপতিও নাই।

মহাদেও। তবে যিনি এই মহৎ কার্য্যসাধন করিতে পারিবেন, তাঁহাকে সাহায্য করুন। আপনার সাহায্যে, আপনার আশীর্ব্বাদে, শিবজী অবশ্যই স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের গৌরবসাধন করিতে পারিবেন। ক্ষত্রিয়রাজ! ক্ষত্রিয়যোদ্ধাকে সহায়তা করুন, ভারতবর্ষে এরূপ হিন্দু নাই, আকাশে এরূপ দেবতা নাই, যিনি এজন্য আপনাকে প্রশংসাবাদ না করিবেন।

যশোবন্ত। দ্বিজবর, তোমার তর্ক অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু দিল্লীশ্বর

আমাকে স্নেহ করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, আমি কিরূপে অন্যরূপ আচরণ করিব? সে কি ভদ্রোচিত?

মহাদেও। দিল্লীশ্বর যে হিন্দুগণকে কাফের বলিয়া জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছেন, সে কার্য্য কি ভদ্রোচিত? দেশে দেশে যে হিন্দু-মন্দির, হিন্দুদেবদেবীর অবমাননা করিতেছেন, সে কি ভদ্রোচিত? কাশীর পবিত্র মন্দির চূর্ণ করিয়া তাহার প্রস্তর দ্বারা সেই পুণ্যধামে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সে কি ভদ্রোচিত?

ক্রোধকম্পিতস্বরে যশোবন্ত বলিলেন,—দ্বিজবর! আর বলিবেন না, যথেষ্ট হইয়াছে! অদ্যাবধি শিবজী আমার মিত্র, আমি শিবজীর মিত্র! অদ্যাবধি শিবজীর পথ ও আমার পথ এক, শিবজীর চেষ্টা ও আমার চেষ্টা অভিন্ন। সেই হিন্দুবিরোধী দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে এত দিন যিনি যুদ্ধ করিয়াছেন, সে মহাত্মা কোথায়? একবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের সন্তাপ দূর করি।

ব্রাহ্মণবেশধারী দূত তখন ব্রাহ্মণবেশ ত্যাগ করিলেন, ব্রাহ্মণের উষ্ণীষের নীচে যোদ্ধার শিরস্ত্রাণ দৃষ্ট হইল, তুলার কুর্ত্তির নীচে লৌহ-বর্ম্ম প্রকাশিত হইল! মহারাষ্ট্রীয় বীর ধীরে ধীরে বলিলেন,—"রাজন্! ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আপনার নিকটে আসিয়াছিলাম, সে দোষ গ্রহণ করিবেন না। এ দাস ব্রাহ্মণ নহে, মহারাষ্ট্রীয় ক্ষত্রিয়; নাম মহাদেওজী নহে, দাসের নাম শিবজী!"

রাজা যশোবন্তসিংহ বিস্ময় ও হর্ষোৎফুল্ললোচনে সেই খ্যাতনামা মহারাষ্ট্রযোদ্ধার দিকে চাহিয়া রহিলেন, চকিত হইয়া সেই দিল্লীশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী দাক্ষিণাত্যের বীরশ্রেষ্ঠ, শিবজীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে গাত্রোত্থান করিয়া সানন্দে ও সজলনয়নে সেই পরম শত্রুকে

আলিঙ্গন করিলেন। শিবজীও সম্মান ও প্রণয়ের সহিত খ্যাতনামা রাজপুত-বীরকে আলিঙ্গন করিলেন।

সমস্ত রাত্রি কথোপকথন হইল, যুদ্ধের সমস্ত কথা ঠিক হইল, তৎপরে শিবজী বিদায় লইলেন। বিদায় লইবার সময়ে কহিলেন, মহারাজ, অনুগ্রহ করিয়া কল্য কোন ছলে পুনা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে থাকিলে ভাল হয়।

যশোবন্ত। কেন, কল্য তুমি পুনা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে?

মহারাষ্ট্রীয় বীর হাস্য করিয়া বলিলেন,—না, একটি বিবাহকার্য্য সম্পাদন হইবে, মহারাজ থাকিলে শুভকার্য্যে ব্যাঘাত হইতে পারে।

যশোবন্ত। ভাল, দূরেই থাকিব। বিবাহকার্য্যের মন্ত্রাদি ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয়ের এক্ষণে স্মরণ আছে কি?

শিবজী। আছে বৈ কি! আমার শাস্ত্রবিদ্যা দেখিয়া দিল্লীর সেনাপতি সায়েস্তা খাঁ বিস্মিত হইয়াছেন। কল্য তিনি অন্যরূপ বিদ্যা দেখিবেন।

যশোবন্ত দ্বার পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইলেন, পরে বিদায়ের সময় বলিলেন,—তবে বৃদ্ধ বিনয়ে যেরূপ কথোপকথন হইল, সেইরূপ কার্য্য করিবেন।

শিবজী। সেইরূপ কার্য্য করিবার জন্য প্রভু শিবজীকে বলিব।

যশোবন্ত। হাঁ, বিস্মৃত হইয়াছিলাম, সেইরূপ কার্য্য করিতে আপনার প্রভুকে বলিবেন। এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে যশোবন্তসিংহ শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শিবজী

অসুর-উচ্ছিষ্ট গ্রাসি পুষ্ট কলেবর ?
অসুর-পদাঙ্করজঃ শোভিত মস্তকে ?
তার চেয়ে শতবার পশিব গগনে,
প্রকাশি অমর-বীর্য্য সমরের স্রোতে,
ভাসিব অনন্তকাল দৈত্যের সংগ্রামে,
দেবরক্ত যত দিন না হবে নিঃশেষ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ব্বদিকে রক্তিমচ্ছটা দেখা যাইতেছে, এমন সময়ে ব্রাহ্মণবেশধারী শিবজী সিংহগড়ে প্রবেশ করিলেন। উষ্ণীষ ও অঙ্গাবরণ খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন, প্রাতঃকালের আলোকে মস্তকের লৌহ শিরস্ত্রাণ ও শরীরের বর্ম্ম ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল। বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণ ছুরিকা, কোষে "ভবানী" নামক প্রসিদ্ধ খড়্গ। বক্ষঃস্থল বিশাল, শরীর ঈষৎ খর্ব্ব বটে, কিন্তু সুবদ্ধ, সুদৃঢ় বন্ধনী ও পেশীগুলি বর্ম্মের নীচে হইতেও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে,—পেশোয়া মুরেশ্বর ত্রিমূল সানন্দে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—ভবানীর জয় হউক! আপনি এতক্ষণ পরে কুশলে ফিরিয়া আসিলেন।

শিবজী। আপনার আশীর্ব্বাদে কোন্ বিপদ্ হইতে উদ্ধার না পাইয়াছি?

মুরেশ্বর। সমস্ত স্থির হইয়াছে?

শিবজী। সমস্ত।

মুরেশ্বর। অদ্য রাত্রে বিবাহ?

শিবজী। অদ্যই।

মুরেশ্বর। সায়েস্তা খাঁ কিছু জানেন না? তীক্ষ্ণবুদ্ধি চাঁদ খাঁ কিছু জানেন না?

শিবজী। সায়েস্তা খাঁ ভীত শিবজীর নিকট হইতে সন্ধি প্রার্থনা প্রতীক্ষা করিতেছেন; যোদ্ধা চাঁদ খাঁ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, তিনি আর যুদ্ধ করিবেন না।

মুরেশ্বর। রাজা যশোবন্ত?

শিবজী। আপনি পত্রে যে সমস্ত যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছিল। আমি যাইয়াই দেখিলাম, তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিয়াছেন, সুতরাং অনায়াসেই আমার কার্য্য সিদ্ধ হইল।

মুরেশ্বর। ভবানীর জয় হউক! আপনি এক রাত্রে একাকী যে কার্য্যসাধন করিলেন, তাহা সহস্রের অসাধ্য! যে অসমসাহসী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ভাবিলে এখনও হৃৎকম্প হয়। প্রভো, এরূপ কার্য্যে আর প্রবৃত্ত হইবেন না, আপনার অমঙ্গল হইলে মহারাষ্ট্রের কি থাকিবে?

শিবজী। মুরেশ্বর! বিপদ ভয় করিলে অদ্যাবধি জায়গীরদার মাত্র থাকিতাম, বিপদ ভয় করিলে এ মহৎ উদ্দেশ্য কিরূপে সাধন হইবে? চিরজীবন বিপদে আচ্ছন্ন থাকি ক্ষতি নাই, কিন্তু ভবানী করুন, যেন মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীন হয়।

মুরেশ্বর। বীরশ্রেষ্ঠ! আপনার জয় অনিবার্য্য, স্বয়ং ভবানী

সহায়তা করিবেন। কিন্তু দ্বিপ্রহর রজনীতে, শত্রুশিবিরে, একাকী ছদ্মবেশে ?

শিবজী। এ ত শিবজীর অভ্যস্ত কার্য্য। কিন্তু অদ্য সত্যই সত্য একটি মহা বিপদে পতিত হইয়াছিলাম।

সুরেশ্বর। কি ?

শিবজী। এমন মূর্খকেও আপনি সংস্কৃত শ্লোক শিখাইয়াছিলেন ? যে আপনার নাম স্বাক্ষর করিতে পারে না, সে শ্লোক স্মরণ রাখিবে ?

সুরেশ্বর। কেন, কি হইয়াছিল ?

শিবজী। আর কিছু নহে, সায়েস্তা খাঁর সভায় যাইয়া ন্যায়শাস্ত্রী মহাশয় প্রায় সমস্ত শ্লোকগুলি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

সুরেশ্বর। তার পর ?

শিবজী। দুই একটি মনে ছিল, তদ্দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হইল।

শিবজীর সহিত আমাদিগের এই প্রথম পরিচয় ; এই স্থলে তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত আমরা কিছু বলিতে চাই। ইতিহাসজ্ঞ পাঠক ইচ্ছা করিলে এই পরিচ্ছেদের অবশিষ্ট অংশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন।

শিবজী ১৬২৭ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং আখ্যায়িকা বর্ণিত সময়ে তাঁহার বয়স ৩৬ বৎসর হইয়াছিল; তাঁহার পিতার নাম শাহজী ; পিতামহের নাম মল্লজী। আমরা প্রথম অধ্যায়ে ফুলতন দেশের দেশমুখ প্রসিদ্ধ নিম্বলকর বংশের কথা বলিয়াছি ; সেই বংশের যোগপাল রাওনায়কের ভগ্নী দীপাবাঈকে মল্লজী বিবাহ করিয়াছিলেন। অনেক দিন অবধি সন্তানাদি না হওয়ায় আহম্মদনগরনিবাসী শাহশরীফ নামক এক জন মুসলমান পীরের নিকট মল্লজী অনেক অনুরোধ করেন, এবং পীরও মল্লজীর সন্তানার্থে প্রার্থনাদি করেন। তাহারই কিছু পরে

দীপাবাঈয়ের গর্ভে একটি সন্তান হওয়াতে মল্লজী সেই পীরের নামানুসারে পুত্রের নাম শাহজী রাখিলেন।

সে সময়ে যাদবরাও নামক আহম্মদনগরে প্রসিদ্ধনামা এক জন সেনাপতি ছিলেন; তিনি দশ সহস্র অশ্বারোহীর নেতা এবং প্রশস্ত জায়গীর ভোগ করিতেন। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে হুলির দিনে মল্লজী আপন সন্তান শাহজীকে লইয়া যাদবরাওয়ের বাড়ী গিয়াছিলেন। শাহজীর বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র, যাদবরাওয়ের কন্যা জীজীর বয়স তিন কি চারি বৎসর, সুতরাং বালক-বালিকা বড় আনন্দে একত্রে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে যাদবরাও সন্তুষ্ট হইয়া আপন কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"কেমন, তুই এই বালকটিকে বিবাহ করিবি?" পরে অন্যান্য লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"দুই জনে কি সুন্দর যোড় মিলিয়াছে!" এই সময়েই শাহজী ও জীজী পরস্পরের দিকে ফাগ নিক্ষেপ করায় সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল; কিন্তু মল্লজী সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—"বন্ধুগণ! সাক্ষী থাকিও, যাদবরাও আমার বৈবাহিক হইবেন, অদ্য প্রতিশ্রুত হইলেন।" সকলে এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। যাদবরাও উচ্চবংশজ, শাহজীর সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিতে কখনই বাসনা করেন নাই, কিন্তু মল্লজীর এই চতুরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন।

পরদিন যাদবরাও মল্লজীকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু বৈবাহিক বলিয়া স্বীকার না করিলে মল্লজী যাইবেন না বলিয়া পাঠাইলেন। যাদবরাও সেরূপ স্বীকার করিলেন না, সুতরাং মল্লজী আসিলেন না। যাদবরাওয়ের গৃহিণী যাদবরাও হইতেও বংশমর্য্যাদায় অধিক অভিমানিনী। কথিত আছে যে, যাদবরাও রহস্য করিয়া আপন দুহিতার সহিত শাহজীর বিবাহ দিবেন বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার গৃহিণী তাঁহাকে বিলক্ষণ দুই

চারি কথা শুনাইয়া দিলেন। মল্লজী সরোষে একটি গ্রামে চলিয়া গেলেন ও প্রকাশ করিলেন যে, ভবানী সাক্ষাৎ অবতীর্ণা হইয়া তাঁহাকে বিপুল অর্থ দিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে, ভবানী এই সময়ে মল্লজীকে বলিয়াছেন,—মল্লজী! তোমার বংশে এক জন রাজা হইবেন, তিনি শম্ভুর ন্যায় গুণান্বিত হইবেন, মহারাষ্ট্র দেশে ন্যায়বিচার পুনঃস্থাপন করিবেন, এবং ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ের শত্রুদিগকে দূরীভূত করিবেন। তাঁহার সময় হইতে কালগণনা হইবে ও সন্তান-সন্ততি সপ্তবিংশ পুরুষ পর্য্যন্ত সিংহাসনারূঢ় থাকিবেন।

সে যাহা হউক, মল্লজী যে এই সময়ে বিপুল অর্থ পাইয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। সেই অর্থের দ্বারা আত্মোন্নতির চেষ্টা করিলেন ও এ বিষয়ে তাঁহার শ্যালক যোগপালও তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। অচিরে মল্লজী আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি হইলেন ও রাজা খেতাব প্রাপ্ত হইয়া সুবর্ণী ও চাকনদুর্গ এবং তৎপার্শ্বস্থ দেশের ভার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি জায়গীরস্বরূপ পুনা ও সোপানগর পাইলেন। তখন আর যাদবরাওয়ের কোন আপত্তি রহিল না। ১৬০৪ খৃঃ অব্দে মহাসমারোহে শাহজীর সহিত জীজীর বিবাহ হইল, আহম্মদনগরের সুলতান স্বয়ং সেই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। তখন শাহজীর বয়ঃক্রম ১০ বৎসর মাত্র। কালক্রমে মল্লজীর মৃত্যুর পর শাহজী পৈতৃক জায়গীর ও পদ প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময়ে দিল্লীশ্বর আকবরশাহ আহম্মদনগর রাজ্য দিল্লীর অধীনে আনিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছিলেন। আকবরশাহ কতক পরিমাণে জয়লাভ করিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর সম্রাট্ জাহাঙ্গীরও সেই উদ্যমে ব্যাপৃত রহিলেন। এই যুদ্ধকালে শাহজী সুষুপ্ত ছিলেন না। ১৬২০ খৃঃ অব্দে (জাহাঙ্গীরের শাসনকালে) তিনি আহম্মদনগরের প্রধান

সেনাপতি মালীক অম্বরের অধীনে ছিলেন, ও একটি মহাযুদ্ধে আপন সাহস ও বিক্রম প্রকাশ করিয়া সকলেরই সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর সম্রাট্ শাহজিহান সেনাপতি শাহজীকে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি করিয়া অনেক জায়গীর দান করেন। কিন্তু সম্রাট্দিগের অচ্যকার অনুগ্রহ কাল থাকে না; তিন বৎসর পর সম্রাট্ শাহজীর কতকগুলি জায়গীর কাড়িয়া লইলেন। শাহজী বিরক্ত হইয়া বিজয়পুরে সুলতানের পক্ষ অবলম্বন করিলেন, ও মৃত্যু পর্য্যন্ত বিজয়পুরের সুলতানের অধীনে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

পতনোন্মুখ আহম্মদনগর রাজ্যের স্বাধীনতার জন্যও শাহজী দিল্লীর সেনার সহিত অনেক যুদ্ধ করিলেন। সুলতান শত্রুহস্তে পতিত হইলে শাহজী সেই বংশের আর একজনকে সুলতান করিয়া সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, কতকগুলি বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সাহায্যে দেশশাসনের সুন্দর রীতি স্থাপন করিলেন, বহুসংখ্যক দুর্গ হস্তগত করিলেন, ও সুলতানের নামে সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

সম্রাট্ শাহজিহান এই সমস্ত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া শাহজী ও তাঁহার পুত্র বিজয়পুরের সুলতানকে দমন করিবার জন্য বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক প্রেরণ করিলেন। দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধ করা বিজয়পুরের সুলতান বা শাহজীর সাধ্য নহে; কয়েক বৎসর যুদ্ধের পর সন্ধিস্থাপন হইল; আহম্মদনগর রাজ্য বিলুপ্ত হইল (১৬৩৭)। শাহজী বিজয়-পুরের অধীনে জায়গীরদার ও সেনাপতি রহিলেন, এবং সুলতানের আদেশানুসারে কর্ণাট দেশের অনেক অংশ জয় করিলেন। সুতরাং বিজয়পুরের উত্তরে পুনার নিকট তাঁহার যেরূপ জায়গীর ছিল, দক্ষিণ কর্ণাট দেশেও সেইরূপ বহু জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন।

জীজীবাঈয়ের গর্ভে শম্ভুজী ও শিবজী নামে দুই পুত্র হয়। পূর্ব্বেই

লিখিত হইয়াছে যে, জীজীর পিতা যাদবরাও পুরাতন দেবগড়ের হিন্দু-রাজার বংশ হইতে অবতীর্ণ, এরূপ জনশ্রুতি আছে। এ কথা যদি যথার্থ হয়, তবে শিবজী সেই পুরাতন রাজবংশোদ্ভূত সন্দেহ নাই। ১৬৩০ খৃঃ অব্দে শাহজী টুকাবাঈ নাম্নী আর একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অভিমানিনী জীজীবাঈ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামীর সংসর্গ ত্যাগ করিয়া পুত্র শিবজীকে লইয়া পুনার জায়গীরে আসিয়া অবস্থিতি করিতেন। শাহজী টুকাবাঈকে লইয়া কর্ণাটেই থাকিতেন ও তাঁহার গর্ভে বেনকাজী নামে একটি পুত্র হইল।

শাহজীর দুই জন অতি বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও কর্ম্মচারী ছিলেন। তন্মধ্যে দাদাজী কানাইদেব পুনার জায়গীর এবং জীজী ও শিশু শিবজীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

১৬২৭ খৃঃ অব্দে সুবর্ণাদুর্গে শিবজীর জন্ম হয়। এই দুর্গ পুনা হইতে অনুমান ২৫ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। শিবজীর তিন বৎসর বয়সের সময় শাহজী টুকাবাঈকে বিবাহ করিলেন, সুতরাং জীজীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ জন্মিল। জীজী সপুত্র পুনায় আসিয়া দাদাজী কানাই-দেবের রক্ষণাবেক্ষণে বাস করিতে লাগিলেন। শিবজীর বাসার্থে দাদাজী পুনানগরে একটি বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন, আমরা ইতি-পূর্ব্বে সেই গৃহে সায়েস্তা খাঁকে দেখিয়াছি।

মাতাপুত্রে সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন, ও বাল্যকালাবধি শিবজী দাদাজীর নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। শিবজী কখনও নাম লিখিতেও শিখেন নাই, কিন্তু অল্পবয়সেই ধনুর্ব্বাণ ব্যবহার, বর্শা নিক্ষেপ, নানারূপ মহারাষ্ট্রীয় খড়গ ও ছুরিকা চালন এবং অশ্বা-রোহণে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়মাত্রেই অশ্ব-চালনায় তৎপর, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেও শিবজী বিশেষ সুখ্যাতি লাভ

করিলেন। এইরূপ ব্যায়াম ও যুদ্ধশিক্ষায় বালকের দেহ শীঘ্রই সুদৃঢ় ও বলবান্ হইয়া উঠিল।

কিন্তু কেবল অস্ত্রবিদ্যায় শিবজী কাল অতিবাহিত করিতেন না, যখন অবসর পাইতেন, দাদাজীর চরণোপান্তে বসিয়া মহাভারত ও রামায়ণের অনন্ত বীরত্ব গল্প শ্রবণ করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। শুনিতে শুনিতে বালকের হৃদয়ে সাহসের উদ্রেক হইত, হিন্দুধর্ম্মে আস্থা দৃঢ়ীভূত হইত, সেই পূর্ব্বকালীন বীরদিগের বীরত্ব অনুকরণ করিবার ইচ্ছা প্রবল হইত, ধর্ম্মবিদ্বেষী মুসলমানদিগের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিত। এইরূপ কথা শুনিতে শিবজীর এরূপ আগ্রহ ছিল যে, অনেক বৎসর পর যখন তিনি দেশে খ্যাতি ও রাজ্যলাভ করিলেন, তখন পর্য্যন্ত কোন স্থানে কথা হইবে শুনিলে, বহু বিপদ ও বহু কষ্ট সহ্য করিয়াও তথায় উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিতেন।

এইরূপে দাদাজীর যত্নে শিবজী অল্পকালমধ্যেই স্বধর্ম্মানুরক্ত ও অতিশয় মুসলমানবিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন। তিনি ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে স্বাধীন পলীগার হইবার জন্য নানারূপ সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন আপনার ন্যায় উৎসাহী যুবকদিগকে চারিদিকে জড় করিতে লাগিলেন। তিনি পর্ব্বতপরিপূর্ণ কঙ্কণদেশে তাহাদিগের সহিত সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতেন। সেই পর্ব্বত কিরূপে উল্লঙ্ঘন করা যায়, কোথায় পথ আছে, কোন্ পথে কোন্ দুর্গে যাওয়া যায়, কোন্ কোন্ দুর্গ অতিশয় দুর্গম, কিরূপে দুর্গ আক্রমণ বা রক্ষা করা যায়, এ সকল চিন্তায় বালকের দিন অতিবাহিত হইত। কখন কখন কয়েক দিন ক্রমাগত এই পর্ব্বত ও উপত্যকার মধ্যে যাপন করিতেন, কোনও দুর্গ, কোনও পথ, কোনও উপত্যকা শিবজীর অজ্ঞাত ছিল না। শেষে কিরূপে দুই একটি দুর্গ হস্তগত করিবেন, এই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বালকের এইরূপ কথা শুনিয়া ও আচরণ দেখিয়া বৃদ্ধ দাদাজী ভীত হইতে লাগিলেন। তিনি অনেক প্রবোধবাক্য দ্বারা বালককে সে পথ হইতে আনয়ন করিয়া, যাহাতে জায়গীর সুচারুরূপে রক্ষিত হয়, তাহাই শিখাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শিবজীর হৃদয়ে যে বীরত্বের অঙ্কুর স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা আর উৎপাটিত হইল না। শিবজী দাদাজীকে পিতৃতুল্য সম্মান করিতেন, কিন্তু যে পথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিলেন না।

মাউলীজাতীয়দিগের কষ্টসহিষ্ণুতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য শিবজী তাহাদিগকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার যৌবনসুহৃদগণের মধ্যে যশজী-কঙ্ক, তন্নজী-মালশ্রী ও বাজী-ফাসলকর নামক তিন জন মাউলীই প্রিয়তম ও অগ্রগণ্য ছিলেন। পরিশেষে ইঁহাদের সাহায্যে ১৬৪৬ খৃঃ অব্দে তোরণদুর্গের কিল্লাদারকে কোনরূপে বশবর্ত্তী করিয়া শিবজী সেই দুর্গ হস্তগত করিলেন। এই আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই তোরণদুর্গের বর্ণনা করা হইয়াছে, এই প্রথম বিজয়ের সময় শিবজীর বয়ঃক্রম ঊনবিংশ বর্ষ মাত্র। ইহারই পরবৎসর তোরণদুর্গের দেড় ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটি তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গের উপর শিবজী একটি নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার নাম রাজগড় রাখিলেন।

বিজয়পুরের সুলতান এই সমস্ত বিষয়ের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া শিবজীর পিতা শাহজীকে তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন, ও এই সমস্ত উপদ্রবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিজয়পুরের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী শাহজী এ সমস্ত বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না, তিনি দাদাজীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দাদাজী কানাইদেব শিবজীকে পুনরায় ডাকাইলেন। এইরূপ আচরণে সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা, তাহা অনেক বুঝাইলেন। তাঁহার পিতা বিজয়পুরের অধীনে কার্য্য করিয়া

কিরূপ বিপুল অর্থ, জায়গীর, ক্ষমতা ও সম্মান লাভ করিয়াছেন, তাহাও বুঝাইলেন। শিবজী পিতৃসদৃশ দাদাজীকে আর কি বলিবেন, মিষ্ট-বাক্য দ্বারা উত্তর দান করিলেন, কিন্তু আপন কার্য্যে নিরস্ত হইলেন না। ইহার কিছু দিন পরেই দাদাজীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর প্রাক্কালেই দাদাজী শিবজীকে আর একবার ডাকাইয়া নিকটে আনেন। বৃদ্ধ পুনরায় ভৎর্সনা করিবেন, এই বিবেচনা করিয়া শিবজী তথায় যাইলেন, কিন্তু যাহা শুনিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইলেন। মৃত্যুশয্যায় যেন দাদাজীর দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি শিবজীকে সস্নেহে বলিলেন,—বৎস, তুমি যে চেষ্টা করিতেছ, তাহা হইতে মহত্তর চেষ্টা আর নাই। এই উন্নত পথ অনুসরণ কর, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা কর; ব্রাহ্মণ, গোবৎসাদি এবং কৃষকগণকে রক্ষা কর, দেবালয় কলুষিত-কারীদিগকে শাস্তি প্রদান কর, ঈশানী যে উন্নত পথ তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই পথ অনুসরণ কর। এই বলিয়া বৃদ্ধ চির-নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। শিবজীর হৃদয় এই দিব্য উপদেশ পাইয়া উৎসাহ ও সাহসে দশগুণ স্ফীত হইয়া উঠিল। তখন শিবজীর বয়ঃক্রম বিংশ বর্ষ মাত্র।

সেই বৎসরেই চাকন ও কান্দানা দুর্গের কিল্লাদারগণকে অর্থে বশীভূত করিয়া শিবজী উভয় দুর্গ হস্তগত করেন, ও কান্দানার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া সিংহগড় নাম রাখেন। আখ্যায়িকায় চাকন ও সিংহগড়ের কথা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। শিবজীর বিমাতা টুকা-বাঈয়ের ভ্রাতা বাজী মোপা দুর্গের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদিন দ্বিপ্রহর রজনীতে আপন মাউলী সৈন্য লইয়া শিবজী এই দুর্গ সহসা আক্রমণ করিয়া হস্তগত করেন। মাতুলের প্রতি কোনও অত্যাচার না করিয়া তাঁহাকে কর্ণাটে পিতার নিকট পাঠাইয়া দেন। তৎপরে

পুরন্দর দুর্গের অধীশ্বরের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে ভ্রাতৃকলহ হয়, শিবজী কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতার সহায়তা করিবার ছলে আপনি সেই দুর্গ হস্তগত করেন। এই আচরণে তিন ভ্রাতাই শিবজীর উপর বিরক্ত হইলেন, কিন্তু শিবজী যখন দেশের স্বাধীনতা রক্ষারূপ আপন মহৎ উদ্দেশ্য তাঁহাদিগকে ব্যক্ত করিলেন, যখন সেই উদ্দেশ্যসাধন জন্য ভ্রাতৃগণ হইতে সহায়তা যাচ্ঞা করিলেন, তখন তাঁহাদিগের ক্রোধ রহিল না, শিবজীর মহৎ উদ্দেশ্য সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া তিন ভ্রাতাই শিবজীর অধীনে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

এইরূপে শিবজী একে একে অনেক দুর্গ হস্তগত করেন, তাহা-দিগের নাম লিখিয়া এই আখ্যায়িকা পূর্ণ করিবার আবশ্যক নাই। ১৬৪৮ খৃঃ অব্দে শিবজীর কর্ম্মচারী আবাজী স্বর্ণদেব কল্যাণদুর্গ ও সমস্ত কল্যাণীপ্রদেশ জয় করিলেন। তখন বিজয়পুরের সুল্‌তান ক্রুদ্ধ হইয়া শিবজীর পিতা শাহজীকে কারারুদ্ধ করিলেন ও আদেশ করিলেন যে, নিয়মিত সময়ের মধ্যে শিবজী অধীনতা স্বীকার না করিলে সেই কারাগৃহের দ্বার প্রস্তর দ্বারা একেবারে রুদ্ধ হইবে। শিবজী দিল্লীশ্বরের নিকট আবেদন করিয়া পিতার প্রাণ বাঁচাইলেন, কিন্তু চারি বৎসর কাল শাহজী বিজয়পুরে বন্দীস্বরূপ রহিলেন।

জৌলীর রাজা চন্দ্ররাওকে শিবজী স্বপক্ষে আনিবার জন্য ও মুসলমানের অধীনতা-শৃঙ্খল চূর্ণ করিবার জন্য অনেক পরামর্শ দেন। চন্দ্ররাও যখন তাহা একেবারে অস্বীকার করিলেন, তখন শিবজী নিজ লোক দ্বারা সেই রাজা ও তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করাইয়া সহসা রাত্রিযোগে আক্রমণ করত সেই দুর্গ হস্তগত করেন। তিনি সমস্ত জৌলীপ্রদেশ অধিকার করিলেন এবং ঐ বৎসরেই প্রতাপগড় নামক একটি নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন। ইহার দুই বৎসর পর শিবজী

মুরেশ্বর ও ত্রিমুল পিঙ্গলীকে পেশোয়া করেন, এবং সমস্ত কঙ্কণপ্রদেশ জয় করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন।

এবার বিজয়পুরের সুল্‌তান শিবজীকে একেবারে ধ্বংস করিবার মানস করিলেন। ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে আবুল ফাজেল নামক এক জন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ৫০০০ অশ্বারোহী ও ৭০০০ পদাতিক ও বহুসংখ্যক কামান লইয়া যাত্রা করিলেন। তিনি গর্ব্বিতভাবে প্রকাশ করিলেন যে, শীঘ্রই অকিঞ্চিৎকর বিদ্রোহীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সুল্‌তানের পায়তখ্‌তের নিকট উপস্থিত করিবেন।

এত সৈন্যের সহিত সম্মুখযুদ্ধ অসম্ভব; শিবজী সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। আবুল ফাজেল গোপীনাথ নামক একজন ব্রাহ্মণকে শিবজী-সদনে প্রেরণ করিলেন। প্রতাপগড় দুর্গের নিকট সভামধ্যে দূতের সহিত সাক্ষাৎ ও নানারূপ কথাবার্ত্তা হইল, রজনী যাপনার্থে গোপীনাথের জন্য একটি স্থান নির্দ্দেশ করা হইল।

রজনীযোগে শিবজী গোপীনাথের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। শিবজীর অসাধারণ বাক্‌পটুতা ছিল, তিনি গোপীনাথকে অনেক প্রকার বুঝাইয়া বলিলেন,—আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি আমার শ্রেষ্ঠ, কিন্তু আমার কথাগুলি শ্রবণ করুন। আমি যাহা করিয়াছি, সমস্তই হিন্দুজাতির জন্য, হিন্দুধর্ম্মের জন্য করিয়াছি। স্বয়ং ভবানী আমাকে ব্রাহ্মণ ও গোবৎসাদিকে রক্ষা করিবার জন্য উত্তেজনা করিয়াছেন, হিন্দু দেব ও দেবালয়ের নিগ্রহকারীদিগকে দণ্ড দিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, ও স্বধর্ম্মের শত্রুর বিরুদ্ধাচরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্মণ, ভবানীর আদেশ সমর্থন করুন; এবং আপন জাতীয় ও দেশীয় লোকের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বাস করুন।

গোপীনাথ এই সমস্ত বাক্যে তুষ্ট হইয়া শিবজীর সহায়তা করিতে

স্বীকার করিলেন; পরামর্শ স্থির হইল যে, কার্য্যসিদ্ধির জন্য আবুল ফাজেলের সহিত শিবজীর কোন স্থানে সাক্ষাৎ করা আবশ্যক।

কয়েক দিন পর প্রতাপগড় দুর্গের নিকটেই সাক্ষাৎ হইল। আবুল ফাজেলের পঞ্চদশ শত সেনা দুর্গ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে রহিল, তিনি স্বয়ং একমাত্র সহচরের সহিত শিবিকারোহণে নির্দ্দিষ্ট গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবজী সেই দিন বহু যত্নে প্রাতে স্নানপূজাদি সমাপন করিলেন; স্নেহময়ী মাতার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিলেন; তুলার কুর্ত্তি ও উষ্ণীষের নীচে লৌহ বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ ধারণ করিলেন; অবশেষে শিবজী দুর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ও বাল্যসহচর তন্নজী-মালশ্রীকে সঙ্গে লইয়া আবুল ফাজেলের নিকটে আসিলেন। সহসা আলিঙ্গনচ্ছলে তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা মুসলমানকে ভূতলশায়ী করিলেন! তৎক্ষণাৎ শিবজীর সেনা আবুল ফাজেলের সেনাকে পরাস্ত করিল, এবং শিবজী অনেক দুর্গ হস্তগত করিয়া বিজয়পুরের দ্বার পর্য্যন্ত যাইয়া দেশ লুণ্ঠন করিয়া আসিলেন।

বিজয়পুরের সহিত যুদ্ধ আরও তিন বৎসর পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল, কিন্তু কোন পক্ষই বিশেষ জয়লাভ করিতে পারিল না। অবশেষে ১৬৬২ খৃঃ অব্দে শাহজী মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিজয়পুর ও শিবজীর মধ্যে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া দিলেন। শাহজী যখন শিবজীকে দেখিতে আসিলেন, শিবজী পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আপনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া পিতাকে রাজার তুল্য অভিবাদন করিলেন, পিতার শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন ও পিতা বসিতে আদেশ করিলেও তিনি পিতার সম্মুখে আসন গ্রহণ করিলেন না। কয়েক দিন পুত্রের নিকট থাকিয়া শাহজী পরম তুষ্ট হইয়া বিজয়পুরে যাইলেন ও সন্ধি সংস্থাপন করিয়া দিলেন। শিবজী

পিতা কর্ত্তৃক সংস্থাপিত এই সন্ধির বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, শাহজীর জীবদ্দশায় বিজয়পুরের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করেন নাই। তাহার পরও যখন যুদ্ধ হয়, সে সময়ে শিবজী আক্রমণকারী ছিলেন না।

১৬৬২ খৃঃ অব্দে এই সন্ধি স্থাপন হয়, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই বৎসরেই মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়। আমাদের আখ্যায়িকাও এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভের সময় সমস্ত কঙ্কণপ্রদেশ শিবজী অধিকৃত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সপ্ত সহস্র অশ্বারোহী ও পঞ্চাশৎ সহস্র পদাতিক সেনা ছিল। শিবজীর বয়স তখন পঞ্চত্রিংশ বৎসর।

নবম পরিচ্ছেদ

শুভকার্য্য সম্পাদন

যুগে যুগে কল্পে কল্পে শিখা নিরন্তর,
জ্বলুক গগনব্যাপী অনন্ত বহ্নিতে।
জ্বলুক সে দেবতেজ স্বর্গ সংবেষ্টিয়া,
অহোরাত্রি অবিশ্রান্ত প্রদীপ্ত শিখায়,
দহুক দানবকুল দেবের বিক্রমে,
পুত্রপরম্পরা দগ্ধ চির শোকানলে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূর্য্য অস্তাচল-চূড়া অবলম্বন করিয়াছেন, সিংহগড় দুর্গের ভিতর সৈন্যগণ নিঃশব্দে সজ্জিত হইতেছে, এরূপ নিঃশব্দে যে, দুর্গের বাহিরের লোকও দুর্গের ভিতর কি হইতেছে, তাহা জানিতে পারে নাই।

দুর্গের একটি উন্নত স্থানে কয়েক জন মহাযোদ্ধা দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, সেই দুর্গচূড়া হইতে দৃশ্য অতি মনোহর। পূর্ব্বদিকে সুন্দর নীরানদী প্রবাহিত হইয়াছে, সেই নদীর উপত্যকা বসন্তকালের নব পুষ্পপত্র ও দূর্ব্বাদলে সুশোভিত হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে। উত্তরদিকে বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র, বহুদূর পর্য্যন্ত সুন্দর হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে। বহুদূরে বিস্তীর্ণ পুনানগরী সুন্দর শোভা পাইতেছে, যোদ্ধগণ প্রায় সেই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, অদ্য রজনীতে

সেই নগরীতে কি বিষম ঘটনা সংঘটিত হইবে, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে পর্ব্বতের পর পর্ব্বত, যতদূর দেখা যায়, অনন্ত পর্ব্বত অস্তাচলচূড়াবলম্বী সূর্য্যকিরণে অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছে। কিন্তু বোধ করি, যোদ্ধগণ এই চমৎকার পর্ব্বতদৃশ্যের বিষয় ভাবিতেছিলেন না, অন্য চিন্তায় অভিভূত রহিয়াছেন।

যে যুদ্ধে বা যে অসমসাহসিক কার্য্যে একেবারে বহুকালের বাঞ্ছিত ফললাভ হইতে পারে, বা এককালে সর্ব্বনাশ হইতে পারে, তাহার প্রাক্কালে মুহূর্ত্তের জন্য অতিশয় সাহসিক হৃদয়ও চিন্তাপূর্ণ হয়। অদ্য সায়েস্তা খাঁ ও মোগল সৈন্য ছিন্নভিন্ন ও পরাভূত হইবে, অথবা অসমসাহসে মহারাষ্ট্রসূর্য্য একেবারে চির অন্ধকারে অস্ত যাইবে, এইরূপ চিন্তা অগত্যা যোদ্ধদিগের হৃদয়ে উদ্রেক হইতে লাগিল। কেহ এ চিন্তা ব্যক্ত করিলেন না, তথাপি যখন নিঃশব্দে যোদ্ধা যোদ্ধার দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, তখন কাহারও মনোগত ভাব লুক্কায়িত রহিল না। কেবল বিংশ বা পঞ্চবিংশ মাত্র সেনা লইয়া শিবজী শত্রুসেনার মধ্যে যাইয়া আক্রমণ করিবেন, এরূপ ভীষণ কার্য্যে শিবজী কখনও লিপ্ত হইয়াছেন কি না সন্দেহ। কেনই বা যোদ্ধদিগের ললাট মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা-মেঘাচ্ছন্ন না হইবে ?

সেই বীরমণ্ডলীর মধ্যে বহুদর্শী পেশোয়া মুরেশ্বর ত্রিমূল ছিলেন। অল্পবয়সে তিনি শিবজীর পিতা শাহজীর অধীনে যুদ্ধব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, পরে শিবজীর অধীনে আসিয়া প্রতাপগড়ের চমৎকার দুর্গ তিনিই নির্ম্মাণ করেন। চারি বৎসরাবধি পেশোয়াপদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি সেই পদের যোগ্যতা বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আবুল ফাজেলকে শিবজী হত্যা করিলে পর মুরেশ্বরই তাঁহার সেনাকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিয়াছিলেন, পরে মোগলদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ

হওনাবধি তিনিই পদাতিক সৈন্যের সরনৌবৎ অর্থাৎ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। যুদ্ধকালে সাহসী, বিপদ্‌কালে স্থির ও অবিচলিত, পরামর্শে বুদ্ধিমান্‌ ও দূরদর্শী, মুরেশ্বর অপেক্ষা কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী ও প্রকৃত বন্ধু শিবজীর আর কেহ ছিল না।

আবাজী স্বর্ণদেব নামে তথায় দ্বিতীয় এক জন দূরদর্শী ও যুদ্ধপটু ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম নীলপন্ত স্বর্ণদেব, কিন্তু আবাজী নামেই তিনি খ্যাত ছিলেন। তিনিই ১৬৪৮ খৃঃ অব্দে কল্যাণদুর্গ ও সমস্ত কল্যাণী প্রদেশ হস্তগত করেন এবং সম্প্রতি রায়গড়ের প্রসিদ্ধ দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধনামা অন্নজীদত্তও অদ্য সিংহগড়ে উপস্থিত ছিলেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনি পবনগড় হস্তগত করেন, এবং শিবজীর কর্ম্মচারীর মধ্যে একজন প্রধান ও অতিশয় কার্য্যদক্ষ ছিলেন।

অশ্বারোহীর সরনৌবৎ অর্থাৎ সেনাপতি নিতাইজী সিংহগড়ে ছিলেন না; তিনি কিরূপে মোগলসৈন্যের সম্মুখ দিয়া যাইয়া আরঙ্গাবাদ ও আহম্মদনগর ছারখার করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা আমরা সায়েস্তা খাঁর সভায় চাঁদ খাঁর প্রমুখাৎ শুনিয়াছি। সিংহগড়ে সে সময়ে কেবল অল্পসংখ্যক অশ্বারোহী সেনা কর্ত্তাজী গুজ্জর নামক এক জন নীচস্থ সেনানীর অধীনে অবস্থিতি করিতেছিল।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে শিবজীর তিন জন প্রধান মাউলী বাল্য-সুহৃদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বাজী ফাসলকরের তিন বৎসর পূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। তন্নজী-মালশ্রী ও যশজী-কঙ্ক অদ্য সিংহগড়ে উপস্থিত ছিলেন। বাল্যকালের সৌহার্দ্দ্য, যৌবনের বিষম সাহস, ইঁহারা এখনও ভুলেন নাই। ইঁহারা শিবজীকে প্রাণসম ভালবাসিতেন, শতবার রজনীযোগে মাউলী সৈন্য লইয়া শিবজীর সহিত

শত পর্ব্বতদুর্গ নিঃশব্দে আরোহণ করিয়া সহসা অধিকার করিয়াছিলেন।

সূর্য্য অস্ত গেল। সন্ধ্যার ছায়া যেমন স্তরে স্তরে জগতে অবতীর্ণ হইতেছে, তখনও সেই যোদ্ধমণ্ডলী দুর্গশৃঙ্গে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান, এমত সময়ে শিবজী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক, ভয়ের লেশমাত্র দৃষ্ট হয় না। বস্ত্রের নীচে তিনি বর্ম্ম ও অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, অদ্য নিশির অসমসাহসিক কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, যোদ্ধার নয়ন উজ্জ্বল, দৃষ্টি স্থির ও অবিচলিত।

শিবজী ধীরে ধীরে বলিলেন,—সমস্ত প্রস্তুত, বন্ধুগণ বিদায় দিন।

মুরেশ্বর। তবে স্থির করিয়াছেন, অদ্য রজনীতে স্বর্ণদেব কি অন্নজী কি আমাকে সঙ্গে যাইতে দিবেন না? মহাত্মন্! বিপদ্‌কালে কবে আমরা আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছি?

শিবজী। পেশোয়াজী! ক্ষমা করুন, আর অনুরোধ করিবেন না। আপনাদের সাহস, আপনাদের বিক্রম, আপনাদের বিজ্ঞতা আমার নিকট অবিদিত নাই, কিন্তু অদ্য ক্ষমা করুন। ভবানীর আদেশে আমি অদ্য বিষম প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অদ্য আমিই এই কার্য্য সাধন করিব, নচেৎ অকিঞ্চিৎকর প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। আশীর্ব্বাদ করুন, জয়লাভ করিব; কিন্তু যদি অমঙ্গল হয়, যদি অদ্যকার কার্য্যে নিধন প্রাপ্ত হই, তথাপি আপনারা তিন জন থাকিলে মহারাষ্ট্রের সকলেই রহিল। আপনারা আমার সহিত বিনষ্ট হইলে কাহার দূরদর্শী বুদ্ধিবলে দেশ থাকিবে? কাহার বাহুবলে স্বাধীনতা থাকিবে? হিন্দুগৌরব কে রক্ষা করিবে? যাত্রাকালে আর অনুরোধ করিবেন না।

পেশোয়া বুঝিলেন, আর অনুরোধ করা বৃথা, সুতরাং আর কিছু

বলিলেন না। তখন অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বরে শিবজী পেশোয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—মুরেশ্বর, আপনি পিতার নিকট কার্য্য করিয়াছেন, আপনি আমার পিতৃতুল্য; আশীর্ব্বাদ করুন যেন আজ জয়লাভ করিতে পারি, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ অবশ্যই ফলিবে। আবাজী! অন্নজী! আশীর্ব্বাদ করুন, আমি কার্য্যে প্রস্থান করি।

মুরেশ্বর, আবাজী ও অন্নজী সজলনয়নে মহারাষ্ট্র-বীরকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপর শিবজী তাঁহার মাউলী সুহৃদদ্বয় তন্নজী ও যশজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—বাল্যসুহৃদ্! বিদায় দাও।

তন্নজী। প্রভু! কি অপরাধে আমাদিগকে সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিতেছেন? কোন্ নৈশ ব্যাপারে, কোন্ দুর্গজয়ের সময় আমরা প্রভুর সঙ্গে না ছিলাম? পূর্ব্বকাল স্মরণ করিয়া দেখুন, কঙ্কণ-দেশে আপনার সহিত কে ভ্রমণ করিত? শৈলচূড়, উপত্যকায়, পর্ব্বত-গহ্বরে, তরঙ্গিনীতীরে কে আপনার সহিত দিবায় শীকার করিত, রজনীতে একত্র শয়ন করিত, বা দুর্গজয়ের পরামর্শ করিত? যশজী, মৃত বাজী, আর এই দাস তন্নজী। বাজী প্রভুর কাজে হত হইয়াছে, আমাদেরও তাহা ভিন্ন অন্য বাসনা নাই। অনুমতি করুন, অদ্য প্রভুর সঙ্গে যাই, জয়লাভ হইলে প্রভুর আনন্দে আনন্দিত হইব, যদি প্রভু বিনষ্ট হন, আমাদের এ স্থানে জীবিত থাকিলে কোন উপকার নাই। আমাদের এরূপ বুদ্ধিবল নাই যে, রাজকার্য্যে কোন সাহায্য করি। আপনার বাল্যসুহৃদ্‌কে বঞ্চিত করিবেন না।

শিবজী দেখিলেন, তন্নজীর চক্ষে জল। মুগ্ধ হইয়া তন্নজী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—ভ্রাতঃ! তোমাদিগকে অদেয় আমার কিছুই নাই, শীঘ্র রণসজ্জা করিয়া লও।

তৎপরে শিবজী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দুঃখিনী জীজী

একাকী একটি ঘরে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, পুত্রের অন্ধকার বিপদে রক্ষা প্রার্থনা করিতেছিলেন, এমত সময়ে শিবজী আসিয়া বলিলেন,—মাতঃ! আশীর্ব্বাদ করুন, বিদায় হই।

জীজী স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন,—বৎস! আইস, একবার তোমাকে আলিঙ্গন করি। কবে তোমার এ বিপদ্‌রাশি শেষ হইবে, কবে এ দুঃখিনীর শোক ও চিন্তা শেষ হইবে।

শিবজী। মাতঃ! আপনার আশীর্ব্বাদে কবে কোন্ বিপদ্ হইতে উদ্ধার না হইয়াছি? কোন্ যুদ্ধে জয়ী না হইয়াছি?

জীজী। বৎস! দীর্ঘজীবী হও, ঈশানী তোমাকে রক্ষা করুন। এই বলিয়া মাতা সস্নেহে শিবজীর মস্তকে হাত দিলেন, দুই নয়ন বহিয়া অশ্রুজল শীর্ণ বক্ষঃস্থলের উপর পড়িতে লাগিল।

শিবজী সকলের নিকট বিদায় লইয়াছেন; এতক্ষণ তাঁহার দৃষ্টি স্থির ও স্বর অকম্পিত ছিল। এক্ষণে আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, চক্ষুর্দ্বয় ছলছল করিতে লাগিল। উদ্বেগকম্পিত স্বরে শিবজী বলিলেন,—স্নেহময়ি জননি! আপনিই আমার ঈশানী, আপনাকে যেন ভক্তিভাবে চিরজীবন পূজা করি, আপনার আশীর্ব্বাদে সকল বিপদ্ তুচ্ছ জ্ঞান করিব

বৃদ্ধা জীজী বহু অশ্রুপাত করিয়া বিদায়কালে বলিলেন,—বৎস! হিন্দুধর্ম্মের জয়সাধন কর, স্বয়ং দেবরাজ শম্ভু তোমার সাহায্য করিবেন। আমার পিতৃকুল দেবগড়ের অধিপতি ছিলেন, হিন্দুধর্ম্মের অবলম্বন ছিলেন। বাছা! আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমিও মহারাষ্ট্রদেশে রাজা হও, দাক্ষিণাত্যে হিন্দুধর্ম্মের অবলম্বন হও।

সমস্ত সেনা সজ্জিত। শিবজী নিঃশব্দে অশ্বারোহণ করিলেন। নিঃশব্দে সৈন্যগণ দুর্গদ্বার অতিক্রম করিল।

দুর্গদ্বার অতিক্রম করিবার সময়ে একজন অতি অল্পবয়স্ক যোদ্ধা

শিবজীর সম্মুখে আসিয়া শির নামাইল। শিবজী তাহাকে চিনিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—রঘুনাথজী হাবিলদার! এ সময়ে তোমার কি প্রার্থনা?

রঘুনাথ। প্রভু, যে দিন তোরণ-দুর্গ হইতে পত্রাদি আনিয়াছিলাম, সে দিন প্রসন্ন হইয়া পুরস্কার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

শিবজী। অদ্য এই উৎকট ব্যাপারের প্রারম্ভে কি পুরস্কার চাহিতে আসিয়াছ?

রঘুনাথ। এই পুরস্কার চাই যে, ঐ উৎকট ব্যাপারে আমাকে যাইতে দিন। যে পঞ্চবিংশ মাউলী যোদ্ধার সহিত পুনানগরে প্রবেশ করিবেন, দাসকে তাহাদের সহিত যাইতে আদেশ করুন।

শিবজী। রাজপুতবালক! কেন ইচ্ছাপূর্ব্বক এ সঙ্কটে আসিতেছ? অল্পবয়সে কেন প্রাণ হারাইতে উৎসুক হইয়াছ?

রঘুনাথ। রাজন্! আপনার সঙ্গে যাইলে প্রাণ হারাইব, এরূপ আশঙ্কা করি না। যদি হারাই, আমার জন্য আক্ষেপ করিবে, জগতে এরূপ কেহই নাই। আর যদি প্রভুকে কার্য্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারি, জীবিত থাকিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারি, তবে,—তবে ভবিষ্যতে আমার মঙ্গল।

রঘুনাথের সেই কৃষ্ণ কেশগুচ্ছগুলি ভ্রমরবিনিন্দিত নয়নের উপর পড়িয়াছে, বালকের সরল উদার মুখমণ্ডলে যোদ্ধার স্থিরপ্রতিজ্ঞা বিরাজ করিতেছে। অল্পবয়স্ক যোদ্ধার এইরূপ কথা শুনিয়া ও উদার মুখমণ্ডল দেখিয়া শিবজী সন্তুষ্ট হইলেন, ও সঙ্গে পুনার ভিতর যাইতে অনুমতি দিলেন। রঘুনাথ আবার শির নত করিয়া পরে লম্ফ দিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন।

সিংহগড় হইতে পুনা পর্য্যন্ত সমস্ত পথে শিবজী নিজ সৈন্য

রাখিলেন। সন্ধ্যায় ছায়ায় নিঃশব্দে সেই পথের স্থানে স্থানে সেনা-সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন। একটি দীপ জ্বলিলে বা সৈন্যেরা শব্দ করিলে পুনায় তাঁহার এই গুপ্ত কার্য্য প্রকাশ হইতে পারে, সুতরাং নিঃশব্দে অন্ধকারে সৈন্য-সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন।

সে কার্য্য শেষ হইল, রজনী জগতে গাঢ় অন্ধকার বিস্তার করিল। শিবজী, তন্নজী ও যশজী ২৫ জন মাত্র মাউলী লইয়া পুনার নিকটে একটি বৃহৎ বাগানে পৌঁছিয়া তথায় লুক্কায়িত রহিলেন। রঘুনাথ ছায়ার মত প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ রহিলেন।

আরও গাঢ়তর অন্ধকার সেই আম্রকাননকে আবৃত করিল, সন্ধ্যার শীতল বায়ু আসিয়া সেই কাননের মধ্যে মর্ম্মর শব্দ করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পথিক একে একে সেই কাননের পার্শ্ব দিয়া পুনাভিমুখে চলিয়া যাইল, নিবিড় অন্ধকার ভিন্ন আর কিছু দেখিল না, পত্রের মর্ম্মর শব্দ ভিন্ন আর কিছু শ্রবণ করিল না।

ক্রমে পুনার গোলমাল নিস্তব্ধ হইল, দীপাবলী নির্ব্বাণ হইল, নিস্তব্ধ নগরে কেবল প্রহরিগণ এক একবার উচ্চ শব্দ করিতে লাগিল, ও সময়ে সময়ে শৃগালের স্বর বায়ুপথে আসিতে লাগিল। ঢং ঢং ঢং সহসা শব্দ হইয়া উঠিল, শিবজীর হৃদয় চমকিত হইল। সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন, গলির মধ্যে শব্দ হইতেছিল, নগরের বাহির হইতে দেখা যায় না।

ঢং ঢং ঢং পুনরায় শব্দ হইল, আবার চাহিয়া দেখিলেন। বহু লোকে দীপাবলী লইয়া বাদ্য করিতে করিতে প্রশস্ত পথ দিয়া আসিতেছে,—এই বরযাত্রা!

বরযাত্রা নিকটে আসিল। পুনার চারিদিকে প্রাচীর নাই, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। পথ লোকে সমাকীর্ণ ও নানা বাদ্যযন্ত্র দ্বারা অতি উচ্চরব হইতেছে। অনেক অশ্বারোহী; অধিকাংশ পদাতিক।

শিবজী নিঃশব্দে বাল্যসুহৃদ্ তন্নজী ও যশজীকে আলিঙ্গন করিলেন। পরস্পরে পরস্পরের দিকে চাহিলেন মাত্র। "হয় ত এই শেষ বিদায়" —এই ভাব সকলের মনে জাগরিত হইল ও নয়নে ব্যক্ত হইল, কিন্তু বাক্য অনাবশ্যক। নিঃশব্দে শিবজী ও তাঁহার লোক সেই যাত্রীদিগের সহিত মিশিয়া গেলেন।

যাত্রিগণ সায়েস্তা খাঁর বাটীর নিকট দিয়া যাইল, বাটীর কামিনীগণ গবাক্ষে আসিয়া সেই বহুলোক-সমারোহ দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে যাত্রিগণ চলিয়া গেল ; কামিনীগণও শয়ন করিতে গেলেন। যাত্রী-দিগের মধ্যে প্রায় ত্রিংশৎ জন খাঁ সাহেবের গৃহের নিকট লুকায়িত রহিল, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না। ক্রমে বরযাত্রার গোল থামিয়া গেল।

রজনী আরও গভীর হইল। সায়েস্তা খাঁর রন্ধনগৃহের উপর একটি গবাক্ষ ছিল, তথায় অল্প অল্প শব্দ হইতে লাগিল। খাঁ সাহেবের পরি-বারের কামিনীগণ সকলে নিদ্রিত অথবা নিদ্রালু, সে শব্দ শুনিয়াও গ্রাহ্য করিলেন না।

একখানি ইষ্টকের পর আর একখানি, পরে আর একখানি সরিল, ঝুর্-ঝুর্ করিয়া বালুকা পড়িল। নারীগণ সন্দিগ্ধ হইয়া দেখিতে আসিলেন, ছিদ্রের ভিতর দিয়া একজন, পরে আর একজন, পরে আর একজন যোদ্ধা পিপীলিকা-সারের ন্যায় গৃহে প্রবেশ করিতেছে। তখন চীৎকার শব্দ করিয়া যাইয়া সায়েস্তা খাঁর নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে সমুদয় অবগত করিলেন।

শিবজী সন্ধিপ্রার্থনায় মিনতি করিতেছেন, খাঁ সাহেব এইরূপ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। সহসা জাগরিত হইয়া শুনিলেন, শিবজী পুনা হস্তগত করিয়া তাঁহার প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছেন।

পলায়নার্থে এক দ্বারে আসিলেন, দেখিলেন, বর্ম্মধারী মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা! অন্য দ্বারে আসিলেন, তাই দেখিলেন। সভয়ে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিলেন, গবাক্ষ দিয়া পলাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমত সময়ে শুনিলেন, "হর হর মহাদেও" বলিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ পার্শ্বের গৃহ পরিপূর্ণ করিল।

তখন রাজপুরী আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া চারিদিকে গোল হইল। প্রাসাদের রক্ষকগণ সহসা আক্রান্ত হইয়া হতজ্ঞান হইয়াছিল, অনেকেই হত ও আহত হইয়াছিল। তথাপি অবশিষ্ট লোক প্রভুর রক্ষার্থ দৌড়িয়া আসিল ও সেই পঞ্চবিংশ জন মাউলীকে চারিদিকে বেষ্টন করিল।

শীঘ্রই ভীষণরবে সেই প্রাসাদ পরিপূরিত হইল। প্রাসাদের দীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে, অন্ধকারে মাউলীগণ চীৎকার করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, অন্ধকারে হিন্দু ও মুসলমান যুদ্ধ করিতেছে। কবাটের ঝনঝনা শব্দ, আক্রমণকারীদিগের মুহুর্ম্মুহুঃ উল্লাসরব, এবং আক্রান্ত ও আহতদিগের আর্ত্তনাদে প্রাসাদ পরিপূরিত হইল। সেই সময়ে শিবজী বর্শাহস্তে লম্ফ দিয়া যোদ্ধাদিগের মধ্যে পড়িলেন, "হর হর মহাদেও" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। মাউলীগণ সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, মোগল প্রহরিগণ পলায়ন করিল, অথবা সমস্ত হত ও আহত হইল। শিবজী ভীষণ বর্শাঘাতে দ্বার ভগ্ন করিয়া সায়েস্তা খাঁর শয়নঘরে আসিয়া পড়িলেন।

সেনাপতির রক্ষার্থে তৎক্ষণাৎ কয়েক জন মোগল সেই ঘরে ধাবমান হইল। শিবজী দেখিলেন, সম্মুখে মৃত চাঁদ খাঁর বিক্রমশালী পুত্র শমশের খাঁ! পিতা অপমানিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে, তথাপি পুত্র সেই প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ও অগ্রগণ্য। শিবজী এক মুহূর্ত্ত দণ্ডায়মান হইলেন, কোষে খড়্গ রাখিয়া বলিলেন,—যুবক, তোমার

পিতার রক্তে এখনও আমার হস্ত কলুষিত রহিয়াছে, তোমার জীবন লইব না, পথ ছাড়িয়া দাও।

শমশের খাঁ উত্তর করিলেন না। শমশের খাঁর নয়ন অগ্নিবৎ জ্বলন্ত। শিবজী আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইবার পূর্ব্বেই শমশেরের উজ্জ্বল খড়্গ আপন মস্তকোপরি দেখিলেন।

শিবজী মুহূর্ত্তের জন্য প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া ইষ্টদেবতা ভবানীর নাম লইলেন। সহসা দেখিলেন, পশ্চাৎ হইতে একটি বর্শা আসিয়া খড়্গধারী শমশেরকে ভূতলশায়ী করিল। পশ্চাতে দেখিলেন, রঘুনাথজী হাবিলদার!

শিবজী। হাবিলদার! এ কার্য্য আমার স্মরণ থাকিবে। কেবল এইমাত্র বলিয়া শিবজী অগ্রসর হইলেন।

এই অবসরে গবাক্ষ দিয়া রজ্জু অবলম্বন করিয়া সায়েস্তা খাঁ পলাইলেন। কয়েক জন মাউলী সেই গবাক্ষমুখে ধাবমান হইয়াছিল, একজন খড়্গের আঘাত করিয়াছিল, তাহা সায়েস্তা খাঁর অঙ্গুলীতে লাগিয়া একটি অঙ্গুলী ছেদন হইল, কিন্তু সায়েস্তা খাঁ আর পশ্চাতে না দেখিয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার পুত্র আবদুল ফতে খাঁ ও সমস্ত প্রহরী নিহত হইল। তখন শিবজী দেখিলেন, ঘর, প্রাঙ্গণ, বারান্দা রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে প্রহরিগণের মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে, স্ত্রীলোক ও পলাতকগণের আর্ত্তনাদে প্রাসাদ পরিপূরিত হইতেছে, মাউলীগণ মোগলদিগের ধ্বংসসাধনার্থ চারিদিকে ধাবমান হইতেছে। মশালের অস্পষ্ট আলোকে কাহারও মৃতদেহ, কাহারও ছিন্ন মুণ্ড, কোথাও বা রক্তপ্রণালী ভীষণ দেখাইতেছিল। তখন শিবজী আপন মাউলীদিগকে নিকটে ডাকিলেন। সকল সময়ে, সকল যুদ্ধেই, তিনি জয় লাভ করিলে পর বৃথা প্রাণনাশ

দেখিলে বিরক্ত হইতেন, এবং শত্রুরও সেরূপ প্রাণনাশ যাহাতে না হয়, সে জন্য যথেষ্ট যত্ন করিতেন। শিবজী আদেশ করিলেন,—আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, ভীরু সায়েস্তা খাঁ আর আমাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না, এক্ষণে দ্রুতবেগে সিংহগড়াভিমুখে চল।

অন্ধকার রজনীতে শিবজী অনায়াসে পুনা হইতে বহির্গত হইয়া সিংহগড়ের দিকে ধাবমান হইলেন। প্রায় দুই ক্রোশ আসিয়া মশাল জ্বালিবার আদেশ দিলেন। বহুসংখ্যক মশাল জ্বলিল। পুনা হইতে সায়েস্তা খাঁ দেখিতে পাইলেন, মহারাষ্ট্র সেনা নিরাপদে সিংহগড়ে উঠিল।

পরদিন প্রাতে ক্রুদ্ধ মোগলগণ সিংহগড় আক্রমণ করিতে আসিল, কিন্তু গড়ের কামানের গোলায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল। কর্ত্তাজী গুজর ও তাঁহার অধীনস্থ মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহিগণ বহুদূর পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করিয়া গেল।

অল্প বিপদে সাহসী যোদ্ধার আরও যুদ্ধপিপাসা বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সায়েস্তা খাঁ সেরূপ যোদ্ধা ছিলেন না। তিনি আরংজীবকে একখানি পত্র লিখিলেন, তাহাতে নিজ সৈন্যের যথেষ্ট নিন্দা করিলেন ও যশোবন্ত অর্থে বশীভূত হইয়া শিবজীর পক্ষাচরণ করিতেছে, এইরূপ জানাইলেন। আরংজীব দুই জনকেই অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া ডাকাইয়া পাঠাইলেন, এবং নিজ পুত্র সুলতান মোয়াজীমকে দক্ষিণে পাঠাইলেন, পরে তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য যশোবন্তকে পুনর্ব্বার পাঠাইলেন।

ইহার পর এক বৎসরের মধ্যে বিশেষ কোন যুদ্ধকার্য্য হইল না। ১৬৬৪ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভেই শিবজীর পিতা শাহজীর কাল হওয়ায় শিবজী সিংহগড়েই শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া পরে রায়গড়ে যাইয়া রাজা

উপাধি গ্রহণ করিলেন, ও নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। আমরা এখন এই নব ভূপতির নিকট বিদায় লইব।

পাঠক! বহুদিবস হইল, তোরণ-দুর্গ হইতে আসিয়াছি ; চল এই অবসরে একবার সেই দুর্গে যাইয়া কি হইতেছে দেখি।

দশম পরিচ্ছেদ

আশা !

মুদি পোড়া আঁখি বসি রসালের তলে,
ভ্রান্তিমদে মাতি ভাবি পাইব সত্বরে
পাদপদ্ম ! কাঁপে হিয়া দুরু দুরু করি
শুনি যদি পদশব্দ !

মধুসূদন দত্ত।

যে দিন রঘুনাথ তোরণদুর্গে আসিয়াছিলেন, যে দিন তাঁহার হৃদয় উৎক্ষিপ্ত হয়, সেই দিন প্রথম প্রেমের আনন্দময়ী লহরীতে একটি বালিকা-হৃদয় ভাসিয়া গিয়াছিল। উদ্যানে সন্ধ্যার সময় যখন সরযূর দৃষ্টি সহসা সেই তরুণ স্বদেশীয় যোদ্ধার উপর পতিত হইল, বালিকা সহসা চমকিত হইলেন। আবার চাহিলেন, আবার সেই উদার বদনমণ্ডল সেই উন্নত তরুণ যুদ্ধবেশধারী অবয়ব দেখিলেন, পরে ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর যাইলেন।

রজনীতে সরযূ সেই স্বদেশীয় তরুণ যোদ্ধাকে ভোজন করাইতে যাইলেন। পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া দেব-বিনিন্দিত অবয়বের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যখন চারি চক্ষুর মিলন হইল, তখন লজ্জাবৃতবদনা ধীরে ধীরে সরিয়া আসিলেন।

সরিয়া আসিলেন, কিন্তু হৃদয়ে একটি নূতন ভাব উদয় হইল। রঘুনাথ তাঁহার দিকে সোদ্বেগ দৃষ্টি করিলেন কেন ? রঘুনাথ কি স্বদেশীয়

বালিকার প্রতি একটু স্নেহের সহিত নয়নক্ষেপ করিয়াছেন? তরুণ যোদ্ধার কি সরযূর প্রতি একটু মমতা জন্মিয়াছে?

পরদিন আবার সেই তরুণ যোদ্ধাকে দেখিলেন, আবার হৃদয় একটু উদ্বিগ্ন হইল। পরে যখন রঘুনাথের অনিন্দনীয় বাক্যগুলি শুনিলেন, রঘুনাথ যখন সরযূর গলায় কণ্ঠমালা পরাইয়া দিলেন, বালিকার শরীর শিহরিয়া উঠিল, হৃদয় আনন্দ ও উদ্বেগে প্লাবিত হইল। যখন বিদায় লইয়া যোদ্ধা অশ্বারূঢ় হইয়া চলিয়া গেলেন, সরযূ গবাক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বালিকা গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। অশ্ব ও অশ্বারোহী অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বালিকা নিস্পন্দে সেই দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। দিবালোকে পর্ব্বতমালা অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে, তাহার উপর যত দূর দেখা যায়, পর্ব্বতবৃক্ষ সমুদ্রের লহরীর মত বায়ুতে দুলিতেছে। উপরে পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে স্থানে স্থানে জলপ্রপাত পতিত হইতেছে, সেই স্বচ্ছ জল একটি নদীরূপে বহিয়া যাইতেছে। নীচে সুন্দর উপত্যকায় গ্রামের কুটীর দেখা যাইতেছে, সুন্দর হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র সমস্ত দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্য দিয়া পর্ব্বতকন্যা তরঙ্গিণী ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, ও মেঘবিবর্জ্জিত সূর্য্য এই সুন্দর দৃশ্যের উপর দিয়া আপন আলোক-হিল্লোল আনন্দে গড়াইয়া দিতেছে। কিন্তু সরযূ এ সমস্ত দেখিতেছিলেন না, তাঁহার মন এ সমস্ত দৃশ্যে ন্যস্ত ছিল না।

সরযূ অদ্য সমস্ত দিন একটু অন্যমনস্কা রহিলেন। সায়ংকালে পিতার ভোজনের সময় নিকটে বসিলেন, স্বহস্তে পিতার শয্যা রচনা করিয়া দিলেন, পরে ধীরে ধীরে আপন শয়নাগারে যাইলেন, নিস্তব্ধ রজনীতে সরযূ উঠিয়া ধীরে ধীরে সেই গবাক্ষপার্শ্বে যাইয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিয়া চন্দ্রালোক দেখিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

চিন্তা

এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি,
ফেলি দূরে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, তূণ, ধনুঃ,
ত্যজি রথ পদব্রজে এস মোর পাশে।

মধুসূদন দত্ত।

জনার্দ্দন স্বভাবতঃই সরলস্বভাব লোক ছিলেন, সমস্ত দিন শাস্ত্রানুশীলন বা দেবপূজায় রত থাকিতেন, প্রভাতে সায়ংকালে কিল্লাদারের নিকট সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, কদাচ বাটীতে থাকিতেন। পালিতা কন্যাকে অতিশয় ভালবাসিতেন, ভোজনের সময় কন্যাকে নিকটে না দেখিলে তাঁহার আহার হইত না, রজনীতে কখন কখন শাস্ত্রের গল্প বলিতেন, সরযূ বসিয়া শুনিতেন। এতদ্ভিন্ন প্রায়ই আপন কার্য্যে রত থাকিতেন। বালিকার মনে এক দিন একটি নূতন ভাব উদয় হইল, বৃদ্ধ জনার্দ্দন কেমন করিয়া জানিবেন?

বালিকার হৃদয়ে এক দিন সহসা যে ভাব উদয় হয়, তাহা অনেক দিন স্থায়ী হয় না। এক দিন সন্ধ্যাকালে সরযূর হৃদয়ে সহসা যে ভাবের উদ্রেক হইল, তাহা দুই চারি দিবসের মধ্যে অনেকটা হ্রাস প্রাপ্ত হইল। তথাপি নারীর হৃদয়ে এরূপ ভাব একেবারে লীন হয় না, মধ্যে মধ্যে সেই তরুণ যোদ্ধার কথা সরযূর হৃদয়ে জাগরিত হইত। বিশেষ সরযূ

জন্মাবধি একাকিনী, জনার্দ্দন ভিন্ন তিনি ভালবাসিবার লোক কাহাকেও কখন দেখেন নাই, কাহাকেও জানিতেন না, সুতরাং বাল্যকাল অবধিই ধীর, শান্ত, চিন্তাশীল। প্রথম যৌবনে যে রূপ দেখিয়া এক দিন সরযূর হৃদয় আলোড়িত হইল, সায়ংকালে, প্রভাতে ও গভীর রজনীতে সেই রূপটি সময়ে সময়ে সরযূর হৃদয়ে জাগরিত হইত।

কল্পনা মায়াবিনী! সরযূ যখন দিনান্তে একাকিনী গবাক্ষ-পার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন, অথবা নিশীথে চন্দ্রালোকে সেই পুষ্পোদ্যানে বিচরণ করিতেন, তখন কতরূপ কল্পনা তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত হইত। সেই তরুণ যোদ্ধা এত দিনে যুদ্ধের উল্লাসে মগ্ন হইয়াছেন, দুর্গ হস্তগত করিতেছেন, শত্রু ধ্বংস করিতেছেন, বিক্রম ও বাহুবলে বীর নাম ক্রয় করিতেছেন, সরযূর কথা কি একবার তাঁহার মনে জাগরিত হয়? পুরুষের মন! নানা কার্য্য, নানা চিন্তা, নানা শোক, নানা উল্লাসে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকে। জীবন আশাপূর্ণ, নানা আশায় অতিবাহিত হয়, আশা ফলবতী হউক আর নাই হউক, জীবন সর্ব্বদা উল্লাসপূর্ণ থাকে। রাজদ্বারে, যুদ্ধক্ষেত্রে, শোকগৃহে বা নাট্যশালায়, নানা কার্য্যে নানা চিন্তায় পূর্ণ থাকে, তাহারা কি এক চিন্তা চিরকাল হৃদয়ে ধারণ করে? তথাপি মায়াবিনী আশা সরযূকে কাণে কাণে বলিয়া দিত,—বোধ হয়, কখন কখন সরযূর কথা তরুণ যোদ্ধার হৃদয়ে জাগরিত হয়।

আবার চিন্তা আসিত;—তরুণ যোদ্ধা কি এখনও এ তোরণ-দুর্গের কথা ভাবেন? এ কালে, এ বয়সে কি তাঁহার মন স্থির আছে? হায়! নদীর ঊর্ম্মি পার্শ্বস্থ পুষ্পটিকে লইয়া ক্ষণকাল খেলা করে, পুষ্প আনন্দে নাচিয়া উঠে, তাহার পর ঊর্ম্মি কোথায় চলিয়া যায়, পুষ্পটি শুকাইয়া যায়; কিন্তু জল আর ফেরে না! তথাপি মায়াবিনী আশা সরযূর

কাণে কাণে বলিয়া দিত—বোধ হয়, একদিন সেই তরুণ যোদ্ধা তোরণ-দুর্গে ফিরিয়া আসিবেন।

নিশীথে যখন সেই উন্নত দুর্গ ও চারিদিকে পর্ব্বতমালা চন্দ্রের সুধা-কিরণে নিস্তব্ধে সুপ্ত হইত, তখন নীল আকাশও শুভ্র চন্দ্রের দিকে চাহিতে চাহিতে বালিকার হৃদয়ে কত কল্পনা উদয় হইত, কে বলিবে? বোধ হইত যেন, সেই পর্ব্বত-পথ দিয়া একজন নবীন অশ্বারোহী আসিতেছেন। অশ্ব শ্বেতবর্ণ, আরোহীর গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ, ললাট ও নয়ন ঈষৎ আবৃত করিয়াছে। যেন দুর্গে আসিয়া অশ্বারোহী অবতরণ করিলেন, যেন তাঁহার মস্তকে সুবর্ণখচিত শিরস্ত্রাণ, বলিষ্ঠ সুগোল বাহুতে স্বর্ণের বাজু, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ বর্শা। যেন যোদ্ধা আবার আহার করিতে বসিলেন, সরযূ তাঁহাকে ভোজন করাইতেছেন। অথবা রজনীতে সেই ছাদে সরযূ সেই যোদ্ধার নিকট সলজ্জ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, যোদ্ধাও যেন আনন্দের সহিত সরযূর নিকট যুদ্ধকথা বর্ণনা করিতেছেন।

কল্পনার শেষ নাই, অগাধ সমুদ্রহিল্লোলের ন্যায় একটির পর আর একটি আইসে, তাহার পর আর একটি। সরযূ আবার ভাবিলেন, যেন যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তরুণ সেনাপতি বহু খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, বড় উপাধি পাইয়াছেন, কিন্তু সরযূকে ভুলেন নাই। যেন পিতা তাঁহার সহিত সরযূর বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন, যেন ঘর লোকে পরিপূর্ণ, চারিদিকে দীপ জ্বলিতেছে, বাদ্য বাজিতেছে, গীত হইতেছে, আর কত কি হইতেছে সরযূ জানেন না, ভাল দেখিতে পাইতেছেন না। যেন সরযূ অবগুণ্ঠনবতী হইয়া সেই দেব-প্রতিমূর্ত্তির নিকট বসিলেন, যেন যুবকের হস্তে আপন স্বেদাক্ত কম্পিত হস্তটি রাখিলেন, যেন রজনীতে সেই জীবিতেশ্বরকে পাইলেন। আনন্দে বালিকাহৃদয় স্ফীত হইল। সরযূ! সরযূ! পাগলিনী হইও না!

আবার কল্পনা আসিল। রঘুনাথ খ্যাত্যাপন্ন হয়েন নাই, রঘুনাথ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই, রঘুনাথ দরিদ্র, কিন্তু সরযূকে বিবাহ করিয়াছেন। পর্ব্বতের নীচে ঐ যে সুন্দর উপত্যকা দেখা যাইতেছে, যেখানে শান্তিবাহিনী নদী চন্দ্রালোকে ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, সেখানে হরিদ্বর্ণ সুন্দর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র চন্দ্রালোকে সুপ্ত রহিয়াছে, ঐ রমণীয় স্থানে অনেকগুলি কুটীরের মধ্যে যেন একটি ক্ষুদ্র কুটীর সরযূর! যেন দিবাবসানে সরযূ স্বহস্তে রন্ধনকার্য্য সমাপন করিয়াছেন, যেন যত্নপূর্ব্বক জীবননাথের জন্য অন্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, কুটীর-সম্মুখে সুন্দর দূর্ব্বার উপর বসিয়া রহিয়াছেন। যেন সরল দূরক্ষেত্রের দিকে চাহিয়াছেন, যেন সেই দিক্ হইতেই সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর একজন দীর্ঘকায় পুরুষ কুটীরাভিমুখে আসিতেছেন। সরযূর হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, যেন সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ আসিয়া সরযূকে একটি নূতন কণ্ঠমালা পরাইয়া দিলেন। পুলকে বালিকার হৃদয় আবার স্ফীত হইল, সরযূ! সরযূ! পাগলিনী হইও না।

এইরূপে এক মাস, দুই মাস, তিন মাস অতীত হইল, বৎসর অতিবাহিত হইল, কিন্তু সরযূর কল্পনালহরী শেষ হইল না। যে স্বদেশীয় তরুণ যোদ্ধাকে সরযূ এই বিদেশে একদিন সযত্নে খাওয়াইয়াছিলেন, তাঁহার কমনীয় মুখখানি কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে সময়ে সময়ে বালিকার মনে জাগরিত হইত। যে দীর্ঘকায় পুরষ সযত্নে সরযূবালার গলায় প্রিয় কণ্ঠহার পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার আনন্দনীয় রূপ ও দেবতুল্য আকৃতি কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদাই সরযূর হৃদয়ে উদিত হইত! কল্পনা কি মায়াবিনী?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পুনর্ম্মিলন

——চেতন পাইয়া
মিলি যবে আঁখি, দেখি তোমায় সম্মুখে!
মধুসূদন দত্ত।

কল্পনা মায়াবিনী নহে, সরযূবালার চিন্তা মিথ্যাবাদিনী নহে, বালিকার আশা বিশ্বাসঘাতিনী নহে।

একদিন সন্ধ্যার সময় সরযূ পুনরায় সেই পুষ্পোদ্যানে পুষ্প তুলিতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে কি মনে করিয়া হৃদয়ের সেই কণ্ঠহারের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন! সরযূর রূপ পূর্ব্ববৎ স্নিগ্ধ ও আনন্দময়ী, সরযূর মুখমণ্ডল পূর্ব্ববৎ কমনীয় ও শান্ত। তথাপি এক বৎসরে সে রূপের কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, নব আশা ও নব উল্লাসে সে মুখমণ্ডল অধিকতর কমনীয় কান্তি ধারণ করিয়াছে! নূতন জ্যোতিতে সে চক্ষুর্দ্বয় আলোকিত হইয়াছে,নূতন উদ্বেগ ও নূতন লাবণ্যে সে শরীর টলমল করিতেছে, সরযূর হৃদয়, মন, দেহ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সরযূ বালিকা নহেন, প্রথম যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। রূপবতী, চিন্তাবতী, যৌবনসম্পন্না সরযূবালা পুষ্প তুলিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে সেই কণ্ঠমালার দিকে দেখিয়া কি চিন্তা করিতেছেন, এরূপ সময়ে দ্বারদেশে একজন তরুণ রাজপুত যোদ্ধা অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন! পুষ্প তুলিতে তুলিতে রাজপুতকুমারী

সেই দিকে চাহিলেন,—সহসা শিহরিয়া উঠিলেন,—সে দিক্ হইতে আর নয়ন ফিরাইতে পারিলেন না।

রাজপুত যোদ্ধা সেই পুষ্পোদ্যানে সেই রাজপুতবালাকে পুনরায় দেখিতে পাইলেন। একদিন নিশীথে যাঁহার রূপ দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন, এক দিন প্রভাতে যাঁহার পবিত্র কণ্ঠে প্রিয় কণ্ঠমালা পরাইয়া দিয়াছিলেন, যুদ্ধে ও সঙ্কটে, শিবিরে ও সৈন্যমধ্যে যাঁহার চিন্তা মধ্যে মধ্যে যোদ্ধার হৃদয়ে জাগরিত হইয়াছে, নিশীথে স্বপ্নযোগে যাঁহার কমনীয় লজ্জারঞ্জিত মুখখানি সর্ব্বদাই যোদ্ধার সম্মুখে উদয় হইয়াছে, অদ্য বহু দিন পর সেই আনন্দনীয় রূপলাবণ্য, সেই লজ্জারঞ্জিত মুখখানি দেখিয়া রঘুনাথ ক্ষণেক বাক্যশূন্য ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন।

চন্দ্র! রঘুনাথ ও সরযূর উপর সুধাবর্ষণ কর, তুমি নিশীথে জাগরণ করিয়া সকল দেখিতে পাও, কিন্তু জগতে এরূপ দৃশ্য আর দেখ নাই। তরুণ বয়সে যখন মন প্রথম প্রণয়োল্লাসে উৎক্ষিপ্ত হয়, যখন নবজাত চন্দ্রকরের ন্যায় নবজাত প্রণয়ের আনন্দহিল্লোল মানস-জগতে গড়াইতে থাকে, যখন যৌবনের প্রথম প্রণয়ে সমস্ত জগৎ সিক্ত করে, আকাশ ও মেদিনী প্লাবিত করে, তখনই যেন এ জগতে ইন্দ্রপুরী অবতীর্ণ হয়! ক্ষণেক পর সরযূবালা অবনতমুখী হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, ও পিতাকে এই রঘুনাথজীর আগমনের সংবাদ দিলেন। জনার্দ্দন দেবও বহু সম্মান সহকারে শিবজীর দূতকে আহ্বান করিলেন।

সন্ধ্যার সময় রঘুনাথ পুরোহিতের সম্মুখে উপবেশন করিয়া সমস্ত সমাচার জ্ঞাত করাইলেন। সায়েস্তা খাঁ পরাস্ত হইয়া দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, শিবজী রাজগড়ে যাইয়া রাজ-উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, দেশশাসনের সুন্দর বন্দোবস্ত করিতেছেন। কিন্তু দিল্লীর সম্রাট্ শিবজীকে জয় করিবার জন্য অম্বরাধিপতি মহাপরাক্রান্ত রাজা জয়সিংহকে প্রেরণ

করিতেছেন, তাহা শুনিয়া মহারাষ্ট্ররাজ চিন্তিত হইয়াছেন। মহারাষ্ট্ররাজ সম্ভবতঃ রাজা জয়সিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবেন, এবং সেই কার্য্য সম্পাদনার্থ অম্বরদেশীয় শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত জনার্দ্দন দেবকে স্মরণ করিয়াছেন। রাজার আজ্ঞায় রঘুনাথ পুরোহিতকে লইতে আসিয়াছেন, শিবিকাদি প্রস্তুত আছে। যদি পুরোহিত মহাশয়ের সুবিধা হয়, দুই চারি দিনের মধ্যেই রাজগড় গমন করিলে ভাল হয়, রাজা এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন।

ঘরের এক পার্শ্বে সরযূবালা আহারের আয়োজন করিতেছিলেন, পাঠককে বলা বাহুল্য যে, এ কথাগুলি সমস্ত সরযূর কানে উঠিল। পিতা রাজধানীতে যাইবেন? রাজাদেশে এই তরুণ যোদ্ধা আমাদিগকে লইতে আসিয়াছেন?—সরযূর হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, হস্ত হইতে জলের পাত্র পড়িয়া গেল, লজ্জাবনতমুখী পুলকিতগাত্রী সরযূবালা ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

তখন রঘুনাথ অনেকক্ষণ ধরিয়া ধীরে ধীরে জনার্দ্দন দেবের সহিত কি কথা কহিতে লাগিলেন। আপনার দেশের কথা কহিলেন, জাতিকুলের পরিচয় দিলেন, পিতামাতার পরিচয় দিলেন, জনার্দ্দনকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। জনার্দ্দনও রঘুনাথের উন্নত কুলের পরিচয় পাইয়া এবং যুবকের বীর্য্য, সৌন্দর্য্য, গুণ ও বিনয় আলোচনা করিয়া তুষ্ট হইলেন, এবং রঘুনাথকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন। রঘুনাথের আহারের সময় হইয়াছে, সরযূ সমস্ত প্রস্তুত করিয়াছেন। বৃদ্ধ জনার্দ্দন গাত্রোত্থান করিয়া হৃষ্টচিত্তে রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—বৎস রঘুনাথ, এখন আহার করিতে বইস। আজ তোমার পরিচয় পাইয়া বড় তুষ্ট হইলাম, তোমার বংশ আমার অপরিচিত নহে, তোমার গুণও বংশোচিত। আর সরযূকে আমি কন্যা বলিয়া গ্রহণ

করিয়াছি, তোমাকেও আজি পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলাম। আর যদি ভগবান্ করেন, এই যুদ্ধ শেষে তোমার ন্যায় উপযুক্ত পাত্রে সরযূকে সমর্পণ করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া এই মানবলীলা সম্বরণ করিব। জগদীশ্বর তোমাকে ও মা সরযূকে সুখে রাখুন।

এই কথা শুনিয়া রঘুনাথের চক্ষুতে জল আসিল, ধীরে ধীরে পুরোহিতের চরণতলে প্রণত হইয়া কহিলেন,—পিতা, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এ দরিদ্র সৈনিক আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে। রঘুনাথ দরিদ্র হাবিলদার মাত্র, এক্ষণে তাহার নাম নাই, অর্থ নাই, পদ নাই। কিন্তু জগদীশ্বর সহায় হউন, পিতা, আশীর্ব্বাদ করুন, রঘুনাথ এ অমূল্য রত্নলাভ করিতে যত্নবান্ হইবে।

এ আনন্দময়ী কথা সরযূবালার কাণে পৌঁছিল, বায়ুতাড়িত পত্রের ন্যায় তাঁহার দেহলতা কম্পিত হইতেছিল।

সে দিন রঘুনাথ কিছুই আহার করিতে পারিলেন না, আরক্তমুখী সরযূও ভাল করিয়া আহার করাইতে পারিলেন না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রাজগড় যাত্রা

দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগি হে দুজনে।

মধুসূদন দত্ত।

যাত্রার আয়োজন করিতে পাঁচ সাত দিন বিলম্ব হইল। রঘুনাথ পুরোহিতের আলয়েই অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় সরযূকে উদ্যানে ফুল তুলিতে দেখিতেন, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে সরযূর প্রিয় হস্ত হইতে আহার গ্রহণ করিতেন। এ পাঁচ সাত দিনের মধ্যে রঘুনাথ সাহস করিয়া সরযূর সহিত কথা কহিতে পারিলেন না। সরযূকে দেখিলেই রঘুনাথের হৃদয় সজোরে আঘাত করিত, কুমারীও অবগুণ্ঠন টানিয়া সরিয়া যাইতেন।

তোরণ-দুর্গ হইতে রাজগড় যাত্রাকালে সরযূর শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে একজন অশ্বারোহী চলিত, পর্ব্বত-পথে বা জঙ্গলে, বৃক্ষশূন্য ময়দানে বা নদীতীরে, সে অশ্বারোহী মুহূর্ত্তের জন্যও শিবিকা হইতে দূরে যাইত না। নিশীথে যখন সরযূ সহচরীর সহিত সামান্য কোন মন্দিরে, দোকানে বা ভদ্রগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, রজনীতে সময়ে সময়ে একজন অনিদ্র যোদ্ধা বর্শা হস্তে তথায় পদচালন করিত।

নারীমাত্রেই এ সকল বিষয় বুঝিতে পারে, এ সকল বিষয় দেখিতে পায়। পুরুষের যত্ন, পুরুষের আগ্রহ, পুরুষের হৃদয়ের আবেগ নারীর

চক্ষুতে গোপন থাকে না। সরযূ শিবিকার ভিতর হইতে সেই অবিশ্রান্ত অশ্বারোহীকে দেখিতেন, নিশীথে সেই অনিদ্র যোদ্ধাকে দেখিতেন। সেই দেব-বনিন্দিত আকৃতি দেখিতে দেখিতে সরযূর নয়ন ঝলসিত হইল, সেই দুর্দ্দমনীয় আগ্রহ-চিহ্ন দেখিয়া সরযূর হৃদয় আনন্দ, প্রেম ও উদ্বেগে প্লাবিত হইল।

সন্ধ্যার সময় যখন সরযূ সেই যোদ্ধাকে ভোজন করাইতে আসিতেন, মৌনাবলম্বী যোদ্ধার দর্শনে সরযূ অবনতমুখী হইতেন, ভাল করিয়া আহার করাইতে পারিতেন না। প্রাতঃকালে শিবিকায় আরোহণের সময় যখন সরযূ সেই যোদ্ধাকে অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট দেখিতেন, তাঁহার ম্লান মুখমণ্ডল হইতে সরযূ সহজে নয়ন ফিরাইতে পারিতেন না।

কয়েক দিন এইরূপে ভ্রমণানন্তর সকলে রাজগড়ে উপস্থিত হইলেন। জনার্দ্দন সন্ধ্যার সময় দুর্গের নীচে একটি গ্রামে উপস্থিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়-রাজের নিকট সমাচার পাঠাইলেন, রাজার অনুমতি হইলে পরদিবস দুর্গে প্রবেশ করিবেন।

সেই দিন রজনীতে আহারাদি প্রস্তুত করিতে কিছু বিলম্ব হইল। জনার্দ্দন কিছু জলযোগ করিয়া শয়ন করিতে যাইলেন, রাত্রি এক প্রহরের সময় সরযূবালা রঘুনাথকে ভোজন করাইলেন।

ভোজনান্তে রঘুনাথ অন্যদিনের ন্যায় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন না, ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর যেখানে সরযূ একাকী বসিয়াছিলেন, তথায় ধীরে ধীরে যাইয়া নতশিরে দণ্ডায়মান হইলেন। হৃদয়ের উদ্বেগ দমন করিয়া স্থিরস্বরে কহিলেন,—দেবি, এক্ষণে আমাকে বিদায় দিন।

রঘুনাথের উচ্চারিত এই কথাগুলি যেন তৃষিতের পক্ষে বারিধারার

ন্যায় সরযূর কাণে লাগিল। সরযূর হৃদয় নাচিয়া উঠিল, সরযূ আরক্ত মুখ নত করিয়া ক্ষণেক দণ্ডায়মান হইলেন।

রঘুনাথ পুনরায় বলিলেন,—দেবি, বিদায় দিন, কল্য আপনারা রাজপ্রাসাদে যাইবেন, এ দরিদ্র সৈনিক পুনরায় নিজ কার্য্যে যাইতে বাসনা করে।

এই কথা শুনিয়া সরযূ লজ্জা বিস্মৃত হইলেন, নয়নদ্বয়ের জল মুছিয়া নারীর মমতাপূর্ণ স্বরে বলিলেন,—আপনি আমাদিগের জন্য যে যত্ন করিয়াছেন, পিতার জন্য, আমার জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার জন্য ভগবান্ আপনাকে যুদ্ধে জয়ী করুন, আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করুন। আমরা সে যত্নের কি প্রতিদান করিতে পারি?

রঘুনাথ বিনীত স্বরে উত্তর দিলেন, রাজাদেশে আপনাদিগকে রাজগড়ে নিরাপদে আনিতে পারিয়াছি, এটি আমার পরম ভাগ্য, ইহাতে আমার কিছু গুণ নাই। তথাপি দরিদ্র সৈনিকের যত্নে যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে,—তবে,—এ দরিদ্র সৈনিককে বিস্মৃত হইবেন না।

কথাটি সরযূ বুঝিলেন, মুখখানি অবনত করিলেন। রঘুনাথ তখন সাহস পাইয়া, লজ্জা বিস্মরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—এ দরিদ্র সৈনিক যদি উচ্চ আশা করিয়া থাকে, আপনি অপরাধ লইবেন না। আপনার পিতা প্রসন্ন চক্ষুতে আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন, ভরসা করি, আপনিও আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইবেন না। যদি ভগবান্ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, যদি জীবনের চেষ্টা ও আশা ফলবতী হয়, তবে একদিন মনের কথা বলিব, সে পর্য্যন্ত এ দরিদ্র সৈন্যকে এক একবার স্মরণপথে স্থান দিবেন।

বিনীত ভাবে বিদায় লইয়া রঘুনাথ চলিয়া গেলেন। সরযু এক-দণ্ডকাল সেই পথ চাহিয়া রহিলেন, মনে মনে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন; দ্বিপ্রহর রজনীর সময় একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন,—সৈনিকশ্রেষ্ঠ! তুমি চিরকাল এ দাসীর স্মরণপথে জাগরিত থাকিবে, ভগবান্ সাক্ষী থাকিবেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রাজা জয়সিংহ

নরকুলোত্তম তুমি—
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে।

মধুসূদন দত্ত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আরংজীব, সায়েস্তা খাঁ ও যশোবন্তসিংহ উভয়কেই অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, ও নিজ পুত্র সুলতান মোয়াজীমকে দক্ষিণে প্রেরণ করেন, এবং তাঁহার সহায়তার জন্য যশোবন্তকে পুনরায় প্রেরণ করেন। তাঁহারাও বিশেষ ফললাভ করিতে না পারায় সম্রাট্ অবশেষে তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া অম্বরাধিপতি প্রসিদ্ধনামা রাজা জয়সিংহ ও তাঁহার সহিত দিলওয়ার খাঁ নামক একজন বিক্রমশালী আফগান সেনাপতিকে দক্ষিণে প্রেরণ করিলেন। ১৬৬৫ খৃঃ অব্দের চৈত্রমাসের শেষযোগে জয়সিংহ পুনরায় উপস্থিত হইলেন। সায়েস্তা খাঁর ন্যায় নিরুৎসাহ হইয়া বসিয়া না থাকিয়া তিনি দিলওয়ার খাঁকে পুরন্দর দুর্গ আমক্রণ করিতে আদেশ করিলেন, এবং স্বয়ং সিংহগড় বেষ্টন করিয়া রাজগড় পর্য্যন্ত সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন।

শিবজী হিন্দু সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ, বিশেষ জয়সিংহের নাম, সৈন্যসংখ্যা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ তাঁহার নিকট

অবিদিত ছিল না। সেরূপ পরাক্রান্ত সেনাপতি বোধ হয় সম্রাট্ আরংজীবের আর কেহই ছিল না। তাৎকালিক ফরাসী ভ্রমণকারী বের্ণীয়ে লিখিয়া গিয়াছেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষে জয়সিংহের ন্যায় বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান্, দূরদর্শী লোক আর একজনও ছিলেন না। শিবজী প্রথম হইতেই ভগ্নোদ্যম হইলেন, ও বার বার জয়সিংহের নিকট সন্ধিপ্রস্তাব পাঠাইতে লাগিলেন, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি জয়সিংহ প্রথমে এ সমস্ত প্রস্তাব বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে শিবজীর বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্ত ন্যায়শাস্ত্রী দূতবেশে জয়সিংহের নিকট আসিলেন, ও রাজাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইলেন যে, শিবজী রাজা জয়সিংহের সহিত চতুরতা করিতেছেন না। তিনিও ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রোচিত সম্মান তিনি জানেন। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের এই সত্যবাক্য রাজা জয়সিংহ বিশ্বাস করিলেন, তখন ব্রাহ্মণের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন,—দ্বিজবর! আপনার বাক্যে আমি আশ্বস্ত হইলাম। রাজা শিবজীকে জানাইবেন যে, দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহার বিদ্রোহাচরণ মার্জ্জনা করিবেন, পরন্তু তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন, সেজন্য আমি বাক্যদান করিতেছি। আপনার প্রভুকে বলিবেন, আমি রাজপুত, রাজপুতের বাক্য অন্যথা হয় না।

ইহার কয়েক দিন পর বর্ষাকালে রাজা জয়সিংহ আপন শিবিরে সভার মধ্যে বসিয়া রহিয়াছেন,—একজন প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল,—মহারাজের জয় হউক! রাজা শিবজী স্বয়ং বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন।

সভাসদ্ সকলে বিস্মিত হইলেন, রাজা জয়সিংহ স্বয়ং শিবজীকে আহ্বান করিতে শিবিরের বাহিরে যাইলেন। বহু সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে আহ্বান ও আলিঙ্গন করিয়া শিবিরাভ্যন্তরে আনিলেন ও রাজগদিতে আপনার দক্ষিণদিকে বসাইলেন।

শিবজীও এইরূপ সমাদর পাইয়া যথেষ্ট সম্মানিত হইলেন। রাজা জয়সিংহ ক্ষণেক মিষ্টালাপ করিয়া অবশেষে বলিলেন,—রাজন্! আপনি আমার শিবিরে আসিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন, এই শিবির আপন গৃহের ন্যায় বিবেচনা করিবেন;

শিবজী। রাজন্! এ দাস কবে আপনার আজ্ঞাপালনে বিমুখ? রঘুনাথপন্ত দ্বারা আপনি দাসকে আসিতে আদেশ করিয়াছিলেন, দাস উপস্থিত হইয়াছে। আপনার মহৎ আচরণে আমিই সম্মানিত হইয়াছি।

জয়সিংহ। হাঁ, রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রীকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ আছে। রাজন্! আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা করিব, দিল্লীশ্বর আপনার বিদ্রোহাচরণ মার্জ্জনা করিবেন, আপনাকে রক্ষা করিবেন, আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন। এ বিষয়ে আমি বাক্যদান করিয়াছি, রাজপুতের কথা অন্যথা হয় না।

এইরূপে ক্ষণেক কথোপকথনের পর সভা ভঙ্গ হইল, শিবিরে শিবজী ও জয়সিংহ ভিন্ন আর কেহই রহিল না। তখন শিবজী কপট আনন্দ-চিহ্ন ত্যাগ করিলেন, হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতে লাগি-লেন, জয়সিংহ দেখিলেন, তাঁহার চক্ষে জল।

জয়সিংহ। রাজন্! আপনি যদি আত্মসমর্পণ করিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকেন, সে খেদ নিষ্প্রয়োজন। আপনি বিশ্বাস করিয়া আমার নিকটে আসিয়াছেন, রাজপুত বিশ্বস্তের উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। অদ্যই রজ-নীতে আমার অশ্বশালা হইতে অশ্ব বাছিয়া লউন, পুনরায় প্রস্থান করুন। আপনি নিরাপদে আসিয়াছেন, নিরাপদে যাইবেন, আমার আদেশে কোন রাজপুত আপনার উপর হস্তক্ষেপ করিবে না। পরে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি ভাল, না পারি, ক্ষতি নাই, কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কদাচ বিস্মৃত হইব না।

শিবজী। মহারাজ! ভবাদৃশ লোকের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তাহাতে খেদ নাই। বাল্যকাল অবধি যে হিন্দুধর্ম্মের জন্য, যে হিন্দুগৌরবের জন্য চেষ্টা করিয়াছি, সে মহৎ উদ্যম, সে উন্নত উদ্দেশ্য আজি শেষ হইল, সেই চিন্তায় হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। কিন্তু সে বিষয়েও মন স্থির করিয়াই আপনার শিবিরে আসিয়াছিলাম, সেজন্যও এখন খেদ করিতেছি না।

জয়সিংহ। তবে কি জন্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন?

শিবজী। বাল্যকাল হইতে আপনাদের গৌরবগীত গাহিতে ভালবাসিতাম, অদ্য দেখিলাম, সে গীত মিথ্যা নহে, জগতে যদি মাহাত্ম্য, সত্য, ধর্ম্ম থাকে, তবে রাজপুতশরীরে আছে। এ রাজপুত কি যবনের অধীনতা স্বীকার করিবেন? মহারাজা জয়সিংহ কি যবন আরংজীবের সেনাপতি?

জয়সিংহ। ক্ষত্রিয়রাজ! সেটি প্রকৃত দুঃখের কারণ। কিন্তু রাজপুতেরা সহজে অধীনতা স্বীকার করে নাই, যত দিন সাধ্য, দিল্লীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, বিধির নির্ব্বন্ধে পরাধীন হইয়াছে। মেওয়ারের বীরপ্রবর প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপ অসাধ্য সাধনেরও যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্ততিও দিল্লীর করপ্রদ, এ সমস্ত বোধ হয় মহাশয় অবগত আছেন।

শিবজী। আছি, সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাঁহাদের সহিত আপনাদিগের এত দিনের বৈরভাব, তাঁহাদের কার্য্যে আপনি এরূপ যত্নশীল কি জন্য?

জয়সিংহ। যখন দিল্লীশ্বরের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছি, তখন তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির জন্য সত্যদান করিয়াছি। যে বিষয়ে সত্যদান করিয়াছি, তাহা করিব।

শিবজী। সকলের নিকট সকল সময় কি সত্য পালনীয়? যাঁহারা আমাদের দেশের শত্রু, ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারী, তাঁহাদের সহিত সত্য সম্বন্ধ কি?

জয়সিংহ। আপনি ক্ষত্রিয় হইয়া এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজপুতকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? রাজপুতের ইতিহাস পাঠ করুন, তাহারা বহুশত বৎসর মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, কখনও সত্য লঙ্ঘন করে নাই। কখন জয়লাভ করিয়াছে, অনেক সময়ে পরাস্ত হইয়াছে, কিন্তু জয়ে, পরাজয়ে, সম্পদে, বিপদে, সর্ব্বদা সত্য-পালন করিয়াছে। এখন আমাদের সে গৌরবের স্বাধীনতা নাই, কিন্তু সত্যপালনের গৌরব আছে। দেশে, বিদেশে, মিত্রমধ্যে, শত্রুমধ্যে, রাজপুতের নাম গৌরবান্বিত। ক্ষত্রিয়রাজ টোডরমল্ল বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, মানসিংহ কাবুল হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরের বিজয়-পতাকা উড়াইয়াছিলেন, কেহ কখনও ন্যস্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, মুসলমান সম্রাটের নিকট যাহা সত্য করিয়াছিলেন, তাহা পালন করিতে ত্রুটি করেন নাই। মহারাষ্ট্ররাজ! রাজপুতের কথাই সন্ধিপত্র অনেক সন্ধিপত্র লঙ্ঘন হইয়াছে, রাজপুতের কথা লঙ্ঘন হয় নাই।

শিবজী। মহারাজ যশোবন্তসিংহ হিন্দুধর্ম্মের একজন প্রধান প্রহরী, তিনি মুসলমানের জন্য হিন্দুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

জয়সিংহ। যশোবন্ত বীরশ্রেষ্ঠ, যশোবন্ত হিন্দুধর্ম্মের প্রহরী, সন্দেহ নাই। তাঁহার মাড়ওয়ারদেশ মরুভূমিময়, তাঁহার মাড়ওয়ারীসেনা অপেক্ষা কঠোর জাতি ও সাহসী সেনা জগতে নাই। যদি যশোবন্ত সেই মরুভূমিতে বেষ্টিত হইয়া সেই সেনার সাহায্যে হিন্দুস্বাধীনতা রক্ষার যত্ন করিতেন, আমি তাঁহাকে সাধুবাদ করিতাম। যদি জয়ী হইয়া

আরংজীবকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীতে হিন্দুপতাকা উড্ডীন করিতেন, আমি তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া সম্মান করিতাম। অথবা যদি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া স্বদেশ ও স্বধর্ম্মরক্ষার্থে সেই মরুভূমে প্রাণত্যাগ করিতেন, আমি তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতাম। কিন্তু যে দিন তিনি দিল্লীশ্বরের সেনাপতি হইয়াছেন, সেই দিন তিনি মুসলমানের কার্য্যসাধনে ব্রতী হইয়াছেন। ব্রত গ্রহণ করিয়া, তাহা লঙ্ঘন করা ক্ষত্রোচিত কার্য্য হয় নাই, যশোবন্ত কলঙ্কে আপন যশোরাশি ম্লান করিয়াছেন। তিনি সিপ্রানদীতীরে আরংজীবের নিকট পরাস্ত হইয়া অবধি আরংজীবের অতিশয় বিদ্বেষী, নচেৎ তিনি এ গর্হিত কার্য্য করিতেন না।

চতুর শিবজী দেখিলেন, জয়সিংহ যশোবন্তসিংহ নহেন। ক্ষণেক পর আবার বলিলেন,—হিন্দুধর্ম্মের উন্নতিচেষ্টা কি গর্হিত কার্য্য? হিন্দুকে ভ্রাতা মনে করিয়া সহায়তা করা কি গর্হিত কার্য্য?

জয়সিংহ। আমি তাহা বলি নাই। যশোবন্ত কেন আরংজীবের কার্য্য ত্যাগ করিয়া জগতের সাক্ষাতে, ভগবানের সাক্ষাতে আপনার সহিত যোগ দিলেন না? আপনি যেরূপ স্বাধীনতার চেষ্টা করিতেছেন, তিনি সেইরূপ করিলেন না কি জন্য? সম্রাটের কার্য্যে থাকিয়া গোপনে বিরুদ্ধাচরণ করা কপটাচরণ। ক্ষত্রিয়রাজ! কপটাচরণ ক্ষত্রোচিত কার্য্য নহে।

শিবজী। তিনি আমার সহিত প্রকাশ্যে যোগ দিলে দিল্লীশ্বর অন্য সেনাপতি পাঠাইতেন, সম্ভবতঃ আমরা উভয়ে পরাস্ত ও হত হইতাম।

জয়সিংহ। যুদ্ধে মরণ ক্ষত্রিয়ের সৌভাগ্য, কপটাচরণ ক্ষত্রিয়ের অবমাননা।

শিবজীর মুখ আরক্ত হইল, তিনি বলিলেন,—রাজপুত! মহারাষ্ট্রীয়েরাও মৃত্যু-ভয় করে না, যদি এই অকিঞ্চিৎকর জীবন দান করিলে আমার উদ্দেশ্য সাধন হয়, হিন্দুস্বাধীনতা, হিন্দুগৌরব পুনঃস্থাপিত

হয়, তবে ভবানীর সাক্ষাতে এই মুহূর্ত্তে এই বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে পারি। অথবা রাজপুত, আপন অব্যর্থ বর্শা ধারণ করুন, এই হৃদয়ে আঘাত করুন, সহাস্যবদনে প্রাণত্যাগ করি। কিন্তু যে হিন্দুগৌরবের বিষয় বাল্যকালে স্বপ্ন দেখিতাম, যাহার জন্য শত যুদ্ধ যুঝিলাম, শত শত্রুকে পরাস্ত করিলাম, এই বিংশ বৎসর পর্ব্বতে, উপত্যকায়, শিবিরে, শত্রুমধ্যে, দিবসে, সায়ংকালে, গভীর নিশীথে চিন্তা করিয়াছি, সে গৌরব ও স্বাধীনতা আশা ত্যাগ করিতে হৃদয়ে ব্যথা লাগে। যুদ্ধে প্রাণ দিলে কি সে স্বাধীনতা রক্ষা হইবে ?

জয়সিংহ শিবজীর তেজস্বী কথাগুলি শ্রবণ করিলেন, চক্ষুতে জল দেখিলেন, কিন্তু পূর্ব্ববৎ স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, —সত্যপালনে যদি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা না হয়, সত্যলঙ্ঘনে হইবে ? বীরের শোণিতে যদি স্বাধীনতা-বীজ অঙ্কুরিত না হয়, তবে বীরের চাতুরীতে হইবে ?

শিবজী পরাস্ত হইলেন। অনেকক্ষণ পর পুনরায় ধীরে ধীরে বলিলেন,—মহারাজ! আমি আপনাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করি, আপনার ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি যোদ্ধা আমি কখনও দেখি নাই, আমি আপনার পুত্রতুল্য, একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, আপনি পিতৃতুল্য সৎপরামর্শ দিন। আমি বাল্যকালে যখন কঙ্কণপ্রদেশের অসংখ্য পর্ব্বত ও উপত্যকায় ভ্রমণ করিতাম, আমার হৃদয়ে চিন্তা আসিত, স্বপ্ন উদিত হইত। ভাবিতাম যেন সাক্ষাৎ ভবানী আমাকে স্বাধীনতা স্থাপনের জন্য আদেশ করিতেছেন, যেন দেবালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে, ধর্ম্মবিরোধী মুসলমানদিগেকে দূর করিতে দেবী সাক্ষাৎ উত্তেজনা করিতেছেন। আমি বালক ছিলাম, সেই স্বপ্নে ভুলিলাম, সদর্পে খড়্গ গ্রহণ করিলাম, বীরশ্রেষ্ঠদিগকে জড় করিলাম, দুর্গ অধিকার করিতে লাগিলাম! যৌবনেও সেই স্বপ্ন দেখিয়াছি, হিন্দুনামের গৌরব, হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য, হিন্দুস্বাধীনতা সংস্থাপন! সেই স্বপ্নবলে দেশ জয়

করিয়াছি, শত্রু জয় করিয়াছি, রাজ্য বিস্তার করিয়াছি, দেবালয় স্থাপন করিয়াছি! ক্ষত্রিয়রাজ! আমার এ উদ্দেশ্য কি মন্দ? এ স্বপ্ন কি অলীক স্বপ্নমাত্র? আপনি পুত্রকে উপদেশ দিন।

বহুদূরদর্শী ধর্ম্মপরায়ণ রাজা জয়সিংহ ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে গম্ভীরস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—রাজন! আপনার উদ্দেশ্য অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য আমি জানি না, আপনার স্বপ্ন অপেক্ষা প্রকৃত আর কিছুই আমি জানি না। শিবজী! আপনার মহৎ উদ্দেশ্য আমার নিকটে অবিদিত নাই, আমি শত্রুর নিকট, মিত্রের নিকট আপনার উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিয়াছি, পুত্র রামসিংহকে আপনার উদাহরণ দেখাইয়া শিক্ষা দিয়াছি, রাজপুত স্বাধীনতার গৌরব এখনও বিস্মৃত হয় নাই। আর শিবজী! আপনার স্বপ্নও স্বপ্ন নহে, চারিদিকে যত দেখি, মনে মনে চিন্তা করি, বোধ হয় মোগলরাজ্য আর থাকে না। যত্ন, চেষ্টা, সকলই বিফল! মুসলমান-রাজ্য কলঙ্করাশিতে পূর্ণ হইয়াছে, বিলাস-প্রিয়তায় জর্জ্জরিত হইয়াছে, হিন্দুর প্রতি অত্যাচারে শাপগ্রস্ত হইয়াছে, পতনোন্মুখ গৃহের ন্যায় আর দাঁড়াইতে পারে না। শীঘ্র কি বিলম্বে এই প্রাসাদতুল্য মোগলরাজ্য বোধ হয় ধূলিসাৎ হইবে, তাহার পর পুনরায় হিন্দুর প্রাধান্য। মহারাষ্ট্রীয় জীবন অঙ্কুরিত হইতেছে, মহারাষ্ট্রীয় যৌবনতেজে বোধ হয় ভারতবর্ষ প্লাবিত হইবে। শিবজী! আপনার স্বপ্ন স্বপ্ন নহে, ভবানী আপনাকে মিথ্যা উত্তেজনা করেন নাই।

উৎসাহে, আনন্দে শিবজীর শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—তবে ভবাদৃশ মহাত্মা সেই পতনোন্মুখ মোগলপ্রাসাদের একমাত্র স্তম্ভস্বরূপ রহিয়াছেন কি জন্য?

জয়সিংহ। সত্যপালন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, যাহা সত্য করিয়াছি, তাহা

পালন করিব। কিন্তু অসাধ্যসাধন হয় না, পতনোন্মুখ গৃহ পতিত হইবে।

শিবজী। ভাল, সত্যপালন করুন, কপটাচারী আরংজীবের নিকটেও আপনার ধর্ম্মাচরণ দেখিয়া দেবতারাও বিস্মিত হইয়া আপনার সাধুবাদ করিবেন। কিন্তু আমি আরংজীবের নিকট কখনও সত্য করি নাই, আমি যদি বুদ্ধিবলে স্বদেশের উন্নতি-সাধনের প্রয়াস পাই, আরংজীবকে পরাস্ত করিতে পারি, তাহা কি নিন্দনীয়?

জয়সিংহ। ক্ষত্রিয়রাজ! চাতুরী যোদ্ধার পক্ষে সকল সময়ে নিন্দনীয়, বিশেষতঃ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে চাতুরী অধিকতর নিন্দনীয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের গৌরববৃদ্ধি অনিবার্য্য, বোধ হয় তাহাদের বাহুবল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে, বোধ হয় তাহারা ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইবে। কিন্তু শিবজী! অদ্য আপনি যে শিক্ষা দিতেছেন, সে শিক্ষা কদাচ ভুলিবে না। আমার কথায় দোষ গ্রহণ করিবেন না, অদ্য আপনি নগর লুণ্ঠন করিতে শিখাইতেছেন, কল্য তাহারা ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিবে, অদ্য আপনি চতুরতা দ্বারা জয়লাভ করিতে শিখাইতেছেন, পরে তাহারা সম্মুখ যুদ্ধ কখনই শিখিবে না। যে জাতি অচিরে ভারতের অধীশ্বর হইবে, আপনি সেই জাতির বাল্যগুরু, গুরুর ন্যায় ধর্ম্ম শিক্ষা দিন। অদ্য আপনি মন্দ-শিক্ষা দিলে শত বর্ষ পর্য্যন্ত দেশে দেশে সেই শিক্ষার ফল দৃষ্ট হইবে। বৃদ্ধ বহুদর্শী রাজপুতের কথা গ্রহণ করুন, মহারাষ্ট্রীয়-দিগকে সম্মুখরণ শিক্ষা দিন, চতুরতা বিস্মৃত হইতে বলুন। আপনি হিন্দুশ্রেষ্ঠ! আপনার মহৎ উদ্দেশ্যে আমি শতবার ধন্যবাদ করিয়াছি, আপনি এই উন্নত শিক্ষা না দিলে কে দিবে? মহারাষ্ট্রের

শিক্ষাগুরু! সাবধান! আপনার প্রত্যেক কার্য্যের ফল বহুকাল-ব্যাপী, বহুদেশব্যাপী হইবে!

এই মহৎ বাক্য শুনিয়া শিবজী ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, শেষে বলিলেন,—আপনি গুরুর গুরু, আপনার উপদেশগুলি শিরোধার্য্য। কিন্তু অদ্য আমি আরংজীবের অধীনতা স্বীকার করিলাম, শিক্ষা কবে দিব?

জয়সিংহ। জয় পরাজয়ের স্থিরতা নাই। অদ্য আমার জয় হইল, কল্য আপনার জয় হইতে পারে। অদ্য আপনি আরংজীবের অধীন হইলেন, ঘটনাক্রমে কল্য স্বাধীন হইতে পারেন।

শিবজী। জগদীশ্বর তাহাই করুন, কিন্তু আপনি আরংজীবের সেনাপতি থাকিতে আমার স্বাধীন হওয়ার আশা বৃথা। স্বয়ং ভবানী হিন্দু-সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

জয়সিংহ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—শরীর ক্ষণভঙ্গুর, এ বৃদ্ধ শরীর কত দিন থাকিবে? কিন্তু যত দিন থাকিবে সত্যপালনে বিরত হইবে না।

শিবজী। আপনি দীর্ঘজীবী হউন।

জয়সিংহ। শিবজী! এক্ষণে বিদায় দিন। আমি আরংজীবের পিতার নিকট কার্য্য করিয়াছি, এক্ষণে আরংজীবের অধীনে কার্য্য করিতেছি; যত দিন জীবিত থাকিব, দিল্লীর এ বৃদ্ধ সেনা বিদ্রোহাচরণ করিবে না। কিন্তু ক্ষত্রিয়প্রবর! নিশ্চিন্ত থাকুন, মহারাষ্ট্রের গৌরব ও হিন্দুর প্রাধান্য অনিবার্য্য! বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য করুন, মোগল-রাজ্য আর থাকে না, হিন্দু-তেজ আর নিবারিত হয় না। অচিরে দেশে দেশে হিন্দুর গৌরবনাম, আপনার গৌরবনাম প্রতিধ্বনিত হইবে।

শিবজী অশ্রুপূর্ণলোচনে জয়সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—

ধর্ম্মাত্মন্! আপনার মুখে পুষ্পচন্দন পড়ুক, আপনার কথাই যেন সার্থক হয়! আপনার সহিত যুদ্ধ করিব না, আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি, কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে পুনরায় স্বাধীন হইতে পারি, তবে ক্ষত্রিয়প্রবর! আর একদিন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব, আর একদিন পিতার চরণোপান্তে বসিয়া উপদেশ গ্রহণ করিব।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দুর্গবিজয়

চৌদিকে এবে সমরতরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ নির্ঘোষে।

মধুসূদন দত্ত।

শীঘ্রই সন্ধিস্থাপন হইল। শিবজী মোগলদিগের নিকট হইতে যে যে দুর্গ জয় করিয়াছিলেন, তাহা ফিরাইয়া দিলেন, বিলুপ্ত আহম্মদনগর রাজ্যের মধ্যে যে দ্বাত্রিংশৎ দুর্গ অধিকার বা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও বিংশটি ফিরাইয়া দিলেন, অবশিষ্ট দ্বাদশটিমাত্র আরংজীবের অধীনে জায়গীরস্বরূপ রাখিলেন। যে প্রদেশ তিনি সম্রাট্‌কে দিলেন, তাহার বিনিময়ে বিজয়পুর রাজ্যের অধীনস্থ কতক প্রদেশ সম্রাট্ শিবজীকে দান করিলেন, ও শিবজীর অষ্টমবর্ষীয় বালক শম্ভুজী পাঁচহাজারীর মন্সবদার পদ প্রাপ্ত হইলেন।

শিবজীর সহিত যুদ্ধসমাপ্তির পর রাজা জয়সিংহ বিজয়পুরের রাজ্য ধ্বংস করিয়া সেই প্রদেশ দিল্লীশ্বরের অধীনে আনিবার যত্ন করিতে লাগিলেন। শিবজীর পিতা বিজয়পুরের সহিত শিবজীর যে সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন, শিবজী তাহা লঙ্ঘন করেন নাই, কিন্তু শিবজীর বিপদ্‌কালে বিজয়পুরের সুলতান সন্ধি বিস্মৃত হইয়া শিবজীর রাজ্য আক্রমণ করিতে

সঙ্কুচিত হয়েন নাই। সুতরাং শিবজী এক্ষণে জয়সিংহের পক্ষাবলম্বন করিয়া বিজয়পুরের সুলতান আলী আদিলশাহের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন, এবং আপন মাউলী সৈন্যদ্বারা বহুসংখ্যক দুর্গ হস্তগত করিলেন।

জয়সিংহের সহিত শিবজীর সদ্ভাব উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং পরস্পরের মধ্যে অতিশয় স্নেহ জন্মাইল। উভয়ে সর্ব্বদাই একত্র থাকিতেন ও যুদ্ধে পরস্পরের সহায়তা করিতেন। বলা বাহুল্য যে, শিবজীর একজন তরুণ হাবিলদার সর্ব্বদাই জয়সিংহের একজন পুরোহিতের সদনে যাইতেন। নাম বলিবার কি আবশ্যক আছে?

সরলস্বভাব পুরোহিত জনার্দ্দন ক্রমে রঘুনাথকে পুত্রবৎ দেখিতে লাগিলেন, সর্ব্বদাই গৃহে আহ্বান করিতেন। রঘুনাথও অবসর পাইলেই সেই সরলস্বভাব পুরোহিতের নিকট আসিতেন, তাঁহার নিকট রাজস্থানের সংবাদ পাইতেন, রাজা জয়সিংহের কথা শুনিতেন, স্বদেশের কথা শুনিতেন। কখন কখন বা রজনী দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বসিয়া যুদ্ধের কথা কহিতেন, পর্ব্বতদুর্গ আক্রমণের কথা, শত্রু-শিবির আক্রমণের কথা, জঙ্গল বা গিরিচূড়ায় ভীষণ যুদ্ধের কথা বর্ণনা করিতেন। এ সকল কথা বলিতে বলিতে যোদ্ধার নয়ন প্রজ্বলিত হইত, স্বর কম্পিত হইত, মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিত। বৃদ্ধ জনার্দ্দন সভয়ে যুদ্ধবার্ত্তা শুনিতেন, পার্শ্বের ঘরে নীরবে বসিয়া সরযূবালা সেই জলন্ত কথাগুলি শুনিতেন, নীরবে অশ্রুজল ত্যাগ করিতেন, নীরবে ভগবানের নিকট সেই তরুণ যোদ্ধাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেন। রজনী দ্বিপ্রহরের সময় কথা সাঙ্গ হইত, সরযূবালা আহার আনিয়া দিতেন, যতক্ষণ রঘুনাথ আহার করিতেন, সরযূ নীরবে সেই দেবমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া

চাহিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন না। ভোজনান্তে যদি যোদ্ধা মৃদুস্বরে বিদায় চাহিতেন, বা অন্য দুই একটি কথা কহিতেন, বেপথুমতী উদ্বিগ্না সরযূবালা তাহার উত্তর দিতে পারিতেন না; লজ্জায় তাঁহার গণ্ডস্থল আরক্তবর্ণ হইত, নয়ন দুইটি মুদিত হইত, অবগুণ্ঠন টানিয়া সরযূ সরিয়া যাইতেন, সহচরীকে দিয়া উত্তর পাঠাইয়া দিতেন।

কিন্তু উত্তরের আবশ্যক কি? সরযূর নয়নের ভাষা রঘুনাথ বুঝিতেন, রঘুনাথের নয়নের ভাষা সরযূ বুঝিতেন। উভয়ের জীবন, মন, প্রাণ, প্রথম প্রণয়ের অনির্ব্বচনীয় আনন্দলহরীতে প্লাবিত হইতেছিল, উভয়ের হৃদয় প্রথম প্রণয়ের উদ্বেগে উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল।

অল্পদিন মধ্যে বিজয়পুরের অধীনস্থ অনেকগুলি দুর্গ হস্তগত করিয়া শিবজী অবশেষে একটি অতিশয় দুর্গম পর্ব্বতদুর্গ লইবার মানস করিলেন। তিনি কবে কোন্ দুর্গ আক্রমণ করিবেন, পূর্ব্বে কাহাকেও তাহার সংবাদ দিতেন না, নিজের সৈন্যেরাও পূর্ব্বে কিছুমাত্র জানিতে পারিত না। দিবাভাগে সেই দুর্গ হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরে জয়সিংহের শিবিরের নিকটেই তাঁহার শিবির ছিল, সায়ংকালে এক সহস্র মাউলী ও মহারাষ্ট্রীয় সেনাকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন, এক প্রহর রজনীর সময় গভীর অন্ধকারে প্রকাশ করিলেন যে, রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আক্রমণ করিবেন, নিঃশব্দে সেই এক সহস্র সেনাসমেত দুর্গাভিমুখে গমন করিলেন।

অন্ধকার নিশীথে নিঃশব্দে দুর্গতলে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে সমভূমি, তাহার মধ্যে একটি উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর রুদ্রমণ্ডল দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। পর্ব্বতে উঠিবার একমাত্র পথ আছে, এক্ষণে যুদ্ধকালে সেই পথ রুদ্ধ হইয়াছে। অন্যান্য দিকে উঠা অতিশয় কষ্টসাধ্য, পথ নাই, কেবল জঙ্গল ও শিলারাশি পরিপূর্ণ। শিবজী সেই কঠোর দুর্গম

স্থান দিয়া সেনাগণকে পর্ব্বত আরোহণ করিতে আদেশ দিলেন, তাঁহার মাউলী ও মহারাষ্ট্রীয় সেনাগণ পর্ব্বত-বিড়ালের স্থায় বৃক্ষ ধরিয়া শৈল হইতে শৈলান্তরে লম্ফ দিতে দিতে পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিল। কোন স্থানে দাঁড়াইয়া, কোন স্থানে বসিয়া, কোথাও বৃক্ষের ডাল ধরিয়া লম্বমান হইয়া, কোথাও লম্ফ দিয়া সৈন্যগণ অগ্রসর হইতে লাগিল, মহারাষ্ট্রীয় সেনা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সৈন্য এরূপ পর্ব্বত আরোহণে সমর্থ কি না সন্দেহ।

অর্দ্ধেক পথ উঠিলে পর শিবজী সহসা দেখিলেন, উপরে দুর্গপ্রাচীরের উপর কতকগুলি মশালের আলোক জ্বলিল। চিন্তা-কুল হইয়া ক্ষণেক দণ্ডায়মান রহিলেন, শত্রুরা কি তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছেন? নচেৎ প্রাচীরের উপর এরূপ আলোক জ্বলিল কেন? আলোকের কিরণ দুর্গের নীচে পর্য্যন্ত পতিত হইয়াছে, যেন দুর্গবাসিগণ শত্রুকে প্রতীক্ষা করিয়াই এই আলোক জ্বালিয়াছে, যেন অন্ধকারে আবৃত হইয়া কেহ দুর্গ আক্রমণ করিতে না পারে। শিবজী নিজ সৈন্যগণকে আরও সতর্কভাবে বৃক্ষ ও শৈলরাশির অন্তরাল দিয়া ধীরে ধীরে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। নিঃশব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ সেই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিল, যেখানে বড় বৃক্ষ, যেখানে ঝোপ, যেখানে শৈলরাশি, সেই সেই স্থান দিয়া বুকে হাঁটিয়া উঠিতে লাগিল। শব্দমাত্র নাই, অন্ধকারে নিঃশব্দে শিবজী সেই পর্ব্বতে উঠিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পর মহারাষ্ট্রীয়গণ একটি পরিষ্কার স্থানের নিকট আসিয়া পড়িল, উপর হইতে আলোক তথায় স্পষ্টরূপে পতিত হইয়াছে, সে স্থান দিয়া সৈন্য যাইলে উপর হইতে দেখা যাওয়ার অতিশয় সম্ভাবনা। শিবজী পুনরায় দণ্ডায়মান হইলেন, বৃক্ষের অন্তরালে

দণ্ডায়মান হইয়া এদিকে ওদিকে দেখিতে লাগিলেন। সম্মুখে দেখিলেন, প্রায় শত হস্ত পরিমাণ স্থানে বৃক্ষমাত্র নাই, পরে পুনরায় বৃক্ষশ্রেণী রহিয়াছে। এই শত হস্ত কিরূপে যাওয়া যায়? পার্শ্বে দেখিলেন, যাইবার কোন উপায় নাই. নীচে দেখিলেন, অনেক দূর আসিয়াছেন, পুনরায় নীচে যাইয়া অন্য পথ অবলম্বন করিলে দুর্গে আসিবার পূর্ব্বেই প্রাতঃকাল হইতে পারে। শিবজী ক্ষণেক নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে বাল্যকালের সুহৃদ্ বিশ্বাসী মাউলী যোদ্ধা তন্নজী মালশ্রীকে ডাকাইলেন, দুই জনে সেই বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া ক্ষণেক অতি মৃদুস্বরে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পর তন্নজী চলিয়া যাইল, শিবজী অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার সমস্ত সৈন্য নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে তন্নজী ফিরিয়া আসিল। শিবজীর নিকট আসিয়া অতি মৃদুস্বরে কি কহিল, শিবজী ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া বলিলেন,—তাহাই হউক, অন্য উপায় নাই।

বৃষ্টির জল অবতরণে এক স্থান ধৌত ও ক্ষত হইয়া প্রণালীর ন্যায় হইয়াছিল। দুই পার্শ্ব উচ্চ, মধ্যস্থল গভীর, সেই প্রণালী দিয়া বুকে হাঁটিয়া যাইলে সম্ভবতঃ দুই পার্শ্বে উচ্চ পাড় থাকায় শত্রুরা দেখিতে পাইবে না, এই পরামর্শ স্থির হইল। সমস্ত সৈন্য ধীরে ধীরে সেই প্রণালীর মধ্য দিয়া পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিল। শত শত শিলাখণ্ডের উপর দিয়া নিস্তব্ধ অন্ধকার রজনীতে সহস্র সেনা নিঃশব্দে পর্ব্বত আরোহণ করিতে লাগিল। অচিরাৎ উপরিস্থ বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিল, শিবজী মনে মনে ভবানীকে ধন্যবাদ করিলেন।

সহসা তাঁহার পার্শ্বস্থ একজন সেনা পতিত হইল, শিবজী দেখিলেন, তাহার বক্ষঃস্থলে তীর লাগিয়াছে। আর একটি তীর, আর একটি, আরও বহুসংখ্যক তীর! শত্রুগণ জাগরিত হইয়া রহিয়াছে, শিবজীর সৈন্য প্রণালী দিয়া আরোহণ করিবার সময় তাহারা দেখিতে পাইয়াছে, এবং সেই দিকে তীর নিক্ষেপ করিয়াছে।

শিবজীর সমস্ত সৈন্য বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইল, তীর-নিক্ষেপ থামিয়া গেল, কিন্তু শিবজী বুঝিলেন, শত্রুরা তাঁহার আগমন জানিতে পারিয়াছে। তিনি দুর্গদিকে চাহিয়া দেখিলেন, এখন অনেকগুলি আলোক প্রজ্বলিত হইয়াছে, সময়ে সময়ে প্রহরিগণ এদিক্ ওদিক্ যাইতেছে। তখন তিনি দুর্গপ্রাচীর হইতে কেবলমাত্র পঞ্চাশ হস্ত দূরে। বুঝিলেন, সৈন্যগণ সতর্ক হইয়াছে, ভীষণ যুদ্ধ বিনা অদ্য দুর্গ হস্তগত হইবার নহে।

শিবজীর চিরসহচর তন্নজী এ সমস্ত দেখিল; ধীরে ধীরে বলিল,—রাজন্! এখনও নামিয়া যাইবার সময় আছে, অদ্য দুর্গ হস্তগত না হয়, কল্য হইবে, কিন্তু অদ্য চেষ্টা করিলে সকলের বিনাশ হইবার সম্ভাবনা। শিবজী গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—জয়সিংহের নিকট যাহা বলিয়াছি তাহা করিব, অদ্য রুদ্রমণ্ডল লইব, অথবা এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিব।

শিবজী নিস্তব্ধে সেই বৃক্ষশ্রেণীর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শত্রুকে ভুলাইবার জন্য একশত সৈন্যকে দুর্গের অপর পার্শ্বে যাইয়া গোল করিতে আদেশ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে দুর্গের অপর পার্শ্বে বন্দুকের শব্দ শুনা গেল, সেই দিক্ হইতে শিবজী দুর্গ আক্রমণ করিয়াছেন বিবেচনা করিয়া দুর্গস্থ প্রহরী ও সৈন্য সকল

সেই দিকে ধাবমান হইল, এ দিকে প্রাচীরোপরি যে আলোক জ্বলিতেছিল, তাহা নিবিয়া যাইল! তখন শিবজী বলিলেন,—মহারাষ্ট্রীয়গণ! শত যুদ্ধে তোমরা আপন বিক্রমের পরিচয় দিয়াছ, শিবজীর নাম রাখিয়াছ, অদ্য আর একবার সেই পরিচয় দাও। তন্নজী! বাল্যকালের সৌহৃদ্যের পরিচয় অদ্য প্রদান কর।

প্রভুবাক্যে সকলের হৃদয় সাহসে পরিপূরিত হইল, নিঃশব্দে সেই গভীর অন্ধকারে সকলে অগ্রসর হইল, অচিরে দুর্গপ্রাচীরের নিকট পৌঁছিল। রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, আকাশে আলোক নাই, জগতে শব্দ নাই, কেবল রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু সেই পর্ব্বত-বৃক্ষের ভিতর দিয়া মর্ম্মরশব্দে প্রবাহিত হইতেছে।

রুদ্রমণ্ডলের প্রাচীর হইতে শিবজী বিংশ হস্ত দূরে আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, প্রাচীরের উপর একজন প্রহরী, বৃক্ষের ভিতর শব্দ শ্রবণ করিয়া প্রহরী পুনরায় এই দিকে আসিয়াছে। একজন মাউলী নিঃশব্দে একটি তীর নিক্ষেপ করিল, হতভাগ্য প্রহরীর মৃত শরীর প্রাচীরের বাহিরে পতিত হইল।

সেই শব্দ শুনিয়া আর এক জন, দুই জন, দশ জন, শত জন, ক্রমে দুই তিন শত জন সৈনিক প্রাচীরের উপর ও নীচে জড় হইল। শিবজী রোষে ওষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপন করিলেন, আর লুক্কায়িত থাকিবার উপায় দেখিলেন না, সৈন্যকে অগ্রসর হইবার আদেশ দিলেন।

তৎক্ষণাৎ মহারাষ্ট্রীয়দিগের "হর হর মহাদেও" যুদ্ধনাদ গগনে উত্থিত হইল, একদল প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার জন্য দৌড়াইয়া গেল, আর একদল বৃক্ষের ভিতর থাকিয়াই ক্ষিপ্রহস্তে প্রাচীরারোহী মুসলমানদিগকে তীর দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল। মুসলমানেরাও শত্রুর

আগমনে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া, "আল্লাহু আকবর" শব্দে আকাশ ও মেদিনী কম্পিত করিল, কেহ বা প্রাচীরের উপর হইতে তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কেহ বা উৎসাহপরিপূর্ণ হইয়া প্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া আসিয়া বৃক্ষমধ্যেই মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিল।

শীঘ্রই সেই প্রাচীরতলে ও বৃক্ষমধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রাচীরের উপরিস্থ মুসলমানেরা বর্শাচালনে আক্রমণকারীদিগকে হত করিতে লাগিল, তাহারাও অব্যর্থ তীরসঞ্চালনে মুসলমানদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। রাশি রাশি মৃতদেহে প্রাচীরপার্শ্ব পরিপূর্ণ হইল, যোদ্ধাগণ সেই মৃতদেহের উপর দণ্ডায়মান হইয়াই খড়্গ বা বর্শাচালন করিতে লাগিল। শত শত মুসলমান বৃক্ষের ভিতর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, শিবজীর মাউলীগণ একেবারে ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, প্রবলপ্রতাপ আফগানেরাও যুদ্ধে অপটু নহে, রক্তস্রোত সেই পর্ব্বত দিয়া বহিয়া পড়িতে লাগিল। বৃক্ষের অন্তরালে, ঝোপের ভিতর, শিলারাশির পার্শ্বে শত শত মহারাষ্ট্রীয়গণ দণ্ডায়মান হইয়া অব্যর্থ তীর সঞ্চালন করিতে লাগিল, বৃক্ষপত্র ও বৃক্ষশাখার ভিতর দিয়া সেই অবারিত তীরশ্রেণী মুসলমান-সংখ্যা ক্ষীণতর করিতে লাগিল।

সহসা এ সমস্ত শব্দকে ডুবাইয়া প্রাচীর হইতে "শিবজীকি জয়" এইরূপ বজ্রনাদ উত্থিত হইল, মুহূর্ত্তের জন্য সকলেই সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া, রক্তাপ্লুত বর্শার উপর ভর দিয়া, একজন রাজপুত যোদ্ধা এক লম্ফে রুদ্রমণ্ডলের প্রাচীরের উপর উঠিয়াছেন। তথায় পাঠানদিগের পতাকা পদাঘাতে ফেলিয়া দিয়াছেন, পতাকাধারী প্রহরীকে খড়্গাচালনে হত করিয়াছেন, প্রাচীরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া সেই অপূর্ব্ব যোদ্ধা বজ্রনাদে

"শিবজীকি জয়" শব্দ করিয়াছিলেন। সেই যোদ্ধা রঘুনাথজী হাবিলদার!

হিন্দু ও মুসলমান এক মুহূর্ত্তের জন্য যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে তারকালোকে সেই দীর্ঘ মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি করিল। যোদ্ধার লৌহনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ তারকালোকে চক্‌মক্ করিতেছে, হস্ত ও বাহুদ্বয় রক্তে আপ্লুত, বিশাল বৃক্ষের উপর দুই একটি তীর লাগিয়া রহিয়াছে. দীর্ঘহস্তে রক্তাপ্লুত দীর্ঘ বর্শা, উজ্জ্বল নয়ন, গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশে আবৃত। পোতের সম্মুখে ঊর্ম্মিরাশির ন্যায় শত্রুরা এই যোদ্ধার দুই পার্শ্বে মুহূর্ত্তের জন্য সচকিত হইয়া সরিয়া গেল, মুহূর্ত্তের জন্য বোধ হইল যেন স্বয়ং রণদেব দীর্ঘ বর্শাহস্তে আকাশ হইতে প্রাচীরোপরি অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ক্ষণকালমাত্র সকলে নিস্তব্ধ রহিল, পরে আফগানগণ শত্রু প্রাচীরে উঠিয়াছে দেখিয়া চারিদিক্ হইতে বেগে আসিতে লাগিল, রঘুনাথকে চারিদিকে শত্রুদল কৃষ্ণমেঘের ন্যায় আসিয়া বেষ্টন করিল। রঘুনাথ খড়্গ ও বর্শা-চালনে অদ্বিতীয়, কিন্তু শত লোকের সহিত যুদ্ধ অসম্ভব, রঘুনাথের জীবনসংশয়।

তখন মাউলীগণ রঘুনাথের বিক্রম দেখিয়া উৎসাহিত হইয়া সেই প্রাচীরের দিকে ধাবমান হইল, ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া প্রাচীরে উঠিল, রঘুনাথের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। দশ, পঞ্চাশ, দুই তিন শত জন সেই প্রাচীরের উপর বা উভয় পার্শ্বে আসিয়া জড় হইল, ছুরিকা ও খড়্গাঘাতে পাঠানদিগের সারি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পথ পরিষ্কার করিল, মহানাদে দুর্গ পরিপূরিত করিল! সহস্র মহারাষ্ট্রীয়ের সহিত দুই তিন শত পাঠানের যুদ্ধ করা সম্ভব নহে, তাহারা মহারাষ্ট্রীয়ের গতিরোধ করিতে পারিল না।

তখন শিবজী ও তন্নজী প্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া দুর্গের ভিতর দিকে ধাবমান হইতেছেন; সৈন্যগণ বুঝিল, আর এ স্থানে যুদ্ধের আবশ্যক নাই, সকলেই প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুর্গের ভিতর দিকে ধাবমান হইল।

শিবজী বিদ্যুদ্‌গতিতে কিল্লাদারের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন, সে প্রাসাদ অতিশয় কঠিন ও সুরক্ষিত। শিবজীর আদেশ অনুসারে মহারাষ্ট্রীয়েরা সেই প্রাসাদ বেষ্টন করিল ও বাহিরের প্রহরী সকলকে হত করিল। শিবজী তখন বজ্রনাদে কিল্লাদারকে বলিলেন,—দ্বার খুলিয়া দাও, নচেৎ প্রাসাদ দাহ করিব। নির্ভীক পাঠান উত্তর করিলেন,—অগ্নিতে দাহ হইব, কিন্তু কাফেরের সম্মুখে দ্বার খুলিব না।

তৎক্ষণাৎ মহারাষ্ট্রীয়গণ মশাল আনিয়া দ্বারে জানালায় অগ্নিদান করিতে লাগিল। উপর হইতে কিল্লাদার ও তাঁহার সঙ্গিগণ তীরনিক্ষেপ দ্বারা প্রাসাদে অগ্নিদান নিবারণ করিবার চেষ্টা পাইলেন। অনেক মহারাষ্ট্রীয় মশাল হস্তে ভূতলশায়ী হইল, কিন্তু অগ্নি জ্বলিল।

প্রথমে দ্বার, গবাক্ষ, পরে কড়িকাষ্ঠ, পরে সেই বিস্তীর্ণ প্রাসাদ সমস্ত অগ্নিতে জ্বলিয়া উঠিল। সেই প্রচণ্ড আলোক ভীষণনাদে আকাশের দিকে উত্থিত হইল ও রজনীর অন্ধকারকে আলোকময় করিল। বহুদূর পর্য্যন্ত পর্ব্বতে ও উপত্যকা হইতে সেই আলোক দৃষ্ট হইল, সেই দাহের শব্দ শ্রুত হইল, সকলে জানিল, শিবজীর দুর্দ্দমনীয় ও অপ্রতিহত সেনা মুসলমান-দুর্গ জয় করিয়াছে।

বীরের যাহা সাধ্য, পাঠান কিল্লাদার রহমৎ খাঁ তাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে বীরের ন্যায় মরিতে বাকী ছিল। যখন গৃহ অগ্নিপূর্ণ হইল, তখন রহমৎ খাঁ ও সঙ্গিগণ লম্ফ দিয়া ছাদ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিলেন। এক একজন এক এক মহাবীরের ন্যায় খড়্গাচালনা করিতে লাগিলেন, সেই খড়্গাচালনায় বহু মহারাষ্ট্রীয় হত হইল।

সকলে সেই মুসলমানদিগকে বেষ্টন করিল, তাহারা শত্রুর মধ্যে একে একে হত হইতে লাগিল। একজন, দুইজন, দশজন হত হইল। রহমৎ খাঁ আহত ও ক্ষীণ, কিন্তু তখনও সিংহবীর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়াছে, চারিদিকে খড়্গ উত্তোলিত হইয়াছে, তাঁহার জীবনের আশা নাই, এরূপ সময় উচ্চৈঃস্বরে শিবজীর আদেশ শ্রুত হইল,—"কিল্লাদারকে বন্দী কর, বীরের প্রাণসংহার করিও না।" ক্ষীণ আহত আফগানের হস্ত হইতে শিবজীর সেনাগণ খড়্গ কাড়িয়া লইল, তাঁহার হস্ত বন্ধন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিল।

মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রাসাদের অগ্নি নির্ব্বাণ করিতেছে, এমন সময়ে শিবজী দেখিলেন, দুর্গের অপর দিকে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় প্রায় পাঁচশত আফগান সৈন্য সজ্জিত হইয়া পর্ব্বতে উঠিতেছে। শিবজী দুর্গপ্রাচীর আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে যে একশত সেনাকে অপর পার্শ্বে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহারা সেই দিকে গোল করাতে দুর্গের অধিকাংশ সেনা সেই দিকেই গিয়াছিল। চতুর মহারাষ্ট্রীয়গণ ক্ষণেক বৃক্ষের অন্তরাল হইতে যুদ্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে পলায়ন করিতে লাগিল, তাহাতে মুসলমানেরা উৎসাহিত হইয়া পর্ব্বতের তলা পর্য্যন্ত সেই একশত মহারাষ্ট্রীয়ের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, অপর দিকে শিবজী আক্রমণ করিয়া যে দুর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহা তাহারা কিছুই জানিতে পারে নাই।

পরে যখন প্রাসাদের আলোকে ক্ষেত্র, গ্রাম, পর্ব্বত ও উপত্যকা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন সেই অধিকাংশ মুসলমানগণ আপনাদিগের ভ্রম জানিতে পারিয়া পুনরায় দুর্গারোহণ করিয়া শত্রু বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। শিবজী অল্পসংখ্যক্ সেনাকে পরাস্ত করিয়া দুর্গজয় করিয়াছিলেন, একণে দেখিলেন, পাঁচশত যোদ্ধা দ্রুতবেগে সেই

পর্ব্বতদুর্গ আরোহণ করিতেছে। দেখিয়া তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল। সুতীক্ষ্ণ নয়নে দেখিলেন, দুর্গের মধ্যে কিল্লাদারের প্রাসাদই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম স্থান। চারিদিকে প্রস্তরময় প্রাচীর, অগ্নিতে সে প্রাচীরের কিছু-মাত্র অনিষ্ট হয় নাই। প্রাসাদের দ্বার ও গবাক্ষ জ্বলিয়া গিয়াছে, কোথাও বা ঘর পড়িয়া প্রস্তর স্তূপাকার হইয়াছে। তীক্ষ্ণনয়ন শিবজী মুহূর্ত্তের মধ্যে দেখিলেন, অধিকসংখ্যক্ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার স্থল ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর হইতে পারে না।

মুহূর্ত্ত মধ্যে মনে সমস্ত ধারণা করিলেন। তন্নজী ও দুইশত সেনাকে সেই প্রাসাদে সন্নিবেশিত করিলেন, প্রাচীরের পার্শ্বে তীরন্দাজ রাখিলেন, দ্বার ও গবাক্ষের পার্শ্বে তীরন্দাজ রাখিলেন, ছাদের উপর বর্শাধারী যোদ্ধৃগণকে সন্নিবেশিত করিলেন। কোথাও প্রস্তর পরিষ্কার করিলেন, কোথাও অধিক প্রস্তর একত্র করিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত প্রস্তুত। তখন হাস্য করিয়া তন্নজীকে কহিলেন,—তন্নজী, শত্রুরা যদি এই প্রাসাদ আক্রমণ করে, তুমি ইহা রক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু শত্রুকে এই স্থানে আসিতে দিবার পূর্ব্বে বোধ হয় পরা. করা যাইতে পারে, তাহারা এখনও পর্ব্বত আরোহণ করিতেছে, এই সময়ে আক্রমণ করা উচিত। তন্নজী, দুইশত সৈন্য সহিত এই স্থানে অবস্থিতি কর, আমি একবার উদ্যোগ করিয়া দেখি।

তন্নজী। তন্নজী এ স্থানে অবস্থিতি করিবে না, একজন মহা-রাষ্ট্রীয়ও এ স্থানে অবস্থিতি করিবে না! ক্ষত্রিয়রাজ! আপনি এই প্রাসাদ রক্ষা করুন, সমস্ত সুশৃঙ্খলা করুন। আগন্তুক শত্রুদিগকে তাড়া-ইয়া দিতে আপনার ভৃত্যেরা কি সক্ষম নহে?

শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—তন্নজী! তোমার কথাই ঠিক! আমি সম্মুখে শত্রু দেখিয়া যুদ্ধ-লুব্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু তোমার পরামর্শই

উৎকৃষ্ট, এই স্থানেই আমার থাকা কর্ত্তব্য। আমার হাবিলদারদিগের মধ্যে কে দুই শত মাত্র সেনা লইয়া ঐ আফগানদিগকে অন্ধকারে সহসা আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিতে পারিবে?

পাঁচ, সাত, দশজন হাবিলদার একেবারে দণ্ডায়মান হইলেন, সকলে গোল করিয়া উঠিল। রঘুনাথ তাহাদের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না, নিঃশব্দে মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শিবজী ধীরে ধীরে সকলের দিকে চাহিয়া পরে রঘুনাথকে দেখিয়া বলিলেন,—হাবিলদার! তুমি ইহাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ, কিন্তু ঐ বাহুতে তুমি অসুরবীর্য্য ধারণ কর, অদ্য তোমার বিক্রম দেখিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি। রঘুনাথ! তুমিই অদ্য দুর্গবিজয় আরম্ভ করিয়াছ, তুমিই শেষ কর।

রঘুনাথ নিঃশব্দে ভূমি পর্য্যন্ত শির নামাইয়া দুইশত সেনার সহিত বিদ্যুৎগতিতে নয়নের বহির্গত হইলেন। শিবজী তন্নজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—ঐ হাবিলদার রাজপুতজাতীয়, উহার মুখমণ্ডল ও আচরণ দেখিলে কোন উন্নত বীরবংশোদ্ভব বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু হাবিলদার কখনও বংশের বিষয় একটি কথাও বলে না, আপন অসাধারণ সাহস সম্বন্ধে একটি গর্ব্বিত বাক্য উচ্চারণ করে না। একদিন পুনায় রঘুনাথ আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, অদ্য রঘুনাথই দুর্গবিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিল। আমি এ পর্য্যন্ত কোনও পুরস্কার দিই নাই, কল্য রাজসভায় রাজা জয়সিংহের সম্মুখে রাজপুত হাবিলদারকে উচিত পুরস্কার দিব।

রঘুনাথজী যে কার্য্যের ভার লইলেন, তাহা সম্পন্ন করিলেন। আফগানগণ যখন পর্ব্বত আরোহণ করিতেছে, এমন সময়ে প্রাচীরের উপর হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণ বর্শা নিক্ষেপ করিল, পরে "হর হর মহাদেও"

ভীষণনাদে যুদ্ধের উপক্রম করিল। সে যুদ্ধ হইল না। প্রাচীরের উপর মশালের আলোকে অসংখ্যক শত্রু দেখিয়া আফগানগণ দুর্গ উদ্ধার করা দুঃসাধ্য জানিয়া পুনরায় পর্ব্বত অবতরণ করিয়া পলাইল। মাউলীগণ পশ্চাদ্ধাবন করিল, উন্মত্ত মাউলীদিগের অবারিত ছুরিকা ও খড়্গাঘাতে আফগানগণ নিপতিত হইতে লাগিল।

রঘুনাথ তখন উচ্চৈঃস্বরে আদেশ দিলেন,—পলাতককে যাইতে দাও, হত্যা করিও না, শিবজীর আদেশ পালন কর। যুদ্ধ শেষ হইল, আফগানগণ পর্ব্বত অবতরণ করিয়া পলাইল।

তখন রঘুনাথ দুর্গের প্রাচীরের স্থানে স্থানে প্রহরী সংস্থাপন করিলেন, গোলা, বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্রের ঘরে আপন প্রহরী সন্নিবেশিত করিলেন, দুর্গের সমস্ত ঘর, সমস্ত স্থান হস্তগত করিয়া সুরক্ষার আদেশ দিয়া শিবজীর নিকট যাইয়া শির নামাইয়া সমস্ত সমাচার নিবেদন করিলেন।

যখন উষার রক্তিমচ্ছটা পূর্ব্বদিকে দৃষ্ট হইল, প্রাতঃকালের সুমন্দ শীতল বায়ু বহিতে লাগিল, তখন সমস্ত দুর্গ শব্দশূন্য, নিস্তব্ধ। যেন এই সুন্দর শান্ত পাদপমণ্ডিত পর্ব্বতশিখর যোগি-ঋষির আশ্রম, যেন যুদ্ধের পৈশাচিক রব কখনও এ স্থানে শ্রুত হয় নাই!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বিজেতার পুরস্কার

ছিন্ন তুষারের ন্যায় বাল্য-বাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝা বায়ু প্রহারে।
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত,
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গপ্রাকারে॥

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরদিন অপরাহ্ণে সেই দুর্গোপরি অপরূপ সভা সন্নিবেশিত হইল। রৌপ্যবিনির্ম্মিত চারি স্তম্ভের উপর রক্তবর্ণের চন্দ্রাতপ, নীচেও রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত রাজগদীর উপর রাজা জয়সিংহ ও রাজা শিবজী উপবেশন করিয়া আছেন। চারি পার্শ্বে সৈন্যগণ বন্দুক লইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই বন্দুকের কিরীচ হইতে রক্তবর্ণের পতাকা অপরাহ্ণের বায়ুহিল্লোলে নৃত্য করিতেছে। চারিদিকে শত শত লোক দিল্লীশ্বরের, জয়সিংহের ও শিবজীর জয়নাদ করিতেছে।

জয়সিংহ সহাস্যবদনে শিবজীকে বলিলেন,—আপনি দিল্লীশ্বরের পক্ষাবলম্বন করিয়া অবধি তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়াছেন। এ উপকার দিল্লীশ্বর কখনই বিস্মৃত হইবেন না, আপনার সকল চেষ্টার জয় হইয়াছে।

শিবজী। যেখানে জয়সিংহ, সেইখানেই জয়!

জয়সিংহ। বোধ করি, আমরা শীঘ্রই বিজয়পুর হস্তগত করিতে পারিব, আপনি এক রাত্রির মধ্যে এই দুর্গ অধিকার করিবেন, তাহা আমি কখনই আশা করি নাই।

শিবজী। মহারাজ! দুর্গ-বিজয় বাল্যকাল হইতে শিক্ষা করিয়াছি। তথাপি যেরূপ অনায়াসে দুর্গ লইব বিবেচনা করিয়াছিলাম, সেরূপ পারি নাই।

জয়সিংহ। কেন?

শিবজী। মুসলমানদিগকে সুপ্ত পাইব বিবেচনা করিয়াছিলাম, দেখিলাম সকলে জাগ্রত ও সসজ্জ। পূর্ব্বে কখনও দুর্গজয় করিতে আমার এত সৈন্য হত হয় নাই।

জয়সিংহ। বোধ করি, এক্ষণ যুদ্ধের সময় বলিয়া রজনীতে সর্ব্বদাই শত্রুরা সসজ্জ থাকে।

শিবজী। সত্য, কিন্তু এত দুর্গজয় করিয়াছি, কোথাও সৈন্যগণকে এরূপ প্রস্তুত দেখি নাই।

জয়সিংহ। শিক্ষা পাইয়া ক্রমেই সতর্ক হইতেছে। কিন্তু সতর্কই থাকুক আর নাই থাকুক, রাজা শিবজীর গতিরোধ করা অসাধ্য, শিবজীর জয় অনিবার্য্য।

শিবজী। মহারাজের প্রসাদে দুর্গজয় হইয়াছে বটে, কিন্তু কল্য রজনীর ক্ষতি জীবনে পূরণ হইবে না। সহস্র আক্রমণকারীর মধ্যে দুই তিন শত জনকে আমি আর এ জীবনে দেখিব না, সেরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ বিশ্বস্ত সেনা বোধ হয় আর পাইব না। শিবজী ক্ষণেক শোকাকুল হইয়া রহিলেন। পরে বন্দিগণকে আনয়নের আদেশ করিলেন।

রহমৎ খাঁর অধীনে সহস্র সেনা সেই দুই দুর্গম দুর্গ রক্ষা করিত,

কল্যকার যুদ্ধের পর কেবল দুই [illegible] বন্দিরূপে আছে। অস্ত্র সমস্ত হত বা [illegible] হস্তদ্বয় পশ্চাদ্দিকে বদ্ধ তাহারা সভা সম্মুখে।

শিবজী [illegible] আফগান সেনাগণ! তোমরা বীরের নাম রাখিয়াছ, তোমাদের আচরণে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমরা স্বাধীন। ইচ্ছা হয়, দিল্লীশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত হও, নচেৎ আপন প্রভু বিজয়পুরের সুলতানের নিকট চলিয়া যাও, আমার আদেশে কেহ তোমাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিবে না।

শিবজীর এই সদাচরণ দেখিয়া কেহই বিস্মিত হইল না। সকল যুদ্ধে, সকল দুর্গবিজয়ের পর বিজিতদিগের প্রতি যথেষ্ট দয়াপ্রকাশ ও সদাচরণ করিতেন, তাঁহার বন্ধুগণ কখন কখন তাঁহাকে এ জন্য দোষ দিতেন, কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। শিবজীর সদাচরণে বিস্মিত হইয়া আফগানগণ অনেকেই দিল্লীশ্বরের বেতনভোগী হইতে স্বীকার করিল।

পরে শিবজী কিল্লাদার রহমৎ খাঁকে আনিবার আদেশ দিলেন। তাঁহারও হস্তদ্বয় পশ্চাদ্দিকে বদ্ধ, তাঁহার ললাটে খড়্গের আঘাত, বাহুতে তীর বিদ্ধ হইয়া ক্ষত হইয়াছে। বীর সদর্পে সভা-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, সদর্পে শিবজীর দিকে চাহিলেন।

শিবজী সেই বীরশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া স্বয়ং আসন ত্যাগ করিয়া খড়্গের দ্বারা হস্তের রজ্জু কাটিয়া ফেলিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—বীরবর! যুদ্ধের নিয়মানুসারে আপনার হস্তদ্বয় বদ্ধ হইয়াছিল, আপনি এক রজনী বন্দিরূপে ছিলেন, আমার সে দোষ মার্জ্জনা করুন। আপনি এক্ষণে স্বাধীন। জয়-পরাজয় ভাগ্যক্রমে ঘটে, কিন্তু আপনার ন্যায় যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমিই সম্মানিত হইয়াছি।

রহমৎ খাঁ প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাশা করিতেছিলেন, তাহাতেও তাঁহার স্থির গর্ব্বিত নয়নের একটি পত্রও কম্পিত হয় নাই, কিন্তু শিবজীর এই অসাধারণ ভদ্রতা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল। যুদ্ধ-সময়ে শত্রুমধ্যে কেহ কখনও রহমৎ খাঁর কাতরতা-চিহ্ন দেখেন নাই, অদ্য বৃদ্ধের দুই উজ্জ্বল চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। রহমৎ খাঁ মুখ ফিরাইয়া তাহা মোচন করিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন,—ক্ষত্রিয়রাজ! কল্য নিশীথে আপনার বাহুবলে পরাস্ত হইয়াছিলাম, অদ্য আপনার ভদ্রাচরণে তদধিক পরাস্ত হইলাম। যিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগের অধীশ্বর, যিনি বাদশাহের উপর বাদশাহ, জমীন ও আশমানের সুলতান, তিনি এই জন্য আপনাকে নূতন রাজ্যবিস্তারের ক্ষমতা দিয়াছেন।

জয়সিংহ। পাঠান সেনাপতি, আপনারও উচ্চপদের যোগ্যতা আপনি প্রমাণ করিয়াছেন। দিল্লীশ্বর আপনার ন্যায় সেনা পাইলে আরও পদবৃদ্ধি করিবেন সন্দেহ নাই। দিল্লীশ্বরকে কি লিখিতে পারি যে, আপনার ন্যায় বীরশ্রেষ্ঠ তাঁহার সৈন্যের এক জন প্রধান কর্ম্মচারী হইতে সম্মত হইয়াছেন?

রহমৎ খাঁ। মহারাজ! আপনার প্রস্তাবে আমি যথেষ্ট সম্মানিত হইলাম, কিন্তু আজীবন যাঁহার কার্য্য করিয়াছি, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব না। যতদিন এ হস্ত খড়্গ ধরিতে পারিবে, বিজয়পুরের জন্য ধরিবে।

শিবজী। তাহাই হউক। আপনি অদ্য রাত্রি বিশ্রাম করুন, কল্য প্রাতে আমার একদল সেনা আপনাকে বিজয়পুর পর্য্যন্ত নিরাপদে পৌঁছিয়া দিবে।

রহমৎ খাঁ। ক্ষত্রিয়বর! আপনি আমার সহিত ভদ্রাচরণ করিয়াছেন,

আমি অভদ্রাচরণ করিব না, আপনার নিকট কোন বিষয় গোপন রাখিব না। আপনার সেনার মধ্যে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, সকলে প্রভুভক্ত নহে। কল্য দুর্গাক্রমণের গোপনানুসন্ধান আমি পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই জন্যই সমস্ত সেনা সমস্ত রাত্রি সসজ্জ ও প্রস্তুত ছিল। অনুসন্ধানদাতা আপনারই এক জন সেনা। ইহার অধিক বলিতে পারি না, সত্যলঙ্ঘন করিব না।

এই বলিয়া রহমৎ খাঁ ধীরে ধীরে প্রহরিগণের সহিত প্রাসাদাভিমুখে চলিয়া গেলেন। রোষে শিবজীর মুখমণ্ডল একেবারে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার বন্ধুগণ বুঝিলেন, এক্ষণে পরামর্শ দেওয়া বৃথা, তাঁহার সৈন্যগণ বুঝিল, অদ্য প্রমাদ উপস্থিত।

জয়সিংহ শিবজীকে এতদবস্থায় দেখিয়া, তাঁহাকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া, পরে সৈন্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—এই দুর্গ আক্রমণ করা হইবে, তোমরা কখন্ জানিয়াছিলে?

সৈন্যগণ উত্তর দিল,—এক প্রহর রজনীতে।

জয়সিংহ। তাহার পূর্ব্বে কেহই এ কথা জানিতে না?

সৈন্যগণ। রজনীতে কোন একটি দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে জানিতাম; এই দুর্গ আক্রমণ করিতে হইবে, তাহা জানিতাম না।

জয়সিংহ। ভাল, কোন্ সময়ে তোমরা দুর্গে পৌঁছিয়াছিলে?

সৈন্যগণ। অনুমান দেড় প্রহর রজনীর সময়।

জয়সিংহ। উত্তম, এক প্রহর হইতে দেড় প্রহর মধ্যে তোমরা সকলেই কি একত্র ছিলে? কেহ অনুপস্থিত ছিল না? যদি হইয়া থাকে, প্রকাশ কর। একজনের দোষের জন্য সহস্র জনের গ্লানি অনুচিত। তোমরা দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে রাজা শিবজীর অধীনে

যুদ্ধ করিয়াছ, রাজা তোমাদিগকে বিশ্বাস করেন, তোমরাও এরূপ প্রভু কখনও পাইবে না। আপনাদিগকে বিশ্বাসের যোগ্য প্রমাণ কর, যদি কেহ বিদ্রোহী থাকে, তাহাকেও আনিয়া দাও। যদি সে কল্য রজনীর যুদ্ধে মরিয়া থাকে, তাহার নাম কর, অন্যায় সন্দেহে কেন সকলের নাম কলুষিত হইতেছে?

সৈন্যগণ তখন কল্যকার কথা স্মরণ করিতে লাগিল, পরস্পরে কথা কহিতে লাগিল, শিবজীর ক্রোধ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া শিবজী বলিলেন,—মহারাজ! অদ্য যদি সেই কপট যোদ্ধাকে বাহির করিয়া দিতে পারেন, আমি চিরকাল আপনার নিকট ঋণী থাকিব।

চন্দ্ররাও নামে একজন জুমলাদার অগ্রসর হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—রাজন্! কল্য এক প্রহর রজনীর সময় যখন আমরা যুদ্ধযাত্রা করি, তখন আমার অধীনস্থ একজন হাবিলদারকে অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। যখন দুর্গতলে পঁহুছিলাম, তখন তিনি আমাদের সহিত যোগ দিলেন।

শিবজী। সে কে, এখনও জীবিত আছে?

বিদ্রোহীর নাম শুনিবার জন্য সকলে নিস্তব্ধ! শিবজীর ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে, সভাতলে একটি সূচিকা পড়িলে বোধ হয়, তাহার শব্দ শুনা যায়। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে বলিলেন,—"রঘুনাথজী হাবিলদার!"

সকলে নির্বাক্, বিস্ময়স্তব্ধ!

চন্দ্ররাও একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু রঘুনাথের আগমনাবধি সকলে চন্দ্ররাওয়ের নাম ও বিক্রম বিস্মৃত হইয়াছিলেন। মানবপ্রকৃতিতে ঈর্ষ্যার ন্যায় ভীষণ বলবতী প্রবৃত্তি আর নাই।

শিবজীর মুখমণ্ডল পুনরায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিল, ওষ্ঠে দন্তস্থাপন করিয়া চন্দ্ররাওকে লক্ষ্য করিয়া সরোষে বলিলেন,—রে কপটাচারি ! বৃথা এ কপট অভিযোগ করিতেছিস্ ! তোর নিন্দা রঘুনাথের যশোরাশি স্পর্শ করিবে না, রঘুনাথের আচরণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কিন্তু মিথ্যা নিন্দুকের শাস্তি সৈন্যেরা দেখুক।

সেই বজ্রহস্তে শিবজী লৌহবর্শা উত্তোলন করিয়াছেন, সহসা রঘুনাথ সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—মহারাজ ! প্রভু চন্দ্ররাওয়ের প্রাণসংহার করিবেন না, তিনি মিথ্যাবাদী নহেন, আমার দুর্গতলে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল।

আবার সভাস্থল নিস্তব্ধ, সকলে নির্ব্বাক্, বিস্ময়স্তব্ধ !

শিবজী ক্ষণকাল প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে ললাটের স্বেদবিন্দু মোচন করিয়া বলিলেন,—আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি ! তুমি রঘুনাথ—তুমি এই কার্য্য করিয়াছ ? তুমি যে প্রাচীরলঙ্ঘনের সময় একাকী দুদ্দমনীয় তেজে অগ্রসর হইয়াছিলে, তুমি যে দুই শত মাত্র সেনা লইয়া পাঁচ শত আফগানকে দুর্গের নীচে পর্য্যন্ত হটাইয়া দিয়াছিলে,—তুমি বিদ্রোহাচরণ করিয়া কিল্লাদারকে পূর্ব্বে আক্রমণ-সংবাদ দিয়াছিলে ?

রঘুনাথ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, —প্রভু, আমি সে দোষে নির্দ্দোষ।

দীর্ঘকায় নির্ভীক তরুণ যোদ্ধা শিবজীর অগ্নিদৃষ্টির সম্মুখে নিকম্প হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, চক্ষের পলক পড়িতেছে না, একটি পত্র পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে না। সভাস্থ সকলে এবং চারিদিকে অসংখ্য লোক রঘুনাথের দিকে তীব্র দৃষ্টি করিতেছে, রঘুনাথজী স্থির, অবিচলিত, অকম্পিত, তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল কেবল গভীর নিশ্বাসে স্ফীত

হইতেছে! কল্য যেরূপ অসংখ্য শত্রুমধ্যে প্রাচীরোপরি একাকী দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, অদ্য তদপেক্ষা অধিক সঙ্কটমধ্যে যোদ্ধা সেইরূপ ধীর, সেইরূপ অবিচলিত!

শিবজী তর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—তবে কি জন্য আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া এক প্রহর রজনীর সময় অনুপস্থিত ছিলে?

রঘুনাথের ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল, কিন্তু তিনি কোন উত্তর না করিয়া ভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রঘুনাথকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া শিবজীর সন্দেহবৃদ্ধি হইল, নয়নদ্বয় পুনরায় রক্তবর্ণ হইল,—ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিলেন,—কপটাচারি! এই জন্য বীরত্বপ্রদর্শন করিয়াছিলে? কিন্তু কুক্ষণে শিবজীর নিকট ছলনা চেষ্টা করিয়াছিলে।

রঘুনাথ সেইরূপ ধীর অকম্পিত স্বরে বলিলেন,—রাজন! ছলনা ও কপটাচরণ আমার বংশের রীতি নহে, বোধ হয়, প্রভু চন্দ্ররাও তাহা জানিতে পারেন।

রঘুনাথের স্থিরভাব শিবজীর ক্রোধে আহুতিস্বরূপ হইল, তিনি কর্কশভাবে বলিলেন,—পাপিষ্ঠ! পরিত্রাণ-চেষ্টা বৃথা। ক্ষুধার্ত্ত সিংহের গ্রাসে পড়িয়া পলায়ন করিতে পার, কিন্তু শিবজীর জলন্ত ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ নাই।

রঘুনাথ পূর্ব্ববৎ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—আমি মহারাজের নিকট পরিত্রাণ-প্রার্থনা করি না, মনুষ্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি না, জগদীশ্বর আমার দোষ মার্জ্জনা করুন।

ক্ষিপ্তপ্রায় শিবজী বর্শা উত্তোলন করিয়া বজ্রনাদে আদেশ করিলেন,—বিদ্রোহাচরণের শাস্তি প্রাণদণ্ড।

রঘুনাথ সেই বজ্রমুষ্টিতে তীক্ষ্ণ বর্শা দেখিলেন, তখনও সেই

অবিচলিত স্বরে বলিলেন,—যোদ্ধা মরণে প্রস্তুত আছে, বিদ্রোহাচরণ সে করে নাই।

শিবজী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, অব্যর্থ মুষ্টিতে সেই বর্শা কম্পিত হইতেছে। এরূপ সময়ে রাজা জয়সিংহ তাঁহার হস্তধারণ করিলেন।

তখন শিবজীর মুখমণ্ডল ক্রোধে বিকৃত হইয়াছিল, শরীর কম্পিত হইতেছিল, তিনি জয়সিংহের প্রতিও সমুচিত সম্মান বিস্মৃত হইয়া কর্কশস্বরে কহিলেন,—হস্ত ত্যাগ করুন। রাজপুতদিগের কি নিয়ম জানি না, জানিতে চাহি না, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সনাতন নিয়ম, বিদ্রোহীর শাস্তি প্রাণদণ্ড। শিবজী সেই নিয়ম পালন করিবে।

জয়সিংহ কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—ক্ষত্রিয়রাজ! অদ্য যাহা করিবেন, কল্য তাহা অন্যথা করিতে পারিবেন না। এই যোদ্ধার অদ্য প্রাণদণ্ড করিলে চিরকাল সে জন্য অনুতাপ করিবেন। যুদ্ধব্যবসায় আমার কেশ শুক্ল হইয়াছে, আমার মত গ্রহণ করুন, এ যোদ্ধা বিদ্রোহী নহে। কিন্তু সে বিচারে এক্ষণে আবশ্যক নাই; আপনি আমার সুহৃদ্, সুহৃদের নিকট আমি এই রাজপুত যোদ্ধার প্রাণভিক্ষা করিতেছি। আমাকে ভিক্ষা দান করুন।

শিবজী জয়সিংহর ভদ্রতা দেখিয়া ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেন; কহিলেন,—তাত! আমার পরুষবাক্য মার্জ্জনা করুন, আপনার কথা কখনও অবহেলা করিব না, কিন্তু শিবজী বিদ্রোহীকে ক্ষমা করিবে তাহা কখনও মনে ভাবে নাই। হাবিলদার! রাজা জয়সিংহ তোমার জীবন রক্ষা করিলেন, কিন্তু আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, শিবজী বিদ্রোহীর মুখদর্শন করিতে চাহে না।

রঘুনাথ সভাস্থল ত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়

শিবজী পুনরায় বলিলেন,—অপেক্ষা কর। দুই বৎসর হইল, তোমার কোষের ঐ অসি আমিই তোমাকে দিয়াছিলাম, বিদ্রোহীর হস্তে আমার অসির অবমাননা হইবে না। প্রহরিগণ! অসি কাড়িয়া লও, পরে বিদ্রোহীকে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া দাও।

রঘুনাথের যখন প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, রঘুনাথ সে সময় অবিচলিত ছিলেন। কিন্তু প্রহরিগণ যখন অসি কাড়িয়া লইতেছিল, তখন তাঁহার শরীর কম্পিত হইল, নয়নদ্বয় আরক্ত হইল। কিন্তু তিনি সে উদ্বেগ সংযম করিলেন, শিবজীর দিকে একবার চাহিয়া মৃত্তিকা পর্য্যন্ত শির নামাইয়া নিঃশব্দে দুর্গ হইতে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়তর হইয়া জগৎ আবৃত করিতেছে, এক-জন পথিক একাকী নিঃশব্দে পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রান্তরাভি-মুখে গমন করিলেন। প্রান্তর পার হইলেন, একটি গ্রামে উপস্থিত হইলেন, সেটি পার হইয়া আর একটি প্রান্তরে আসিলেন। অন্ধকার গভীরতর হইল, রহিয়া রহিয়া নৈশ বায়ু বহিয়া যাইতেছে, তাহার পর আর কেহ সে পথিককে দেখিতে পাইল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

চন্দ্ররাও জুমলাদার

আমা হইতে অন্য যদি কেহ
অধিক গৌরব ধরে, দহে যেন দেহ,
হৃদি জ্বলে হলাহল।———

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চন্দ্ররাও জুমলাদারের সহিত আমাদের এই প্রথম পরিচয়, তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি, অসাধারণ বীর্য্য, অসাধারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। তাঁহার বয়স রঘুনাথ অপেক্ষা ৫।৬ বৎসর অধিক মাত্র, কিন্তু দূর হইতে দেখিলে সহসা তাঁহাকে ৪০ বৎসরের লোক বলিয়া বোধ হয়। প্রশস্ত ললাটে এই বয়সেই দুই একটি চিন্তার গভীর রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে, মস্তকের কেশ দুই একটি শুক্ল। নয়ন ক্ষুদ্র ও অতিশয় উজ্জ্বল। চন্দ্ররাওকে যাঁহারা বিশেষ করিয়া জানিতেন, তাঁহারা বলিতেন যে, চন্দ্ররাওয়ের তেজ ও সাহস যেরূপ দুর্দ্দমনীয়, গভীর দূরদর্শিনী চিন্তা এবং ভীষণ অনিবার্য্য স্থিরপ্রতিজ্ঞাও সেইরূপ। সমস্ত মুখমণ্ডলে এই দুইটি ভাব বিশেষরূপে ব্যক্ত হইত। দেহ যেন লৌহনির্ম্মিত, যাঁহারা চন্দ্ররাওয়ের অসীম পরাক্রম, বিজাতীয় ক্রোধ, গভীর বুদ্ধি ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বিষয় জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা কখনই সে অল্পভাষী স্থিরপ্রতিজ্ঞ জুমলাদারের সহিত বিবাদ করিতেন না। এ সমস্ত

ভিন্ন চন্দ্ররাওয়ের আর একটি গুণ বা দোষ ছিল, তাহা কেহই বিশেষরূপে জানিত না। বিজাতীয় উচ্চাভিলাষে তাঁহার হৃদয় দিবারাত্র জ্বলিত। অসাধারণ বুদ্ধিসঞ্চালনে তিনি আত্মোন্নতির পথ আবিষ্কার করিতেন, অতুল দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত সেই পথ অবলম্বন করিতেন, খড়্গহস্তে সেই পথ পরিষ্কার করিতেন। শত্রু হউক, মিত্র হউক, দোষী হউক, নির্দ্দোষী হউক, অপকারী হউক বা পরম উপকারী হউক, সে পথের সম্মুখে যিনি পড়িতেন, উচ্চাভিলাষী চন্দ্ররাও নিঃসঙ্কোচে পতঙ্গবৎ তাঁহাকে পদদলিত করিয়া নিজ পথ পরিষ্কার করিতেন। অদ্য বালক রঘুনাথ ঘটনাবশতঃ সেই পথের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন, তাঁহাকে পতঙ্গবৎ দলিত করিয়া জুমলাদার পথ পরিষ্কার করিলেন। এরূপ অসাধারণ পুরুষের পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানা আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথের বংশবৃত্তান্তও কিছু কিছু জানিতে পারিব।

চন্দ্ররাও তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেন না। রাজা যশোবন্ত সিংহের একজন প্রধান সেনানী গজপতিসিংহ চন্দ্ররাওকে বাল্যকালে লালনপালন করিয়াছিলেন। অনাথ বালক গজপতির গৃহের কার্য্য করিত, গজপতির পুত্রকন্যাকে যত্ন করিত, অথবা গজপতির সহিত যুদ্ধে যুদ্ধে ফিরিত।

যখন চন্দ্ররাওয়ের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষমাত্র, তখন গজপতি তাঁহার গভীর চিন্তা, দুর্দ্দমনীয় তেজ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, নিজপুত্র রঘুনাথের ন্যায় চন্দ্ররাওকে ভালবাসিতেন ও এই কোমল বয়সেই আপন অধীনে সৈনিককার্য্যে নিযুক্ত করেন।

সৈনিকের ব্রত ধারণ করিয়া অবধিই চন্দ্ররাও দিন দিন যে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া প্রাচীন যোদ্ধাগণও বিস্মিত

হইত। যুদ্ধে যে স্থানে অতিশয় বিপদ,—যে স্থানে শত্রু ও মিত্রের শব রাশীকৃত হইতেছে, যে স্থানে ধূলি ও ধূমে গগন আচ্ছাদিত হইতেছে, যে স্থানে বিজেতার হুঙ্কারে ও আর্ত্তের আর্ত্তনাদে কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে, তথায় অন্বেষণ কর, পঞ্চদশ বর্ষের অল্পভাষী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালককে তথায় পাইবে। যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে যে স্থানে যুদ্ধজয়ী সেনাগণ একত্র হইয়া রজনীতে গীত-বাদ্য করিতেছে, হাস্য ও আমোদ করিতেছে, চন্দ্ররাও তথায় নাই। অল্পভাষী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালক শিবিরে অন্ধকারে একাকী বসিয়া রহিয়াছে, অথবা কুঞ্চিত ললাটে প্রান্তরে বা নদীতীরে একাকী সায়ংকালে পদচারণ করিতেছে। চন্দ্ররাওয়ের উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সাধিত হইল, তিনি এক্ষণে অজ্ঞাত রাজপুত-শিশু নহেন। তাঁহার পদবৃদ্ধি হইয়াছে, গজপতিসিংহের অধীনস্থ সমস্ত সেনার মধ্যে চন্দ্ররাও এক্ষণে একজন অসাধারণ তেজস্বী বীর বলিয়া পরিচিত। মর্য্যাদাবৃদ্ধির সহিত চন্দ্ররাওয়ের উচ্চাভিলাষ ও গর্ব্ব অধিকতর বৃদ্ধি পাইল।

একদিন একটি যুদ্ধে চন্দ্ররাও গজপতিকে পরম বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। গজপতি যুদ্ধের পর চন্দ্ররাওকে নিকটে ডাকিয়া সকলের সম্মুখে যথোচিত সম্মান করিয়া বলিলেন,—চন্দ্ররাও! অদ্য তোমার সাহসেই আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে; ইহার পুরস্কার তোমাকে কি দিতে পারি?

চন্দ্ররাও মুখ অবনত করিয়া বিনীতভাবে রহিলেন।

গজপতি সস্নেহে বলিলেন,—মনে ভাবিয়া দেখ, যাহা ইচ্ছা হয়, প্রকাশ করিয়া বল। অর্থ, ক্ষমতা, পদবৃদ্ধি, চন্দ্ররাও! তোমাকে কিছুই অদেয় নাই।

তখন চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে নয়ন উঠাইয়া বলিলেন,—রাজপুত বীর কখনও অঙ্গীকার অন্যথা করেন না, জগতে বিদিত আছে। বীরশ্রেষ্ঠ, আপনার কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে আমার সহিত বিবাহ দিন।

সভাস্থ সকলে নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ। গজপতির মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, ক্রোধে তাঁহার শরীর কম্পিত হইল, কোষ হইতে অসি অর্দ্ধেক নিষ্কাষিত হইল। কিন্তু সেই ক্রোধ কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া গজপতি উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন,—অঙ্গীকারপালনে স্বীকৃত আছি, কিন্তু তোমার মহারাষ্ট্রদেশে জন্ম, রাজপুতদুহিতাদিগের মহারাষ্ট্রীয় দস্যুর সহিত পর্ব্বতকন্দর ও জঙ্গলমধ্যে থাকিবার অভ্যাস নাই। অগ্রে লক্ষ্মীর উপযুক্ত বাসস্থান নির্ম্মাণ কর, জঙ্গলকুটীরের পরিবর্ত্তে দুর্গ প্রস্তুত কর, দস্যুর পরিবর্ত্তে যোদ্ধার নাম গ্রহণ কর, তৎপরে রাজপুত-দুহিতার বিবাহ কামনা জানাইও। এখন অন্য কোন যাচ্ঞা আছে?

চন্দ্ররাও ধীরে ধীরে বলিলেন,—অন্য কোন যাচ্ঞা এক্ষণে নাই, যখন থাকিবে, প্রভুকে জানাইব।

সভা ভঙ্গ হইল, সকলে নিজ নিজ শিবিরে গমন করিল, উদারচেতা গজপতি চন্দ্ররাওয়ের প্রতি ক্রোধ অচিরাৎ বিস্মৃত হইলেন, সেই দিনকার কথা শীঘ্র বিস্মৃত হইলেন। চন্দ্ররাও সে কথা বিস্মৃত হইলেন না, সেই দিন সন্ধ্যার সময় ধীরে ধীরে আপন শিবিরে পদচারণ করিতে লাগিলেন। শিবির অন্ধকার, কিন্তু তাহা অপেক্ষা দুর্ভেদ্য অন্ধকার চন্দ্ররাওয়ের হৃদয় ও ললাটে বিরাজ করিতেছে।

দুই দণ্ডের পর চন্দ্ররাও একটি দীপ জ্বালিলেন, একখানি পুস্তকে সযত্নে কি কি লিখিলেন। পুস্তকখানি বন্ধ করিলেন, আবার খুলিলেন, আবার দেখিলেন, আবার বন্ধ করিলেন। ঈষৎ বিকট হাস্য মুখমণ্ডলে দেখা গেল। তাঁহার একজন বন্ধু ইতিমধ্যে শিবিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—চন্দ্র! কি লিখিতেছ? চন্দ্ররাও সহজ অবিচলিত স্বরে বলিলেন,—কিছু নহে, হিসাব লিখিয়া রাখিতেছি, আমি কাহার নিকট কি ধারি, তাহাই লিখিতেছি।

বন্ধু চলিয়া গেল, চন্দ্ররাও পুনরায় পুস্তকখানি খুলিলেন। সেটি যথার্থই হিসাবের পুস্তক, চন্দ্ররাও একটি ঋণের কথাই লিখিয়াছিলেন। পুনরায় পুস্তক বন্ধ করিয়া দীপ নির্ব্বাণ করিলেন।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে আরংজীবের সহিত যশোবন্তের উজ্জয়িনী সন্নিধানে মহাযুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে গজপতিসিংহ হত হয়েন, "মাধবীকঙ্কণ" নামক উপন্যাসের পাঠক তাহা অবগত আছেন।

গজপতির অনাথ বালক ও বালিকা মাড়ওয়ার হইতে পুনরায় মেওয়ার প্রদেশে সূর্য্যমহল নামক দুর্গে যাইতেছিল। রঘুনাথের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ, লক্ষ্মীর নয় বৎসর মাত্র, সঙ্গে কেবল একমাত্র পুরাতন ভৃত্য। পথিমধ্যে একদল দস্যু সেই ভৃত্যকে হত্যা করিয়া বালক-বালিকাকে মহারাষ্ট্রদেশে লইয়া যাইল। বালক অল্পবয়সেই তেজস্বী, রজনীযোগে দস্যুদিগের শিবির হইতে পলায়ন করিল, বালিকাকে দস্যুপতি বলপূর্ব্বক বিবাহ করিলেন। তিনি চন্দ্ররাও!

তীক্ষ্ণবুদ্ধি চন্দ্ররাওয়ের মনোরথ কতক পরিমাণে পূর্ণ হইল। গজপতির সংসার হইতে কিছু অর্থ আনিয়াছিলেন, বিস্তীর্ণ জায়গীর কিনিলেন, মহারাষ্ট্রদেশে একজন সমাদৃত সম্ভ্রান্ত লোক হইলেন। চন্দ্ররাওয়ের বংশ এক পুরাতন রাজপুতবংশ হইতে উদ্ভূত, এ কথা কেহ বিশ্বাস করিল না, তিনি প্রসিদ্ধনামা রাজপুত গজপতিসিংহের একমাত্র দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছেন, সকলে দেখিতে পাইল। তাঁহার সাহস ও বিক্রম দেখিয়া শিবজী তাঁহাকে জুমলাদারের পদ দিলেন, তাঁহার বিপুল অর্থ ও জায়গীর দেখিয়া সকলে তাঁহার সমাদর করিলেন। দিনে দিনে চন্দ্ররাওয়ের যশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এমন সময় কুক্ষণে বালক রঘুনাথ তাঁহার উন্নতির পথে আসিয়া পড়িল। জুমলাদার অচিরে পথ পরিষ্কার করিয়া লইলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

লক্ষ্মীবাই

স্বামী বনিতার পতি, স্বামী বনিতার গতি,
স্বামী বনিতার যে বিধাতা।
স্বামী বনিতার ধন, স্বামী বিনা অন্য জন,
কেহ নহে সুখ-মোক্ষদাতা।

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় রঘুনাথ দস্যুবেশী চন্দ্ররাও দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রাজস্থান হইতে মহারাষ্ট্রদেশে নীত হইয়াছিলেন। একদিন রজনীযোগে তিনি পলায়ন করেন, পর্ব্বতকন্দরে, বনমধ্যে, প্রান্তরে বা গৃহস্থের বাটীতে কয়েক দিন লুক্কায়িত থাকেন, সুন্দর অনাথ অল্পবয়স্ক বালককে দেখিয়া কেহই মুষ্টিভিক্ষা দিতে পরাঙ্মুখ হইত না।

তাহার পর পাঁচ ছয় বৎসর রঘুনাথ নানা স্থানে নানা কষ্টে অতিবাহিত করিল। সংসারস্বরূপ অনন্ত সাগরে অনাথ বালক একাকী ভাসিতে লাগিল। নানা দেশে পর্য্যটন করিল, নানা লোকের নিকট ভিক্ষা বা দাসত্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিল। পূর্ব্বগৌরবের কথা, পিতার বীরত্ব ও সম্মানের কথা বালকের মনে সর্ব্বদাই জাগরিত হইত, কিন্তু অভিমানী বালক সে কথা, সে দুঃখ কাহাকেও বলিত না। কখন কখন দুঃখভার সহ্য করিতে না পারিলে নিঃশব্দে

প্রান্তরে বা পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি উপবেশন করিয়া একাকী প্রাণ ভরিয়া রোদন করিত, পুনরায় চক্ষের জল মোচন করিয়া স্বকার্য্যে যাইত।

বয়োবৃদ্ধির সহিত বংশোচিত ভাব হৃদয়ে যেন আপনিই জাগরিত হইতে লাগিল। অল্পবয়স্ক ভৃত্য গোপনে কখন কখন প্রভুর শিরস্ত্রাণ মস্তকে ধারণ করিত, প্রভুর অসি কোষে ঝুলাইত! সন্ধ্যার সময় প্রান্তরে বসিয়া দেশীয় চারণদিগের গান উচ্চৈঃস্বরে গাইত, নৈশ পথিকেরা পর্ব্বতগুহায় সংগ্রামসিংহ বা প্রতাপের গীত শুনিয়া চমকিত হইত। যখন অষ্টাদশ বৎসর বয়স, তখন রঘুনাথ শিবজীর কীর্ত্তি, শিবজীর উদ্দেশ্য, শিবজীর বীর্য্যের কথা চিন্তা করিতেন। রাজস্থানের ন্যায় মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীন হইবে, শিবজী দক্ষিণদেশে হিন্দুরাজ্য বিস্তার করিবেন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বালকের হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইল, তিনি শিবজীর নিকট যাইয়া একটি সামান্য সেনার কার্য্য প্রার্থনা করিলেন।

শিবজী লোক চিনিতে অদ্বিতীয়, কয়েক দিনের মধ্যে রঘুনাথকে চিনিলেন, একটি হাবিলদারী পদে নিযুক্ত করিলেন, ও তাহার কয়েক দিবস পরেই তোরণদুর্গে পাঠাইলেন। পথে রঘুনাথের সহিত আমা-দিগের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার প্রকৃত নাম রঘুনাথ সিংহ; কিন্তু মহারাষ্ট্রদেশে হাবিলদারী কার্য্য পাওয়া অবধি সকলে তাঁহাকে রঘুনাথজী হাবিলদার বলিয়া ডাকিত।

রঘুনাথ হাবিলদারী পদ পাইয়াছিলেন বলা হইয়াছে। রঘুনাথের শিবজীর নিকট আগমনের সময় চন্দ্ররাও জুমলাদারের অধীনে এক-জন হাবিলদারের মৃত্যু হয়, তাহারই পদ রঘুনাথ প্রাপ্ত হন। রঘুনাথ চন্দ্ররাওকে পিতার পুরাতন ভৃত্য ও আপনার বাল্যসুহৃৎ বলিয়া চিনিলেন, তাঁহাকে দস্যু বা ভগিনীপতি বলিয়া জানিতেন না, সুতরাং

তিনি সানন্দে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে যাইলেন। চন্দ্ররাও রঘুনাথকে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু অল্পভাষী জুমলাদারের ললাট অদ্য পুনরায় কুঞ্চিত হইল।

দিনে দিনে রঘুনাথজীর সাহস ও বিক্রমের যশ অধিক বিস্তার হইতে লাগিল, চন্দ্ররাওয়ের চিন্তা গভীরতর হইল। চন্দ্ররাওয়ের স্থিরপ্রতিজ্ঞা কখনও বিচলিত হইত না, গভীর মন্ত্রণা কখনও ব্যর্থ হইত না। অদ্য রঘুনাথজী দৈবযোগে প্রাণে রক্ষা পাইলেন, কল্য বিদ্রোহী কপটাচারী বলিয়া শিবজীর কার্য্য হইতে দূরীভূত হইলেন।

চন্দ্ররাওও শিবজীর নিকট কয়েক দিনের বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটী যাইলেন। পাঠক! চল, আমরাও একবার বড়লোকের বাটী সভয়ে প্রবেশ করি।

জুমলাদার বাটী আসিলে, বহির্দ্বারে নহবৎ বাজিতে লাগিল, অসংখ্য দাসদাসী প্রভুর সম্মুখে আসিল, অনেক প্রতিবেশী সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, অচিরে চন্দ্ররাওয়ের আগমনবার্ত্তা সমগ্র দেশে রাষ্ট্র হইল। জুমলাদারের বাটীর অন্তঃপুরে ধূমধাম পড়িয়া গেল, সেই ধূমধামের মধ্যে শান্তনয়না ক্ষীণাঙ্গী লক্ষ্মীবাই নীরবে স্বামীর অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মীবাই যথার্থ লক্ষ্মীস্বরূপা, শান্ত, ধীর, বুদ্ধিমতী, পতিব্রতা। বাল্যকালে পিতার আদরের কন্যা ছিলেন, কিন্তু কোমল-বয়সে বিদেশে অপরিচিত লোকের মধ্যে অল্পভাষী কঠোরস্বভাব স্বামীর হস্তে পড়িলেন, বৃক্ষ হইতে উৎপাটিত কোমলপুষ্পের ন্যায় দিন দিন শুষ্ক হইতে লাগিলেন। নয় বৎসরের বালিকার জীবন শোকাচ্ছন্ন হইল, কিন্তু সে শোক কাহাকে জানাইবে? কে দুটা কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিবে?

বালিকা পূর্ব্বকথা স্মরণ করিত, পিতার কথা স্মরণ করিত, প্রাণের সহোদরের কথা স্মরণ করিত, আর গোপনে অশ্রুবর্ষণ করিত।

শোকে পড়িলে, কষ্টে পড়িলে, আমাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, আমাদের হৃদয় ও মন সহিষ্ণু হয়। বালিকা দুই এক বৎসরের মধ্যেই সংসারের কার্য্য করিতে লাগিলেন, স্বামীর সেবায় রত হইলেন। হিন্দু-রমণীর পতি ভিন্ন আর কি গতি আছে? স্বামী যদি সহৃদয় ও সদয় হন, নারী আনন্দে ভাসিয়া তাঁহার সেবা করেন, স্বামী নির্দ্দয় ও বিমুখ হইলেও নারীর পতিসেবা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? কিন্তু যদিও চন্দ্ররাওয়ের হৃদয়ে অভিমান, জিঘাংসা ও উচ্চাভিলাষ বিরাজ করিত, তথাপি তিনি অসহায় নারীর প্রতি নির্দ্দয় ছিলেন না। নম্রমুখী, নম্র-হৃদয়া লক্ষ্মীবাইয়ের পরিচর্য্যায় চন্দ্ররাও তুষ্ট হইতেন; যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হইলে পতিপরায়ণা লক্ষ্মীবাইয়ের নিকটে আসিয়া শান্তিলাভ করিতেন; লক্ষ্মীবাইয়ের স্নিগ্ধ রূপ দেখিয়া ও স্নিগ্ধ কথাগুলি শুনিয়া তাঁহাকে সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিতেন। লক্ষ্মীবাই তখন জগতের মধ্যে আপ-নাকে ভাগ্যবতী মনে করিতেন, স্বামীর সামান্য যত্নে তিনি পুলকিত হইতেন, স্বামীর একটি মিষ্ট কথায় তাঁহার হৃদয় প্লাবিত হইত। যে পুষ্পচারাটিকে উদ্যান হইতে আনিয়া গৃহমধ্যে অন্ধকারে রাখা যায়, সে চারাটি গৃহমধ্যস্থ একটি আলোকরেখার দিকে কত পুলকের সহিত ধায়!

এইরূপে সংসারকার্য্য ও পতিসেবায় এক বৎসরের পর আর এক বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল, ধীর শান্ত লক্ষ্মী যৌবন প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু সে যৌবন কি শান্ত, নিরুদ্বেগ! লক্ষ্মী পূর্ব্বের কথা প্রায় ভুলিয়া গেলেন, অথবা যদি সায়ংকালে কখন রাজস্থানের কথা মনে উদয় হইত, বাল্যকালের সুখ, বাল্যকালের ক্রীড়া ও প্রাণের ভ্রাতা রঘুনাথের কথা মনে হইত, যদি নিঃশব্দে দুই এক বিন্দু অশ্রু সেই সুন্দর রক্তশূন্য গণ্ডস্থল

দিয়া গড়াইয়া যাইত, লক্ষ্মী সে অশ্রুবিন্দু মোচন করিয়া পুনরায় গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন।

অদ্য চন্দ্ররাও আহারে বসিয়াছেন, লক্ষ্মীবাই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যজন করিতেছেন। লক্ষ্মীবাইয়ের বয়ঃক্রম এক্ষণে সপ্তদশ বর্ষ। অবয়ব কোমল, উজ্জ্বল ও লাবণ্যময়, কিন্তু ঈষৎ ক্ষীণ। ভ্রূযুগল কি সুন্দর ও সুচিক্কণ, যেন সেই পরিষ্কার শান্ত ললাটে তুলি দ্বারা অঙ্কিত। শান্ত, কোমল, কৃষ্ণ নয়ন দুটিতে যেন চিন্তা আপনার আবাসস্থান করিয়াছে। গণ্ডস্থল সুন্দর, সুচিক্কণ, কিন্তু ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ; সমস্ত শরীর শান্ত ও ক্ষীণ। যৌবনের অপরূপ সৌন্দর্য্য বিকশিত রহিয়াছে, কিন্তু যৌবনের প্রফুল্লতা, উন্মত্ততা কৈ? আহা! রাজস্থানের এই অপূর্ব্ব পুষ্পটি মহারাষ্ট্রে সৌন্দর্য্য ও সুঘ্রাণ বিতরণ করিতেছে, কিন্তু জীবনাভাবে ঈষৎ শুষ্ক। লক্ষ্মীবাইয়ের চারু নয়ন, সুদীর্ঘ কেশভার, কোমল বাহুদ্বয় ও কোমল দেহলতায় মুক্তার লাবণ্য আছে, কিন্তু হীরকের উজ্জ্বল কিরণ নাই।

একদিন চন্দ্ররাও লক্ষ্মীকে জানাইয়াছিলেন যে, তোমার ভ্রাতা আমার অধীনে হাবিলদার হইয়াছে ও যশোলাভ করিয়াছে। কথাটি সাঙ্গ হইলে চন্দ্ররাওয়ের ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া লক্ষ্মীর মনে সন্দেহ হইয়াছিল।

আর একদিন স্বামীর দুই একটি মিষ্টবাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া লক্ষ্মী স্বামীর পদযুগলের নিকট বসিয়া বলিলেন,—দাসীর একটি নিবেদন আছে, কিন্তু বলিতে ভয় করে।

চন্দ্ররাও শয়ন করিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিলেন, নম্রমুখীকে সস্নেহে চুম্বন করিয়া বলিলেন,—কি, বল না, তোমার নিকট আমার অদেয় কি আছে?

লক্ষ্মী বলিলেন,—আমার ভ্রাতা বালক, অজ্ঞান।

চন্দ্ররাওয়ের মুখ গম্ভীর হইল।

লক্ষ্মী। সে আপনার ভৃত্য, আপনারই অধীন।

চন্দ্ররাও। না. সে আমা অপেক্ষাও সাহসী বলিয়া পরিচিত।

বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিতে পারিলেন, তিনি যাহা ভয় করিতেছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে। চন্দ্ররাও রঘুনাথের উপর যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ! ভয়ে কম্পিত হইয়া বলিলেন,—বালক যদিও দোষ করে, আপনি না মার্জ্জনা করিলে কে করিবে?

চন্দ্ররাওয়ের ললাটে আবার সেই মেঘচ্ছায়া দেখা গেল। লক্ষ্মী স্বামীকে জানিতেন, সে কথা আর উল্লেখ করিলেন না।

তাহার পর চন্দ্ররাও অদ্য প্রথমে বাটী আসিয়াছেন। রঘুনাথের যাহা ঘটিয়াছে, লক্ষ্মী তাহা জানেন না, কিন্তু তাঁহার হৃদয় চিন্তাকুল। তিনি মুখ ফুটিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, রজনীতে স্বামী নিদ্রিত হইলে ভৃত্যদিগের নিকট ভ্রাতার সংবাদ লইবেন, মনে স্থির করিয়াছিলেন।

চন্দ্ররাওয়ের আহার সমাপ্ত হইল, তিনি শয়নাগারে যাইলেন. লক্ষ্মী তাম্বুল হস্তে তথায় যাইলেন। দেখিলেন, স্বামীর ললাট চিন্তাযুক্ত। লক্ষ্মী তাম্বুল দিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহিরে যাইলেন, চন্দ্ররাও সতর্কভাবে দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

ধীরে ধীরে একটি গুপ্তস্থান হইতে চন্দ্ররাও একটি বাক্স বাহির করিলেন, সেটি খুলিলেন, একখানি পুস্তক বাহির করিলেন, দেখিতে হিসাবের পুস্তক। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে গজপতি কর্তৃক যে দিন সভায় অবমানিত হইয়াছিলেন, সে দিন সেই পুস্তকে একটি ঋণের

কথা লিখিয়াছিলেন, সেই পাতা খুলিলেন, সুন্দর স্পষ্ট হস্তাক্ষর সেইরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে ,—

"মহাজন ··· ··· গজপতি ;

ঋণ ··· ··· অবমাননা ;

পরিশোধ ··· ··· তাঁহার শোণিতে, তাঁহার বংশের অবমাননায়।"

একবার, দুইবার, এই অক্ষরগুলি পড়িলেন, ঈষৎ হাস্য সেই বিকট মুখমণ্ডলে দেখা দিল, সেই স্থানে লিখিলেন,—"অদ্য পরিশোধ হইল।" তারিখ দিয়া পুস্তক বন্ধ করিলেন।

দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া লক্ষ্মীকে ডাকিলেন, লক্ষ্মী ভক্তিভাবে স্বামীর নিকট আসিলেন। চন্দ্ররাও লক্ষ্মীর হস্তধারণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—অনেক দিনের একটি ঋণ অদ্য পরিশোধ করিয়াছি।

লক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ঈশানী-মন্দিরে

হেরিলা অদূরে
সরোবর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল।

মধুসূদন দত্ত।

পরাক্রান্ত জায়গীরদার ও জুমলাদার চন্দ্ররাওয়ের বাটী হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে ঈশানীর একটি মন্দির ছিল। অনতিউচ্চ একটি পর্ব্বতশৃঙ্গে সেই মন্দির অতি প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দির-সম্মুখে প্রস্তররাশি সোপানরূপে ক্ষোদিত ছিল, নীচে একটি পর্ব্বত-তরঙ্গিণী কুল্ কুল্ শব্দ করিয়া সেই সোপানের পদ প্রক্ষালন করিয়া বহিয়া যাইত। পুরাকাল হইতে অসংখ্য যাত্রী ও উপাসক এই পুণ্য-জলে স্নাত হইয়া সোপানারোহণপূর্ব্বক ঈশানীর পূজা দিত, অদ্য' পর্য্যন্ত মন্দিরের গৌরব বা যাত্রিসংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। মন্দিরের পশ্চাতে পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশ বহু পুরাতন বৃক্ষ দ্বারা আবৃত, চূড়া হইতে নীচে সমতলভূমি পর্য্যন্ত সেই বৃক্ষশ্রেণী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না। দিবাভাগেও, সেই বিশাল বৃক্ষশ্রেণী ঈষৎ অন্ধকার করিত, সেই সুস্নিগ্ধ ছায়াতে ঈশানী-মন্দিরের পূজক ও ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ কুটীরে বাস করিত। সেই পুণ্যময় সুস্নিগ্ধ স্থান দেখিলেই বোধ হয় যেন,

তথায় শান্তিরস ভিন্ন অন্য কোন ভাবের উদ্রেক হয় নাই, ভারতবর্ষের পবিত্র পুরাণকথা বা বেদমন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শব্দ সেই পুরাতন পাদপবৃন্দ শ্রবণ করে নাই। বহু যুদ্ধ ও আহবে মহারাষ্ট্রদেশ ব্যতিব্যস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইতেছিল, কিন্তু হিন্দু কি মুসলমান কেহই এ ক্ষুদ্র প্রশান্ত পর্ব্বতমন্দির বিগ্রহের রবে কলুষিত করে নাই।

রজনী এক প্রহরের সময় একজন পথিক একাকী সেই শান্ত কাননের মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। পথিকের হৃদয় উদ্বেগপরিপূর্ণ, প্রশস্ত ললাট কুঞ্চিত, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, নয়ন হইতে উন্মত্ততার অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল। রোষে, জিঘাংসায়, বিষাদে অন্ত রঘুনাথের হৃদয় একেবারে দগ্ধ হইতেছিল।

অনেকক্ষণ পদচারণ করিতে লাগিলেন, শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়াছে, তথাপি হৃদয়ের উদ্বেগ নিবারণ হয় না। রঘুনাথ উন্মত্তপ্রায়! এ ভীষণ চিন্তার আশু উপশম না হইলে রঘুনাথের বিবেচনাশক্তি বিচলিত বা লুপ্ত হইবে। প্রকৃতি ভীষণ চিকিৎসক! এই বিষম সংসারে শেলসম যে দুঃখ হৃদয় বিদীর্ণ করে, অগ্নিসম যে চিন্তা শরীর শোষণ ও দাহ করে, যে মানসিক রোগের ঔষধ নাই, চিকিৎসা নাই, প্রকৃতি চিন্তাশক্তি লোপ করিয়া তাহার উপশম করে। উন্মত্ততাই কত শত হতভাগার আরোগ্য! কত সহস্র হতভাগা এই আরোগ্য দিবানিশি প্রার্থনা করে, কিন্তু প্রাপ্ত হয় না।

সেই পাদপের অনতিদূরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ পুরাণ পাঠ করিতেছিলেন। আহা! সেই সঙ্গীতপূর্ণ পুণ্যকথা যেন শান্ত নিশীথে, শান্ত কাননে অমৃত বর্ষণ করিতেছিল, নক্ষত্র-বিভূষিত নৈশ গগনমণ্ডলে ধীরে ধীরে উত্থিত হইতেছিল। সেই পুণ্যকথা শান্ত নৈশ কাননে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, অচেতন পাদপকেও যেন সচেতন করিতে

লাগিল। শাখাপত্র যেন সেই গীত কুতূহলে পান করিতে লাগিল, বায়ু সেই গীত বিস্তার করিতে লাগিল, মানব-হৃদয় শান্তিরসে বিগলিত হইতে লাগিল।

কত সহস্র বৎসর হইতে এই পুণ্যকথা ভারতবর্ষে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে! সুন্দর বঙ্গদেশে, তুষারপূর্ণ পর্ব্বতবেষ্টিত কাশ্মীরে, বীরপ্রসূ রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রভূমিতে, সাগর-প্রক্ষালিত কর্ণাট ও দ্রাবিড়ে, কত সহস্র বৎসর অবধি এই গীত ধ্বনিত হইতেছে! যেন চিরকালই এই গীত ধ্বনিত হয়, আমরা যেন এ শিক্ষা কখনই বিস্মৃত না হই। গৌরবের দিনে এই অনন্ত গীত আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল, হস্তিনা, অযোধ্যা, মিথিলা, কাশী, মগধ, উজ্জয়িনী প্রভৃতি দেশ বীরত্বে ও যশে প্লাবিত করিয়াছিল। দুর্দ্দিনে এই গীত গাইয়া সমরসিংহ, সংগ্রামসিংহ, প্রতাপসিংহ ধর্ম্মরক্ষার্থ হৃদয়ের শোণিত দিয়াছিলেন, এই মহামন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া শিবজী পুনরায় পুরাকালের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। অদ্য ক্ষীণ দুর্ব্বল হিন্দুদিগের আশ্বাসের স্থল এই পূর্ব্বগীতমাত্র, যেন বিপদে, বিষাদে, দুর্ব্বলতায় আমরা পূর্ব্বকথা বিস্মৃত না হই, যতদিন জাতীয় জীবন থাকে, যেন হৃদয়সমূহ এই গীতের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হইতে থাকে।

নব্য পাঠক! তুমি ইলিয়দ ও ইনিয়দ পাঠ করিয়াছ, দান্তে ও সেক্সপীয়র, গেটে ও হিউগো পাঠ করিয়াছ, সাদী ও ফরদুসী পাঠ করিয়াছ, কিন্তু হৃদয় অন্বেষণ কর, হৃদয়ের অন্তরে কোন্ কথাগুলি সরসভাবপূর্ণ বোধ হয়? হৃদয় কোন্ কথায় অধিকতর আলোড়িত, প্রোৎসাহিত বা মুগ্ধ হয়? ভীষ্মাচার্য্যের অপূর্ব্ব বীরত্বকথা! দুঃখিনী সীতার অপূর্ব্ব পতিব্রতা-কথা! এই কথা হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়ের

স্তরে স্তরে গ্রথিত রহিয়াছে, এ কথা যেন হিন্দুজাতি কখনও বিস্মৃত না হয়।

পাঠক! একত্র বসিয়া এক একবার দেশীয় গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক ও প্রাচীন সময়ের বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশে লেখনী ধারণ করিয়াছি। যদি সেই সমস্ত কথা স্মরণ করাইতে সক্ষম হইয়া থাকি, তবেই যত্ন সফল হইয়াছে, নচেৎ আমার পুস্তকগুলি দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে না।

শান্তকাননে পবিত্র পুরাণকথা ও সঙ্গীত রঘুনাথের উত্তপ্ত ললাটে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল, উদ্বিগ্ন হৃদয়ে শান্তি সেচন করিতে লাগিল। হতভাগার উন্মত্ততা ক্রমে হ্রাস পাইল, সেই মহৎকথার নিকট আপনার শোক ও দুঃখ কি অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল! আপনার মহৎ উদ্দেশ্য ও বীরত্ব কি ক্ষুদ্র বোধ হইল! ক্রমে চিন্তাহারিণী নিদ্রা রঘুনাথকে অঙ্কে গ্রহণ করিলেন। রঘুনাথের শ্রান্ত অবসন্ন শরীর সেই বৃক্ষমূলে শায়িত হইল।

রঘুনাথ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন! আজি কিসের স্বপ্ন? আজি কি গৌরবের স্বপ্ন দেখিতেছেন? দিন দিন পদোন্নতি, দিন দিন যশো-বিস্তারের স্বপ্ন দেখিতেছেন? হায়! রঘুনাথের জীবনের সে স্বপ্ন ভগ্ন হইয়াছে, সে চিন্তা শেষ হইয়াছে, মরীচিকাপূর্ণ সংসারের সেই মরীচিকা বিলুপ্ত হইয়াছে।

রঘুনাথ কি যুদ্ধক্ষেত্রের স্বপ্ন দেখিতেছেন? শত্রুকে বিনাশ করিতে-ছেন? দুর্গ জয় করিতেছেন? যোদ্ধার কার্য্য করিতেছেন? রঘুনাথের সে উদ্যম শেষ হইয়াছে, সে স্বপ্নও বিলুপ্ত হইয়াছে।

একে একে যৌবনের উদ্যমগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে, আশাপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে, এই অন্ধকার রজনীতে শ্রান্ত বন্ধুহীন যুবকের হৃদয়ে বহুদিনের

কথা পূর্ব্বজীবনের স্মৃতির ন্যায় জাগরিত হইতেছে। শোকভারে হৃদয় আক্রান্ত হইলে, আশা ও সুখ আমাদের নিকট বিদায় লইলে, বন্ধুহীন জনের যে কথা স্মরণ হয়, রঘুনাথ সেই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। স্নেহময়ী মাতার স্নেহসিক্ত মুখখানি মনে জাগরিত হইল, পিতার দীর্ঘ অবয়ব ও প্রশস্ত ললাট মনে হইল, বাল্যকালে সেই দুর সূর্য্যমহলে ক্রীড়া করিতেন, হাস্যধ্বনিতে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেন, সেই কথা স্মরণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকালের সহচরী, শান্ত, ধীর প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মীকে মনে পড়িল। আহা! সে স্নেহময়ী ভগিনীকে কি আর জীবনে দেখিতে পাইবেন? আজি সে সোণার সংসার কোথায়, সে প্রফুল্ল সুখের জগৎ কোথায়, সে হৃদয়ের সহোদরা কোথায়? নিদ্রিতের মুদিত নয়ন হইতে এক বিন্দু অশ্রু ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল।

নিদ্রিত রঘুনাথ সেই স্নেহময়ীর মুখখানি চিন্তা করিতে করিতে নয়ন উন্মীলিত করিলেন। কি দেখিলেন? বোধ হইল যেন, লক্ষ্মী স্বয়ং ভ্রাতার শিরোদেশ আপন অঙ্কে স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, কোমল শীতল হস্ত ভ্রাতার উষ্ণ ললাটে স্থাপন করিয়া হৃদয়ের উদ্বেগ দূর করিতেছেন, সহোদরা স্নেহপূর্ণনয়নে যেন সহোদরের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। আহা! বোধ হইল; যেন শোকে বা চিন্তায় লক্ষ্মীর প্রফুল্ল মুখখানি ঈষৎ শুষ্ক হইয়াছে, নয়ন দুইটি সেইরূপ স্থির, প্রশস্ত, স্নিগ্ধ, কিন্তু চিন্তার আবাসস্থান।

রঘুনাথ নয়ন মুদিত করিলেন, আর এক বিন্দু অশ্রুবর্ষণ করিলেন, বলিলেন,—ভগবান্, অনেক সহ্য করিয়াছি, কেন বৃথা আশায় হৃদয় ব্যথিত করিতেছ? আমি যেন উন্মত্ত না হই।

যেন কোমল হস্তে রঘুনাথের অশ্রুবিন্দু বিমুক্ত হইল। রঘুনাথ পুনরায় নয়ন উন্মীলিত করিলেন। এ স্বপ্ন নহে, তাঁহার প্রাণের

সহোদরাই তাঁহার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া রহিয়াছেন।

রঘুনাথের হৃদয় আলোড়িত হইল; তিনি লক্ষ্মীর হাত দুইটি আপন তপ্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সেই স্নেহপূর্ণ মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল; অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া সেই তরুণ যোদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! তোমাকে কি এ জীবনে আবার দেখিতে পাইলাম? অন্য সুখ দূর হউক, অন্য আশা দূর হউক, লক্ষ্মী! তোমার হতভাগা ভ্রাতাকে নিকটে স্থান দিও, সে এ জীবনে আর কিছু চাহে না।

লক্ষ্মীও শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন না, ভ্রাতার হৃদয়ে আপন মুখ লুকাইয়া একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিলেন। আহা! এ ক্রন্দনে যে সুখ, জগতে কি রত্ন আছে, স্বর্গে কি সুখ আছে, যাহা অভাগাগণ সে সুখের নিকট তুচ্ছ জ্ঞান না করে?

পরস্পরকে বহুদিন পর পাইয়া পরস্পরে অনেকক্ষণ বাক্‌শূন্য হইয়া রহিলেন। বহুদিনের কথা রহিয়া রহিয়া হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল, সুখের লহরীর সহিত শোকের লহরী মিশ্রিত হইয়া হৃদয়ে উথলিতে লাগিল, থাকিয়া থাকিয়া দরবিগলিত ধারায় উভয়ের হৃদয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ভগিনীর ন্যায় এ জগতে আর স্নেহময়ী কে আছে? ভ্রাতৃস্নেহের ন্যায় আর পবিত্র স্নেহ কি আছে? আমরা সে ভালবাসা বর্ণন করিতে অশক্ত, পাঠক ক্ষমা কর।

অনেকক্ষণ পরে দুই জনের হৃদয় শীতল হইল। তখন লক্ষ্মী আপন অঞ্চল দিয়া ভ্রাতার নয়নের জল মোচন করিয়া বলিলেন,—ঈশানীর ইচ্ছায় কত অনুসন্ধানের পর আজ তোমাকে দেখিতে পাইলাম।

আহা! আজ আমার কি পরম সুখ, দুঃখিনীর কপালে কি এত সুখ ছিল? ভাই, এ শীতল বাতাসে আর থাকিলে তোমার অসুখ হইবে, চল, মন্দিরের ভিতর যাই, আমি আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না।

ভ্রাতা-ভগিনী মন্দির-অভ্যন্তরে আসিলেন, লক্ষ্মী একটি স্তম্ভের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, শ্রান্ত রঘুনাথ পূর্ব্ববৎ লক্ষ্মীর অঙ্কে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিলেন, মৃদুস্বরে উভয়ে গভীর অন্ধকার রজনীতে পূর্ব্বকথা কহিতে লাগিলেন।

ধীরে ধীরে ভ্রাতার ললাটে ও দেহে হস্ত বুলাইয়া লক্ষ্মী কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ তাহার উত্তর করিতে লাগিলেন। দস্যুহস্ত হইতে পলায়ন করিয়া অনাথ বালক কোন্ কোন্ দেশে বিচরণ করিয়াছিলেন, কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, তাহাই বলিতে লাগিলেন। কখন মহারাষ্ট্রীয় কৃষকদিগের সহিত চাষ করিতেন, কখন গোবৎস বা মেষপাল রক্ষা করিতেন, মেষের সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতে, উপত্যকায়, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেন, বা নির্জ্জনে বসিয়া চারণদিগের গীত গাইতেন। কখন সায়ংকালে নদীকূলে একাকী বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই গীত গাইয়া হৃদয়কে শান্ত করিয়াছেন, কখন প্রত্যূষে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া, পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছেন। পর্ব্বতসঙ্কুল কঙ্কণ-প্রদেশে কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়াছেন, অবশেষে একজন মহারাষ্ট্রীয় সেনানীর অধীনে কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত রঘুনাথের যুদ্ধব্যবসায়ে উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অবশেষে মহানুভব শিবজীর নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি সৈনিকের পদ গ্রহণ করেন। আজ তিন বৎসর হইল, সেই কার্য্য করিয়াছেন, জগদীশ্বর জানেন, তিনি কার্য্যে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু প্রভু শিবজীর অযথা সন্দেহে অপমানিত হইয়া

দেশে দেশে নিরাশ্রয়রূপে ভ্রমণ করিতেছেন! এক্ষণে জীবনে তাঁহার উদ্দেশ্য নাই, পিতার ন্যায় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া এ অসার জগৎ পরিত্যাগ করিবেন।

ভ্রাতার দুঃখকাহিনী শুনিতে শুনিতে স্নেহময়ী ভগিনী নিঃশব্দে অবারিত অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন। তিনি নিজের শোক সহ্য করিতে পারেন, ভ্রাতার দুঃখে একেবারে ব্যাকুল হইলেন। যখন সে কথা শেষ হইল, কথঞ্চিৎ শোক সম্বরণ করিয়া আপনার কি পরিচয় দিবেন, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চন্দ্ররাওয়ের নাম করিলেন না, ধীরে ধীরে অশ্রুজল মোচন করিয়া বলিলেন,—মহারাষ্ট্রদেশে আসিবার অনতিকাল পরেই একজন সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্র জায়গীরদার তাঁহাকে বিবাহ করেন। নারী স্বামীর নাম করে না, কিন্তু গগনের শশধরের নামই তাঁহার স্বামীর নাম, গগনের শশধরের ন্যায় তাঁহার ক্ষমতা ও গৌরব-জ্যোতিঃ চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার বিপুল সংসারে লক্ষ্মী সুখে আছেন, প্রভুও দাসীর উপর অনুগ্রহ করেন, সে অনুগ্রহে দাসী সুখে আছেন। এ জীবনে তাঁহার আর কোন বাসনা নাই, কেবল প্রাণের ভাইকে সুখে থাকিতে দেখিলেই তাঁহার জীবন সার্থক হয়। রঘুনাথের সংবাদ তিনি মধ্যে মধ্যে পাইতেন, তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য কতক চেষ্টা করিতেছেন। অদ্য সেই কামনায় মন্দিরে পূজা দিতে আসিয়াছিলেন, সহসা মন্দিরপার্শ্বে বৃক্ষমূলে প্রাণের ভাইকে পুনরায় পাইলেন।

এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়া লক্ষ্মী ভ্রাতার হৃদয়ের শেলসম দুঃখ উৎপাটন করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী দুঃখিনী, দুঃখের কথা জানিতেন। লক্ষ্মী নারী, দুঃখ সান্ত্বনা করিতে জানিতেন। সহিষ্ণু হইয়া নিজ দুঃখ সহ্য করা, সান্ত্বনা দিয়া পরের দুঃখ দূর করা, এই নারীর ধর্ম্ম।

অনেক প্রকার প্রবোধবাক্য দিয়া লক্ষ্মী ভ্রাতার মন শান্ত করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—আমাদিগের জীবনই এইরূপ, সকল দিন সমান থাকে না। ভগবান্ যে সুখ দেন, তাহা আমরা ভোগ করি, যদি একদিন দুঃখ পাই, তাহা কি সহ্য করিতে বিমুখ হইব? মানব-জন্মই দুঃখময়. যদি আমরা সহ্য না করিব, তবে কে করিবে? সুদিন দুর্দ্দিন সকলেরই আছে, দুর্দ্দিনে যেন আমরা সেই বিধাতার নাম করিয়া নিজ শোক বিস্মৃত হই। তিনিই একদিন পিত্রালয়ে আমাদের সুখ দিয়াছিলেন, তিনিই অদ্য কষ্ট দিয়াছেন, তিনিই পুনরায় সে কষ্ট মোচন করিবেন। ভাই! এ নৈরাশ্য দূর কর, এরূপ অবস্থায় থাকিলে শরীর কত দিন থাকিবে? আহারনিদ্রা ত্যাগ করিলে মনুষ্য-জীবন কত দিন থাকে?

রঘুনাথ। থাকিবার আবশ্যক কি? যে দিন বিদ্রোহী বলিয়া সৈনিকের নামে কলঙ্ক পড়িল, সেই দিন সৈনিকের জীবন গেল না কি জন্য?

লক্ষ্মী। তোমার ভগ্নী লক্ষ্মীকে চিরদুঃখিনী করিবে, এই কি ইচ্ছা? দেখ ভাই, আমার আর এ জগতে কে আছে? পিতা নাই, মাতা নাই, জগৎসংসারে কেহ নাই। তুমিও কি দুঃখিনী লক্ষ্মীর প্রতি সমস্ত মমতা ভুলিলে? বিধাতা কি এ হতভাগিনীর উপর একেবারে বিমুখ হইলেন?

রঘুনাথ। লক্ষ্মী! তুমি আমাকে ভালবাস, তাহা জানি, তোমাকে যে দিন কষ্ট দিব, সে দিন যেন ঈশ্বর আমার প্রতি বিমুখ হন। কিন্তু ভগিনি! এ জীবনে আর আমার সুখ নাই, তুমি স্ত্রীলোক, সৈনিকের শোক বুঝিবে কিরূপে? জীবন অপেক্ষা আমাদিগের সুনাম প্রিয়, মৃত্যু অপেক্ষা কলঙ্ক ও অপযশ সহস্রগুণে কষ্টকর। সেই কলঙ্কে রঘুনাথের নাম কলঙ্কিত হইয়াছে।

লক্ষ্মী। তবে সেই কলঙ্ক দূর করিবার চেষ্টায় কেন বিমুখ হও? মহানুভব শিবজীর নিকট যাও, তাঁহার ক্রোধ দূর হইলে তিনি অবশ্যই তোমার কথা শুনবেন, তোমার দোষ নাই, বুঝিবেন।

রঘুনাথ উত্তর করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিলেন, পিতার অভিমান, পিতার দর্প পুত্রে বর্ত্তমান। তিনি প্রাণ থাকিতে এইরূপ আবেদন করিবেন না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী ভ্রাতার অন্তরের ভাব বুঝিয়া পুনরায় বলিলেন,—মার্জ্জনা কর, আমি স্ত্রীলোক, সমস্ত বুঝি না। কিন্তু যদি শিবজীর নিকটে যাইতে অসম্মত হও, কার্য্য দ্বারা কেন আপন যশ রক্ষা কর না? পিতা বলিতেন, "সেনার সাহস ও প্রভুভক্তি কার্য্যে প্রকাশ হয়।" যদি বিদ্রোহী বলিয়া তোমাকে কেহ সন্দেহ করিয়া থাকে, অসিহস্তে কেন সে সন্দেহ খণ্ডন কর না?

উৎসাহে রঘুনাথের নয়ন প্রজ্বলিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিরূপে?

লক্ষ্মী। শুনিয়াছি, শিবজী দিল্লী যাইতেছেন, তথায় সহস্র ঘটনা ঘটিতে পারে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈনিকের আত্মপরিচয় দিবার সহস্র উপায় থাকিতে পারে। আমি স্ত্রীলোক, আমি কি জানি বল? তোমার পিতার ন্যায় সাহস, তাঁহারই ন্যায় বীরপ্রতিজ্ঞা করিলে তোমার কোন্ উদ্দেশ্য না সফল হইতে পারে?

রঘুনাথের যদি অন্য চিন্তার সময় থাকিত, তবে বুঝিতেন, কনিষ্ঠা লক্ষ্মী মানবহৃদয়শাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞা নহেন। যে ঔষধি আজি রঘুনাথের হৃদয়ে ঢালিয়া দিলেন, তাহাতে মুহূর্ত্তমধ্যে শোকসন্তাপ দূর হইল, সৈনিকের হৃদয় পূর্ব্ববৎ উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিল।

রঘুনাথ অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, তাঁহার নয়ন ও মুখমণ্ডল সহসা

নব গৌরব ধারণ করিল। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—লক্ষ্মী! তুমি স্ত্রীলোক, কিন্তু তোমার কথা শুনিতে শুনিতে আমার মনে নূতন ভাবের উদয় হইল। আমার হৃদয় উৎসাহশূন্য নহে, ভগবান্ সহায় হউন্, রঘুনাথ বিদ্রোহী নহে, ভীরু নহে, এ কথা এখনই প্রচার হইবে। কিন্তু তুমি বালিকা, তোমার নিকট এ সমস্ত কহি কেন, তুমি আমার হৃদয়ের ভাব কি বুঝিবে?

লক্ষ্মী ঈষৎ হাসিলেন, ভাবিলেন,—রোগ নির্ণয় করিলাম আমি, ঔষধ দিলাম আমি, তথাপি কিছু বুঝি না? প্রকাশ্যে বলিলেন,—ভাই! তোমার উৎসাহ দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়াইল। তোমার মহৎ উদ্দেশ্য আমি কিরূপে বুঝিব? কিন্তু যাহাই হউক, তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী যত দিন বাঁচিবে, তুমি পূর্ণমনোরথ হও, জগদীশ্বরের নিকট এই প্রর্থনা করিবে।

রঘুনাথ। আর লক্ষ্মী! আমি যত দিন বাঁচিব, তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা কখনও বিস্মৃত হইব না।

অনেকক্ষণ পরে লক্ষ্মী অধোবদনে ধীরে ধীরে কহিলেন,—আমার আর একটি কথা আছে, কিন্তু কহিতে ভয় হইতেছে।

রঘুনাথ। লক্ষ্মী! আমার নিকট তোমার কি কথা বলিতে ভয় হয়? আমি তোমার সহোদর, সহোদরের নিকট কি ভয়?

লক্ষ্মী। চন্দ্ররাও নামে একজন জুমলাদার বোধ হয়, তোমার অপকার করিয়াছেন!

রঘুনাথের হাস্য দূর হইল, মুখ রক্তবর্ণ হইল। কিন্তু সে উদ্বেগ দমন করিয়া রঘুনাথ কহিলেন,—চন্দ্ররাও রাজার নিকটে যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহা অযথার্থ নহে। তিনি আমার অন্য কোন অপকার করিয়াছেন কি না, তাহা আমি জানি না।

লক্ষ্মী। তিনি যাহাই করিয়া থাকেন, ভাই, অঙ্গীকার কর, তাঁহার অনিষ্ট করিবে না।

রঘুনাথ নিরুত্তর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী পুনরায় বলিলেন,—ভ্রাতার নিকট পূর্ব্বে কখনও আমি কোন ভিক্ষা করি নাই; একটি কথা বলিলাম, ভাই, আমাকে যদি ভালবাস, এ কথাটি রাখিও।

সে অনুরোধে রঘুনাথের হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি ভগিনীর হাত দুইটি ধরিয়া বলিলেন,—লক্ষ্মী, আমার মনে মনে সন্দেহ হয়, চন্দ্ররাওই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, কিন্তু তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। এই ঈশানী-মন্দিরে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, চন্দ্ররাওয়ের কোন অনিষ্ট করিব না; আমি তাঁহার দোষ মার্জ্জনা করিলাম, জগদীশ্বর তাঁহাকে মার্জ্জনা করুন।

লক্ষ্মী হৃদয়ের সহিত বলিলেন,—জগদীশ্বর তাঁহাকে মার্জ্জনা করুন।

পূর্ব্বদিকে প্রভাতের আলোকচ্ছটা দেখা যাইল, লক্ষ্মী তখন অনেক অশ্রুবর্ষণ করিয়া সস্নেহে ভ্রাতার নিকট বিদায় হইলেন; বলিলেন, —আমার সঙ্গে বাটীর অন্য লোক মন্দিরে আসিয়াছে, এখনও সকলে নিদ্রিত আছে, একক্ষণে আমি না যাইলে জানিতে পারিবে, এখন চলিলাম, পরমেশ্বর তোমার মনোরথ পূর্ণ করুন।

পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন,—এই বলিয়া সস্নেহে লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইয়া রঘুনাথও মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইলাম, পাঠক! চল, আমরা হতভাগিনী সরযূর নিকট বিদায় লইয়া আসি।

বিংশ পরিচ্ছেদ

সীতাপতি গোস্বামী

যাও যুদ্ধে তোমা অদ্য করি অভিষেক,

*　　　*　　　*

যাও যশোবিমণ্ডিত হইয়া আবার

এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাক্ষাতে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আক্রমণদিনে রঘুনাথের যাইতে কি জন্য বিলম্ব হইয়াছিল, পাঠক মহাশয় অবশ্যই উপলব্ধি করিয়াছেন। সে দিন যুদ্ধে কে রক্ষা পাইবে, কেহ জানিত না, যুদ্ধে গমন করিবার পূর্ব্বে রঘুনাথ প্রাণ ভরিয়া একবার সরযূকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, সাশ্রুনয়নে সরযূ রঘুনাথকে বিদায় দিয়াছিলেন।

এক দিন দুই দিন অতিবাহিত হইল, রঘুনাথের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। আশা প্রথমে কাণে কাণে বলিতে লাগিল,—রঘুনাথ যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছেন, রঘুনাথ রাজ-সম্মানিত হইয়াছেন, বিজয়ী রঘুনাথ শীঘ্র উল্লাসিত-হৃদয়ে আবার আসিতেছেন, পরম কুতূহলের সহিত পিতার নিকট যুদ্ধকথা কহিবেন। কিন্তু রঘুনাথ আর আসিলেন না, সেদিনকার যুদ্ধকথা বর্ণনা করিলেন না।

সহসা বজ্রের ন্যায় সংবাদ আসিল, রঘুনাথ বিদ্রোহী, বিদ্রোহাচরণ

জন্য অবমানিত হইয়া দূরীভূত হইয়াছেন! প্রথম মূহূর্ত্তে সরযূ চকিতের ন্যায় রহিলেন, কথার অর্থ তাঁহার বোধগম্য হইল না। ক্রমে ললাট রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, রক্তোচ্ছ্বাসে মুখমণ্ডল রঞ্জিত হইল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, নয়ন হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। দাসীকে বলিলেন,—কি বলিলি, রঘুনাথ বিদ্রোহী? রঘুনাথ মুসলমানদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন? কিন্তু তুই নির্ব্বোধ, তোকে কি বলিব, সম্মুখ হইতে দূর হ!

ক্রমে যুদ্ধ হইতে একে একে অনেক সৈন্য আসিতে লাগিল, সকলে বলিতে লাগিল, "রঘুনাথ বিদ্রোহী!" সরযূর সখীগণ, সরযূকে এই কথা বলিলেন; বৃদ্ধ জনার্দ্দনও সাশ্রুলোচনে বলিতে লাগিলেন,—কে জানে, সেই সুন্দর উদারমূর্ত্তি বালকের মনে এরূপ ক্রূরতা ছিল? সরযূ সমস্ত শুনিলেন, কোন উত্তর করিলেন না। জগৎশুদ্ধ লোকে রঘুনাথকে বিদ্রোহী বলিতেছে, সরযূর হৃদয় কহিল, জগৎ মিথ্যাবাদী, রঘুনাথের চরিত্রে দোষ স্পর্শে না।

এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে পর একদিন সন্ধ্যার সময় সরযূ সরোবর-তীরে যাইলেন। দেখিলেন, সরোবরের কূলে সেই নৈশ অন্ধকারে জটাজূটধারী দীর্ঘকায় একজন গোস্বামী বসিয়া রহিয়াছেন। সরযূ ঈষৎ বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন, যতই গোস্বামীর দিকে দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার তেজঃপূর্ণ অবয়ব দেখিয়া সরযূর হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হইতে লাগিল।

গোস্বামী সরযূর দিকে চাহিলেন, ক্ষণেক স্থিরভাবে দেখিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—ভদ্রে! এ গোস্বামীর নিকট কি তোমার কোনও প্রয়োজন আছে? কোনও বিশেষ অভীষ্টে আমার নিকট আসিয়াছ? রমণি! তোমার ললাটে দুঃখচিহ্ন দেখিতেছি কেন? চক্ষুতে জল কেন?

সরযূ উত্তর করিতে পারিলেন না। গোস্বামী পুনরায় বলিলেন,—বোধ হয়, আমি তোমার উদ্দেশ্য অবগত আছি, বোধ হয়, কোন বন্ধুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ।

সরযূ তখন কম্পিতস্বরে বলিলেন,—ভগবন্! আপনার শক্তি অসাধারণ, যদি অনুগ্রহ করিয়া আরও কিছু বলেন, তবে বাধিত হই। সেই বন্ধু বিপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।

গোস্বামী। জগতে সকলে তাঁহাকে বিদ্রোহী বলিয়া জানে।

সরযূ। প্রভুর অজ্ঞাত কিছুই নাই।

গোস্বামী। মহারাজ শিবজী তাঁহাকে বিদ্রোহী জানিয়াই দূর করিয়া দিয়াছেন।

সরযূর মুখ রক্তবর্ণ হইল; আরক্ত নয়নে কহিলেন,—তপস্যা, প্রবঞ্চনা বিশ্বাস করিব, কিন্তু রঘুনাথ বিদ্রোহী, বিশ্বাস করিব না। গোস্বামিন্! আমি বিদায় হই।

গোস্বামীর নয়ন জলপূর্ণ হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে।

সরযূ। নিবেদন করুন।

গোস্বামী। মনুষ্যহৃদয় অবগত হওয়া মনুষ্যগণনার অসাধ্য, রঘুনাথের হৃদয়ে কি ছিল, জানিবার একমাত্র উপায় আছে। প্রণয়িনীর হৃদয় প্রণয়ীর হৃদয়ের দর্পণস্বরূপ; যদি রঘুনাথের যথার্থ প্রণয়িনী কেহ থাকে, তাঁহার নিকট গমন কর, তাঁহার হৃদয়ের ভাব কি, জিজ্ঞাসা কর, তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা মিথ্যাবাদিনী নহে।

সরযূ আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—জগদীশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ করি, তুমি আমার হৃদয়ে এতক্ষণে শান্তিদান করিলে। সেই

উন্নতচরিত্র যোদ্ধার প্রণয়িনী হইবার যে আশা করে, জীবন থাকিতে রঘুনাথের সত্যতায় তাহার স্থিরবিশ্বাস বিচলিত হইবে না।

ক্ষণেক পরে গোস্বামী আবার বলিলেন,—ভদ্রে! তোমার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে যে, তুমিই সেই যোদ্ধার প্রকৃত প্রণয়িনী। আমি দেশে দেশে পর্য্যটন করি, সম্ভবতঃ রঘুনাথের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইতে পারে, তাঁহাকে কিছু বক্তব্য আছে? আমার নিকট লজ্জার কারণ নাই, আমি সংসারের বহির্ভূত।

সরযূ ঈষৎ লজ্জিত হইলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন,—প্রভুর সহিত তাঁহার সম্প্রতি সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

গোস্বামী। কল্য রজনীতে ঈশানী-মন্দিরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনিই আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন।

সরযূ। তিনি আপাততঃ কি করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা কি বলিয়াছেন?

গোস্বামী। নিজ বাহুবলে, নিজ কার্য্যগুণে, অন্যায় অপযশ তিরোহিত করিবেন অথবা সেই চেষ্টায় প্রাণদান করিবেন।

সরযূ। ধন্য বীর প্রতিজ্ঞা! যদি তাঁহার সহিত পুনরায় আপনার সাক্ষাৎ হয়, বলিবেন, সরযূ রাজপুতবালা, জীবন অপেক্ষা যশ অধিক জ্ঞান করে। বলিবেন, সরযূ যত দিন জীবিত থাকিবে, রঘুনাথকে কলঙ্কশূন্য বীর বলিয়া তাঁহারই যশোগীত গাইবে। ভগবান্ অবশ্যই রঘুনাথের যত্ন সফল করিবেন।

গোস্বামী। ভগবান্ তাহাই করুন। কিন্তু ভদ্রে! সত্যের সর্ব্বদা জয় হয় না। বিশেষতঃ রঘুনাথ যে দুরূহ উদ্যমে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণসংশয়ও আছে।

সরযূ। রাজপুতের সেই ধর্ম্ম। আপনি তাঁহাকে জানাইবেন,

যদি কর্ত্তব্যসাধনে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়, সরযূবালা তাঁহার যশোগীত গাইতে গাইতে উল্লাসে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে!

উভয়ে ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে সরযূ জিজ্ঞাসা করিলেন,—রঘুনাথ আর কিছু আপনার নিকট বলিয়াছিলেন?

গোস্বামী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন,—আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বিদ্রোহী বলিয়া জগৎ তাঁহাকে ঘৃণা করিবে, আপনি কি তাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দিবেন? জগৎ যাঁহার নাম উচ্চারণ করিবে না, আপনি কি তাঁহার নাম স্মরণ করিবেন? ঘৃণিত, অবমানিত, দূরীকৃত রঘুনাথকে কি সরযূবালা মনে রাখিবেন?

সরযূ বলিলেন,—প্রভু! তাঁহাকে জানাইবেন, সরযূ রাজপুতবালা, অবিশ্বাসিনী নহে।

গোস্বামী। জগদীশ্বর! তবে আর তাঁহার হৃদয়ে কষ্ট নাই। লোকে যদি মন্দ বলে, তিনি জানিবেন, একজন এখনও রঘুনাথকে বিশ্বাস করে। এক্ষণে বিদায় দিন। আমি এই কথাগুলি বলিলে রঘুনাথের হৃদয়ে শান্তিসেচন হইবে।

সজলনয়নে সরযূ বলিলেন,—তাঁহাকে আরও বলিবেন, তিনি অসিহস্তে যশের পথ পরিষ্কার করুন, যিনি জগতের আদিপুরুষ, তিনি তাঁহার সহায় হইবেন।

উভয়ে পুনরায় নীরব হইয়া রহিলেন। সরযূ বলিলেন,—প্রভু! আমার হৃদয় শান্ত করিয়াছেন, প্রভুর নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

গোস্বামী বলিলেন, "সীতাপতি গোস্বামী!"

রজনী জগতে গভীরতর অন্ধকার ঢালিতে লাগিল! সেই অন্ধকারে একজন গোস্বামী একাকী রায়গড় দুর্গাভিমুখে গমন করিতেছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

রায়গড় দুর্গ

ধিক্ দেব, ঘৃণাশূন্য অক্ষুব্ধ হৃদয়,
এত দিন আছ এই অন্ধতমপুরে,
দেবত্ব, বিভব, বীর্য্য, সব তেয়াগিয়া,
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজ্জ্বলি ?

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর, শিবজীর তদানীন্তন রাজধানী রায়গড়ে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটি সভা সন্নিবেশিত হইয়াছে। শিবজীর প্রধান প্রধান সেনাপতি, মন্ত্রী, কর্ম্মচারী, পুরোহিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। পরাক্রান্ত যোদ্ধা, ধীশক্তিসম্পন্ন মন্ত্রী, শীর্ণতনু শুক্লকেশ বহুদর্শী ন্যায়শাস্ত্রী, সভাতল সুশোভিত করিয়াছেন। যুদ্ধব্যবসায়ে, বুদ্ধিসঞ্চালনে, বা বিদ্যাবলে ইঁহারাই শিবজীর চিরসহায়তা করিয়াছেন, শিবজীর ন্যায় ইঁহাদেরও হৃদয় স্বদেশানুরাগে পূর্ণ। কিন্তু অদ্য সভাস্থল নীরব, শিবজী নীরব, মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ অদ্য মহারাষ্ট্রীয় গৌরবলক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইবার জন্য সমবেত হইয়াছেন।

অনেকক্ষণ পর শিবজী মুরেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,— পেশওয়াজী! আপনি তবে এই পরামর্শ দিতেছেন, সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়াছি, তাঁহার অধীন জায়গীরদার হইয়া থাকিব ?

সুরেশ্বর। মনুষ্যের যাহা সাধ্য, আপনি তাহা করিয়াছেন, বিধির নির্ব্বন্ধ কে লঙ্ঘন করিতে পারে?

শিবজী। স্বর্ণদেব! যখন আপনি আমার আদেশে এই সুন্দর প্রশস্ত রায়গড়দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তখন ইহা রাজার রাজধানী-স্বরূপ নির্ম্মাণ করেন, না জায়গীরদারের অবস্থান বলিয়া নির্ম্মাণ করেন?

আবাজী স্বর্ণদেব ক্ষুণ্ণস্বরে উত্তর করিলেন,—ক্ষত্রিয়রাজ! ভবানীর আদেশে একদিন স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, ভবানীর আদেশে সে চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়াছেন, তাহাতে আক্ষেপ অবিধেয়। ঈশানী স্বয়ং হিন্দুসেনাপতির সহিত যুদ্ধ নিষেধ করিয়াছেন।

অন্নজী দত্তও কহিলেন,—যাহা অনিবার্য্য, তাহা হইয়াছে, অধুনা আপনার দিল্লীনগরের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করুন।

শিবজী। অন্নজী! আপনার কথা সত্য, কিন্তু যে আশা, যে চেষ্টা হৃদয়ে বহুকালাবধি স্থান পাইয়াছে, তাহা সহজে উৎপাটিত হয় না। ঐ যে উন্নত পর্ব্বতশ্রেণী চন্দ্রালোকে দৃষ্ট হইতেছে, বাল্যকালে ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গ আরোহণ করিতে করিতে বা উপত্যকায় ভ্রমণ করিতে করিতে হৃদয়ে কত স্বপ্নের আবির্ভাব হইত! পুনরায় মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীন হইবে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে, পুনরায় হিন্দুরাজা হিমালয় হইতে সাগরকূল পর্য্যন্ত সমপ্রদেশ শাসন করিবেন! ঈশানি! যদি এ আশা অলীক স্বপ্নমাত্র, তবে এরূপ স্বপ্নে কেন বালকের হৃদয় চঞ্চল করিয়াছিলে?

এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে নীরব, সভায় শব্দমাত্র নাই। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘরের এক প্রান্তে ঈষৎ অন্ধকার স্থান হইতে একটি গম্ভীর স্বর শ্রুত হইল,—ঈশানী প্রবঞ্চনা করেন না! মনুষ্যের যদি অধ্যবসায় ও বীরত্ব থাকে, ঈশানী সহায়তাদানে কুণ্ঠিত হইবেন না!

চকিত হইয়া শিবজী চাহিয়া দেখিলেন, নবীন গোস্বামী সীতাপতি।

উৎসাহে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে লাগিল, বলিলেন—গোঁসাইজী! তুমি আমার হৃদয়ে বাল্য উৎসাহ পুনরুদ্রেক করিতেছ, বাল্যকথা পুনরায় স্মরণ করাইতেছ! তাত দাদাজী কানাইদেব মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, 'বৎস! তুমি যে চেষ্টা করিতেছ, তদপেক্ষা মহত্তর চেষ্টা আর নাই। এই উন্নত পথ অনুসরণ কর, দেশের স্বাধীনতা সাধন কর, ব্রাহ্মণ, গোবৎসাদি ও কৃষকগণকে রক্ষা কর, দেবালয়-কলুষিতকারীকে শাস্তি প্রদান কর, ঈশানী যে উন্নত পথ তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই পথ অনুধাবন কর।' বিংশতি বৎসর পরে অদ্য দাদাজীর গম্ভীরস্বর আমার কর্ণকুহরে শব্দিত হইতেছে, দাদাজী কি প্রবঞ্চনাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন?

পুনরায় সেই গোস্বামী সেই গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—কানাইদেব প্রবঞ্চনাবাক্য উচ্চারণ করেন নাই, উন্নত পথ অনুসরণ করিলে অবশ্যই উন্নত ফললাভ হইবে। পথিমধ্যে যদি আমরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া নিরস্ত হই, সে কি দাদাজী কানাইদেবের প্রবঞ্চনা, না আমাদের ভীরুতা?

"ভীরুতা" শব্দ উচ্চারণমাত্র সভাতে গোলযোগ উপস্থিত হইল, বীরদিগের কোষে অসি ঝন্‌ঝনা শব্দ করিল।

গোস্বামী পুনরায় গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—রাজন্! গোস্বামীর বাচালতা ক্ষমা করুন, যদি অন্যায় কথা উচ্চারণ করিয়া থাকি, ক্ষমা করুন। কিন্তু মদীয় উপদেশ সত্য কি অলীক, ক্ষত্রিয়রাজ, আপন বীরহৃদয়কে জিজ্ঞাসা করুন। যিনি জায়গীরদারের পদবী হইতে রাজপদবী গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি অসিহস্তে স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার করিয়াছেন, যিনি পর্ব্বতে, উপত্যকায়, গ্রামে, অটবীতে বীরত্বের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছেন, তিনি কি সে বীরত্ব বিস্মরণ হইবেন, সে স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিবেন? বালসূর্য্যের ন্যায় যে হিন্দুরাজ্যের জ্যোতিঃ চারিদিকের

অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া বিস্তৃত হইতেছে, সে সূর্য্য কি অকালে অস্ত যাইবে? রাজন্! হিন্দু-গৌরবলক্ষ্মী আপনাকে বরণ করিয়াছেন, আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন? আমি ধর্ম্মব্যবসায়ী মাত্র, আমার পরামর্শ দিবার অধিকার নাই, স্বয়ং বিবেচনা করুন।

সভাস্থ সকলে নীরব, শিবজী নীরব, কিন্তু তাঁহার নয়ন ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে শিবজী গোস্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,— "গোস্বামিন্! আপনার সহিত অল্পদিনই আমার পরিচয় হইয়াছে, আপনি দেব কি মনুষ্য, জানি না, কিন্তু দৈববাণী হইতেও আপনার কথা হৃদয়ে গভীরতর অঙ্কিত হইতেছে। একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, হিন্দু-সেনাপতির তুমুল প্রতাপ, তীক্ষ্ণ রণকৌশল, অসংখ্য রাজপুত-সেনা, তাহার সহিত যুদ্ধ করে, এরূপ সৈন্য আমাদের কোথায়?

সীতাপতি। রাজপুতগণ বীরাগ্রগণ্য, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণও দুর্ব্বল হস্তে অসিধারণ করে না। জয়সিংহ রণপণ্ডিত, কিন্তু শিবজীও ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পরাজয় আশঙ্কা করিলেই পরাজয় হয়। পুরুষসিংহ! বিপদ তুচ্ছ করিয়া দৈবকে সংহার করিয়া, কার্য্য সাধন করুন, ভারতবর্ষে এরূপ হিন্দু নাই যে, আপনার যশোগান না করিবে, আকাশে এমন দেবতা নাই, যিনি আপনার সহায়তা না করিবেন।

শিবজী। মানিলাম, কিন্তু হিন্দুতে হিন্দুতে যুদ্ধ করিয়া রুধির স্রোতে দেশ প্লাবিত করিবে, সে কি মঙ্গল, সে কি পুণ্যকর্ম্ম?

সীতাপতি। সে পাপে কে পাতকী? যিনি স্বজাতির জন্য, স্বধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করেন, তিনি, না যিনি মুসলমানদিগের অর্ন্তভুক্ত হইয়া স্বজাতির বৈরাচরণ করেন, তিনি?

শিবজী পুনরায় নীরব হইয়া রহিলেন, প্রায় এক দণ্ডকাল নীরবে

চিন্তা করিতে লাগিলেন তাঁহার বিশাল হৃদয় কত ভীষণ চিন্তা-লহরীতে আলোড়িত হইতেছিল, কে বলিবে ? একদণ্ড কাল পর ধীরে ধীরে মস্তক উঠাইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"সীতাপতি! অদ্য জানিলাম, মহারাষ্ট্রদেশ এখনও বীরশূন্য হয় নাই, এখনও পরাধীন হইবে না। পুনরায় যুদ্ধ হইবে, সে যুদ্ধের দিনে আপনা অপেক্ষা বিচক্ষণ মন্ত্রী বা সাহসী সহযোগী আমি আকাঙ্ক্ষা করি না। কিন্তু সে যুদ্ধের দিন এখনও আইসে নাই। আমি পরাজয় আশঙ্কা করিতেছি না, স্বধর্ম্মনাশ আশঙ্কা করিতেছি না, অন্য একটি কারণে আপাততঃ যুদ্ধে বিমুখ হইতেছি, শ্রবণ করুন।

"যে মহৎ ব্রত ধারণ করিয়াছি, তাহা সাধনার্থ অনেক ষড়যন্ত্র, অনেক গুপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছি। ম্লেচ্ছগণ আমার সহিত সন্ধিবাক্য রাখে নাই, আমিও তাহাদিগের সহিত সন্ধি রাখি নাই।

"অদ্য হিন্দুধর্ম্মের অবলম্বনস্বরূপ, হিন্দু প্রতাপের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ, সত্যনিষ্ঠ জয়সিংহের সহিত সন্ধি করিয়াছি, শিবজী সে সন্ধি লঙ্ঘন করিতে অপারগ! মহানুভব রাজপুতের সহিত যে সন্ধি করিয়াছি, শিবজী জীবন থাকিতে তাহা লঙ্ঘন করিবে না।

"ধর্ম্মাত্মা একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, 'সত্য পালনে যদি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা না হয়, সত্যলঙ্ঘনে হইবে?' সে কথা অদ্যাপি আমি বিস্মৃত হই নাই, সে কথা অদ্য বিস্মরণ হইব না।

"সীতাপতি! চতুর আরংজীব যদি আমাদের সন্ধির কথা লঙ্ঘন করেন, তখন আপনার পরামর্শ গ্রহণ করিব, তখন শিবজী দুর্ব্বল হস্তে খড়্গ ধরিবে না। কিন্তু সত্যপরায়ণ জয়সিংহের সহিত এই সন্ধি লঙ্ঘন করিতে শিবজী অপারগ।"

সভাসদ্ সকলে নীরব রহিলেন। ক্ষণেক পর অন্নজী বলিলেন,—

মহারাজ! আর একটি কথা আছে, আপনি কি দিল্লী যাওয়া স্থির করিয়াছেন?

শিবজী। সে বিষয়েও আমি জয়সিংহকে বাক্যদান করিয়াছি।

অন্নজী। মহারাজ! আরংজীবের চতুরতা জানেন, তাঁহার কথা বিশ্বাস করিবেন? তিনি আপনাকে কি মনোরথে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা কি আপনি অনুভব করিতে পারেন না?

শিবজী। অন্নজী! জয়সিংহ স্বয়ং বাক্যদান করিয়াছেন যে, দিল্লীগমনে আমার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবে না।

অন্নজী। কপটাচারী আরংজীব যদি আপনাকে বন্দী করেন বা হত্যা করেন, তখন জয়সিংহ কিরূপে আপনাকে রক্ষা করিবেন?

শিবজী। সন্ধিলঙ্ঘনের ফল আরংজীব অবশ্যই ভোগ করিবেন। দত্তজী! মহারাষ্ট্রভূমি বীরপ্রসবিনী, আরংজীব এরূপ আচরণ করিলে মহারাষ্ট্রদেশে যে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইবে, সাগরের জলে তাহা নিবারিত হইবে না, আরংজীব ও সমস্ত দিল্লীর সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে! পাপের ফল নিশ্চয়ই ফলিবে।

শিবজীকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া আর কেহ নিষেধ করিলেন না। ক্ষণেক পর শিবজী বলিলেন,—পেশোয়াজী মুরেশ্বর! আবাজী স্বর্ণদেব! অন্নজী দত্ত! আপনাদিগের ন্যায় প্রকৃত বন্ধু আমার অতি বিরল, আপনাদিগের ন্যায় কার্য্যক্ষম ও বিচক্ষণ পণ্ডিত মহারাষ্ট্রদেশে বিরল। আমার অবর্ত্তমানে মহারাষ্ট্রদেশ আপনারা তিনজনে শাসন করিবেন, আপনাদিগের আদেশ আমার আদেশের ন্যায় সকলে পালন করিবে, এইরূপ আজ্ঞা দিয়া যাইব।

মুরেশ্বর, স্বর্ণদেব ও অন্নজী শাসনভার গ্রহণ করিলেন। মালশ্রী তখন বলিলেন,—ক্ষত্রিয়রাজ! আমার একটি আবেদন আছে।

বাল্যকাল হইতে আপনার সঙ্গ ত্যাগ করি নাই, অনুমতি করুন, আপনার সহিত দিল্লী যাত্রা করি।

সজলনয়নে শিবজী বলিলেন,—মালশ্রী! তোমার নিকট আমার অদেয় কিছুই নাই, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

সীতাপতি ক্ষণেক পর বলিলেন,—রাজন্! তবে আমাকে বিদায় দিন, আমাকে ব্রতসাধনার্থ বহু তীর্থে যাইতে হইবে। জগদীশ্বর আপনাকে নিরাপদে রাখুন।

শিবজী। নবীন গোস্বামিন্! কুশলে তীর্থ যাত্রা করুন। যুদ্ধের সময় আপনাকে পুনরায় স্মরণ করিব। আপনা অপেক্ষা প্রকৃত বন্ধু আমি দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করি না। আপনার মত অল্পবয়সেই এরূপ তেজঃ, সাহস ও বীরত্ব আমি আর কাহারও দেখি নাই।

পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—কেবল আর এক জনকে দেখিয়াছিলাম।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

চাঁদ কবির গীত

চলেছে চাহিয়া দেখ,
যোদ্ধা, যোদ্ধা এক এক
কাল পরাজয় করি দেবমূর্ত্তি ধরিয়া।

* * *

জন্মিবে পুরুষগণ
বীর যোদ্ধা অগণন,
রাখিবে ভারত নাম ক্ষিতি-পৃষ্ঠে আঁকিয়া।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৬৬৬ খৃঃ অব্দে বসন্তকালে পঞ্চশত অশ্বারোহী ও এক সহস্র পদাতিক মাত্র লইয়া শিবজী দিল্লীর নিকট উপস্থিত হইলেন। নগরের প্রায় ছয় ক্রোশ দক্ষিণে শিবির সংস্থাপিত করিয়াছেন, সেনাগণ বিশ্রাম করিতেছে, শিবজী চিন্তিত মনে এদিক্ ওদিক্ পরিভ্রমণ করিতেছেন। দিল্লী আসিয়া কি ভাল করিয়াছেন? মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করা কি বীরোচিত কার্য্য হইয়াছে? এখনও কি প্রত্যাবর্ত্তনের উপায় নাই? এইরূপ সহস্র চিন্তা শিবজীর মহৎ হৃদয় আলোড়িত করিতেছে। যোদ্ধার মুখমণ্ডল ও ললাট চিন্তারেখায় অঙ্কিত, বিপদকালে ও যুদ্ধকালে কেহ শিবজীর মুখমণ্ডল এরূপ চিন্তাঙ্কিত দেখে নাই।

শিবজীর সঙ্গে সঙ্গে কেবল তাঁহার তেজস্বী উগ্রস্বভাব নয় বৎসরের বালক শম্ভুজী ভ্রমণ করিতেছেন, এক একবার পিতার গম্ভীর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, পিতার হৃদয়ের ভাব কতক কতক বুঝিতে পারিতেছিলেন। রঘুনাথপন্ত ন্যায়শাস্ত্রী নামক শিবজীর পুরাতন মন্ত্রী কিছু পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিলেন।

অনেকক্ষণ পর শিবজী মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ন্যায়শাস্ত্রী, আপনি কখনও দিল্লীতে আসিয়াছিলেন?

ন্যায়শাস্ত্রী। বাল্যকালে দিল্লীনগর দেখিয়াছিলাম।

শিবজী। দূরে ঐ বহুবিস্তীর্ণ প্রাচীরের ন্যায় কি দেখা যাইতেছে, বলিতে পারেন? আপনি অনন্যমনা হইয়া ঐ দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন কি জন্য?

ন্যায়শাস্ত্রী। মহারাজ! দিল্লীর শেষ হিন্দুরাজা পৃথুরায়ের দুর্গ-প্রাচীর দেখা যাইতেছে।

শিবজী বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—এই সে পৃথুরায়ের দুর্গ! এই স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল! এই স্থানে দিল্লীর শেষ হিন্দুরাজা রাজ্যশাসন করিতেন? ন্যায়শাস্ত্রী, স্বপ্নের ন্যায় সে দিন গত হইয়াছে! দিবসের আলোক গত হয়, পুনরায় দিবস আইসে, শীতকালে বিলুপ্ত পত্র কুসুম বসন্তে আবার দেখা যায়। আমাদের গৌরবদিন কি আর দেখা দিবে না?

ন্যায়শাস্ত্রী। ভগবানের প্রসাদে সকলই হইতে পারে। ভগবান্ করুন, আপনার বাহুবলে যেন আমরা পুনরায় গৌরবলাভ করিতে পারি।

শিবজী। ন্যায়শাস্ত্রী! বাল্যকালে কঙ্কণপ্রদেশের কথকদিগের যে কথা শুনিতাম, চাঁদ কবির যে গীত শুনিতাম, তাহা কি আপনার

মনে পড়ে? ঐ ভগ্ন দুর্গ প্রাসাদপূর্ণ ও বহুজনাকীর্ণ ছিল, পতাকা ও তোরণশোভিত একটি বিস্তীর্ণ নগর ছিল! রাজসভায় যোদ্ধবর্গ-বেষ্টিত হইয়া রাজা বসিয়া আছেন, বাহিরে যতদূর দেখা যায়, পথে, ঘাটে, বাটীতে, প্রাঙ্গণে ও নদীতীরে নাগরিকগণ আনন্দে উৎসব করিতেছে! বহু বিস্তীর্ণ বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে, উদ্যানে লোকে আনন্দে নৃত্যগীত করিতেছে, সরোবর হইতে ললনাগণ কলস করিয়া জল লইয়া যাইতেছে, প্রাসাদসম্মুখে সেনাগণ সসজ্জ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, অশ্ব, হস্তী, রথ, দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বাদ্যকর সানন্দে বাদ্য করিতেছে! প্রভাতের সূর্য্য এই অপরূপ দৃশ্যের উপর সুন্দর রশ্মি বর্ষণ করিতেছেন, এমত সময়ে মহম্মদ ঘোরীর দূত রাজসভায় প্রবেশ করিল। সে কথা কি আপনার মনে পড়ে?

ন্যায়শাস্ত্রী। রাজন্! চাঁদ কবির কথা মনে আছে, কিন্তু আপনি আর একবার সে কথা বলুন। আপনার মুখে সে কথা বড় মিষ্ট লাগিতেছে।

শিবজী। মুসলমান দূত পৃথুরায়কে বলিল,—মহারাজ! মহম্মদ ঘোরী আপনার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ মাত্র লইয়া সন্ধিস্থাপন করিতে সম্মত আছেন, তাহাতে আপনার কি মত?

মহানুভব পৃথুরায় উত্তর করিলেন,—যবে সূর্য্যদেব আকাশে অন্য একটি সূর্য্যকে স্থান দিবেন, পৃথুরায় সেই দিন স্বীয় রাজ্যে অন্য রাজাকে স্থান দিবেন!

মুসলমান দূত পুনরায় বলিল,—মহারাজ! আপনার শ্বশুর মহাশয় মহম্মদ ঘোরীর সহিত সন্ধি করিয়াছেন, আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমান ও রাঠোর সৈন্য একত্র দেখিতে পাইবেন।

পৃথুরায় উত্তর করিলেন,—শ্বশুর মহাশয়কে প্রণাম জানাইবেন ও

বলিবেন, আমিও স্বয়ং যাইতেছি, অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিব।

অবিলম্বে চৌহান সৈন্য প্রশস্ত দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, তিরৌরীর যুদ্ধে যবন ও রাঠোর সৈন্য পৃথুরায়ের সম্মুখে বায়ুতাড়িত ধূলিবৎ উড়িয়া গেল, আহত ঘোরী কষ্টে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল।

রঘুনাথ! সে দিন গিয়াছে, এক্ষণে চাঁদ কবির গীত কে গাইবে, কে শ্রবণ করিবে, তথাপি এ স্থানে দণ্ডায়মান হইলে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্মরণ করিলে, স্বপ্নের ন্যায় নব নব আশা মনে উদয় হয়। এই বিশাল কীর্ত্তিক্ষেত্র চিরদিন তিমিরাবৃত থাকিবে না, ভারতের গৌরবের দিন এখনও উদিত হইবে। জগদীশ্বর রুগ্নকে আরোগ্য দান করেন, দুর্ব্বলকে বলদান করেন, জীর্ণ পদদলিত ভারত-সন্তানকে তিনি এখনও উন্নত করিতে পারেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

রামসিংহ

বাপের সদৃশ বীর, সমান সমান।

কাশীরাম দাস।

শিবজী ও তাঁহার পুত্র শম্ভুজী শিবিরে উপবেশন করিয়া আছেন, এমত সময় একজন প্রহরী আসিয়া বলিল,—মহারাজ! জয়সিংহের পুত্র রামসিংহ অন্য একজন সৈনিকের সহিত সম্রাট্ আদেশে মহারাজকে দিল্লীতে আহ্বান করিতে আসিয়াছে। উভয়ে দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন।

শিবজী। সাদরে লইয়া আইস।

উগ্রস্বভাব শম্ভুজী বলিলেন,—পিতঃ! আপনাকে আহ্বান করিতে আরংজীব কেবল দুইজন মাত্র দূত পাঠাইয়াছেন?

শিবজীও আরংজীবকৃত এই অবমাননায় মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু সে ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। ক্ষণেক পরেই রামসিংহ শিবিরে প্রবেশ করিলেন। রাজপুত যুবক পিতার ন্যায় তেজস্বী ও বীর, পিতার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যপ্রিয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী যুবকের মুখমণ্ডল দেখিয়াই তাঁহার উদার ও অকপট চরিত্র বুঝিলেন, তথাপি আরংজীবের কোন কু-অভিসন্ধি আছে কি না, দিল্লী-প্রবেশে বিপদ আছে কি না, কথাচ্ছলে জানিবার প্রয়াস করিলেন। রামসিংহ পিতার নিকট শিবজীর বীর্য্য ও প্রতাপের কথা অনেক

শুনিয়াছিলেন, সাবস্ময়নয়নে মহারাষ্ট্র বীরপুরুষের দিকে অবলোকন করিলেন। শিবজী রামসিংহকে আলিঙ্গন ও যথোচিত সম্মানপুরঃসর অভ্যর্থনা করিলেন।

ক্ষণেক পরে রামসিংহ কহিলেন,—মহারাজকে পূর্ব্বে আমি কখন দেখি নাই, কিন্তু পিতার নিকট আপনার যশোবার্ত্তা বিস্তর শুনিয়াছি, অদ্য আপনার ন্যায় স্বদেশপ্রিয় ধর্ম্মপরায়ণ বীরপুরুষকে দেখিয়া আমার নয়ন সার্থক হইল।

শিবজী। আমারও অদ্য পর সৌভাগ্য। আপনার পিতার তুল্য বিচক্ষণ ধর্ম্মপরায়ণ সত্যপ্রিয় বীরপুরুষ রাজস্থানেও বিরল। দিল্লী আগমনের সময় যে তাঁহার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল, ইহা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই।

রামসিংহ। রাজন্! দিল্লী আগমন করিতেছেন শুনিয়াই সম্রাট্ আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, কখন নগর প্রবেশ করিতে অভিলাষ করেন?

শিবজী। প্রবেশ সম্বন্ধে আপনি কি পরামর্শ দেন?

অকপট স্বরে রামসিংহ উত্তর করিলেন,—আমার বিবেচনায় এই ক্ষণেই প্রবেশ করা বিধেয়, বিলম্ব হইলে বায়ু উত্তপ্ত হইবে, গ্রীষ্ম দুঃসহনীয় হইবে।

রামসিংহের সরল উত্তর শুনিয়া শিবজী হাস্য করিয়া বলিলেন,—সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। আপনি দিল্লীতে অধুনা বাস করিতেছেন, আপনার নিকট কোন সংবাদ অবিদিত নাই। আমার পক্ষে দিল্লী-প্রবেশ কতদূর বুদ্ধির কার্য্য, তাহা আপনি অবশ্যই জানেন।

উদারচেতা রামসিংহ শিবজীর মনোগত ভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—ক্ষমা করুন, আমি আপনার উদ্দেশ্য পূর্ব্বে বুঝিতে

পারি নাই। আমি আপনার অবস্থায় হইলে চিরকাল পর্ব্বতে বাস করিতাম, নিজের অসির উপর নির্ভর করিতাম, অসির তুল্য প্রকৃত বন্ধু আর নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমি অজ্ঞমাত্র, পিতা আপনাকে যখন দিল্লী আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন, তখন আপনি আসিয়া ভালই করিয়াছেন। তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তাঁহার পরামর্শ কখন ব্যর্থ হয় না।

শিবজী বুঝিলেন, দিল্লীতে তাঁহাকে রুদ্ধ করিবার জন্য কোনও কল্পনা হয় নাই, অথবা যদি হইয়া থাকে, রামসিংহ তাহা জানেন না। তখন পুনরায় বলিলেন,—হাঁ। আপনার পিতাই আমাকে আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন, আমার আসিবার সময় তিনি আরও বাক্যদান করিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় আপনি অবগত আছেন।

রামসিংহ। আছি, দিল্লী আগমনে আপনার কোন বিপদ হইবে না, কোনও অনিষ্ট হইবে না, সে বিষয়ে তিনি আপনাকে বাক্যদান করিয়াছেন, সে বিষয়ে তিনি আমাকেও আদেশ করিয়াছেন।

শিবজী। তাহাতে আপনার মত কি ?

রামসিংহ। পিতার আদেশ অবশ্য পালনীয়। রাজপুতের বাক্য লঙ্ঘন হয় না। পিতার বাক্য যাহাতে লঙ্ঘন না হয়, আপনি নিরাপদে স্বদেশে যাইতে পারেন, সে বিষয়ে দাসের যত্নের কোন ত্রুটি হইবে না।

শিবজীর মন নিরুদ্বেগ হইল। আর সন্দেহ না করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—তবে আপনারই পরামর্শ গ্রহণ করিব। বিলম্ব করিলে বায়ু উত্তপ্ত হইবে। চলুন, এইক্ষণেই দিল্লী প্রবেশ করি।

অচিরে সকলে দিল্লীর অভিমুখে চলিলেন।

সমস্ত পথ পুরাতন মুসলমান-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষে পরিপূর্ণ। প্রথম মুসলমানেরা দিল্লী জয় করিয়া পৃথুরায়ের পুরাতন দুর্গের নিকট

আপনাদিগের রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,সুতরাং প্রথম সম্রাট্‌দিগের মস্‌জীদ, প্রাসাদ ও সমাধি-মন্দিরের ভগ্নাবশিষ্ট সেই স্থানে দৃষ্ট হয়, জগদ্বিখ্যাত কুতুবমিনার এইস্থানে নির্ম্মিত। কালক্রমে নূতন নূতন সম্রাট্‌ আরও উত্তরে নূতন নূতন প্রাসাদ ও রাজবাটী নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন, ক্রমে নগর উত্তরাভিমুখে চলিল। শিবজী যাইতে যাইতে কত প্রাসাদ, কত মস্‌জীদ ও মিনার, কত স্তম্ভ ও সমাধিমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিলেন, তাহা গণনা করিতে পারিলেন না। রামসিংহ শিবজীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন ও নানা স্থানের পরিচয় দিতে লাগিলেন, উভয়ে উভয়ের গুণের পরিচয় পাইলেন, উভয়ের মধ্যে বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী স্থির করিলেন, যদি দিল্লীতে কোনও বিপদ হয়, এক-জন প্রকৃত বন্ধু পাইব।

পথিমধ্যে লোদীবংশীয় সম্রাট্‌দিগের প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির সকল দৃষ্ট হইল, প্রত্যেক রাজার কবরের উপর এক একটি গম্বুজ ও অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। আফগানদিগের গৌরবসূর্য্য যখন অস্তমিত হয়, তখন এই স্থানে দিল্লী ছিল, পরে আরও উত্তরে সরিয়া গিয়াছে।

তাহার পর হুমায়ুনের প্রকাণ্ড সমাধি-মন্দির। তাহার পরে "চৌষট্‌ খম্বা", অর্থাৎ শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত চতুঃষষ্টিস্তম্ভযুক্ত প্রকাণ্ড সুন্দর অট্টালিকা। তাহার পশ্চাতে অসংখ্য গোরস্থান। পৃথুরায়ের দুর্গ হইতে আধুনিক দিল্লী পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে শিবজীর বোধ হইল যেন, সেই পথেই ভারতবর্ষের ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। এক একটি প্রাসাদ ও অট্টালিকা সেই ইতিহাসের এক একটি পত্র, এক একটি গোরস্থান এক একটি অক্ষর, করাল কাল সেই ইতিহাসলেখক, নচেৎ এরূপ অক্ষরে ইতিহাস কেন লিখিত হইবে ?

শিবজী আরও আসিতে লাগিলেন। দিল্লীর প্রাচীরের নিকট

আসিলে রামসিংহ সগর্ব্বে একটি মন্দির দেখাইয়া বলিলেন,—রাজন্! এই যে মন্দির দেখিতেছেন, পিতা জ্যোতিষগণনার্থ ঐ মানমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বহুদেশের পণ্ডিতেরা ঐ মন্দিরে আসিয়া রজনীতে নক্ষত্র গণনা করেন।

শিবজী। আপনার পিতা যেরূপ বীর, সেইরূপ বিজ্ঞ, জগতে এইরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন লোক অতি বিরল। শুনিয়াছি, পুণ্য কাশীধামেও তিনি ঐরূপ মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

দিল্লীর প্রাচীরের ভিতর প্রবেশ করিবার সময় শিবজীর ঈষৎ হৃৎকম্প হইল, তিনি অশ্ব থামাইলেন। একবার পশ্চাৎ দিকে চাহিলেন, একবার মনে চিন্তার উদয় হইল যে, এখনও স্বাধীন আছি, পরক্ষণেই বন্দী হইতে পারি। তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মপরায়ণ জয়সিংহের নিকট যে বাক্যদান করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইল, জয়সিংহের পুত্রের উদার মুখমণ্ডল দেখিলেন, নিজকোষে "ভবানী" নামক অসির দিকে দর্শন করিয়া দিল্লীদ্বার প্রবেশ করিলেন।

স্বাধীন মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা সেই মুহূর্ত্তে বন্দী হইলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

দিল্লীনগরী

ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা ;
নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক। * * *
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফলফুলে
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ ; বাতায়নে বাতী ;
জনস্রোতঃ রাজপথে বহিছে কল্লোলে।

মধুসূদন দত্ত।

দিল্লী অদ্য মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে! আরংজীব স্বয়ং জাঁকজমকপ্রিয় ছিলেন না, কিন্তু রাজকার্য্য সাধনার্থ সময়ে সময়ে জাঁকজমক আবশ্যক, তাহা বিশেষরূপে জানিতেন। অদ্য শিবজী দরিদ্র মহারাষ্ট্রদেশ হইতে বিপুল অর্থশালী মোগল রাজধানীতে আসিয়াছেন, মোগলদিগের ক্ষমতা, সম্পত্তি ও অর্থের প্রাচুর্য্য দেখিলে শিবজী আপন হীনতা বুঝিতে পারিবেন, মোগলদিগের সহিত যুদ্ধের অসম্ভাবিতা বুঝিতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্যে আরংজীব অদ্য প্রচুর জাঁকজমকের আদেশ দিয়াছিলেন। সম্রাটের আদেশে দিল্লীনগরী উৎসবের দিনে কুলললনার ন্যায় অপূর্ব্ববেশ ধারণ করিয়াছে!

শিবজী ও রামসিংহ একত্র রাজপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

পথ দিয়া অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক গমনাগমন করিতেছে, নগর লোকারণ্য হইয়াছে। বণিক্‌গণ বাজারে দোকানে বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য রাশি করিয়া রাখিয়াছে, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, বহুমূল্য স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার, অপূর্ব্ব খাদ্যসামগ্রী ও অপর্য্যাপ্ত গৃহানুকরণদ্রব্য দেখিতে দেখিতে শিবজী রাজপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। কোথাও গৃহের উপর নিশান উড়িতেছে, কোথাও সুপরিচ্ছদ গৃহস্থেরা বারান্দায় বসিয়া রহিয়াছে, কোথাও বা গবাক্ষ দিয়া কুলকামিনীগণ প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র যোদ্ধাকে দেখিতেছে। পথে অসংখ্য শকট, শিবিকা, হস্তী ও অশ্ব; রাজা, মন্সবদার, সেখ, আমীর ও ওমরাহগণ সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেছে। অশ্বারোহিগণ তীব্রবেগে যেন নগর কাঁপাইয়া যাইতেছে; সুন্দর অলঙ্কার ও রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া শুণ্ড নাড়িতে নাড়িতে গজেন্দ্রগমনে গজেন্দ্রগণ চলিয়া যাইতেছে; শিবিকাবাহকগণ হুহুঙ্কার শব্দে যেন আরোহীর পদমর্য্যাদা প্রচার করিয়া চলিয়া যাইতেছে! শিবজী এরূপ নগর কখনও দেখেন নাই, কোথায় পুনা বা রায়গড়!

যাইতে যাইতে রামসিংহ দূরে তিনটি শ্বেত গম্বুজ দেখাইয়া বলিলেন,—ঐ দেখুন, জুম্মা মস্‌জীদ! সম্রাট্‌ শাহজিহান জগতের অর্থ একত্র করিয়া ঐ উন্নত প্রশস্ত মস্‌জীদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ওরূপ মস্‌জীদ জগতে আর নাই।

শিবজী বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে দেখিলেন, রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত মস্‌জীদের প্রাচীর বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া শোভা পাইতেছে, তাহার উপর সুন্দর শ্বেত প্রস্তর-বিনির্ম্মিত তিনটি গম্বুজ ও দুই দিকে দুই মিনার যেন গগন ভেদ করিয়া উঠিয়াছে!

এই অপরূপ মস্‌জীদের সম্মুখেই রাজপ্রাসাদ ও দুর্গের বিস্তীর্ণ রক্তবর্ণ প্রস্তর-বিনির্ম্মিত প্রাচীর দৃষ্ট হইল। দুর্গের পশ্চাতে যমুনা নদী, সম্মুখে

বিস্তীর্ণ রাজপথ শব্দপূর্ণ ও লোকারণ্য। সেই স্থানের ন্যায় সমারোহপূর্ণ আর একটি স্থানও ভারতবর্ষে ছিল না, জগতে ছিল কি না সন্দেহ। দুর্গের প্রাচীরের উপর শত শত নিশান বায়ুপথে উড়িতেছে, যেন জগতে মোগলসম্রাটের ক্ষমতা ও গৌরব প্রকাশ করিতেছে। দুর্গদ্বারে একজন প্রধান মন্সবদারের প্রশস্ত শিবির, মন্সবদার দুর্গদ্বার রক্ষা করিতেছেন। দুর্গের বাহিরে সেনা রেখায় রেখায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বন্দুকের কিরীচশ্রেণী সূর্য্যালোকে ঝক্‌মক্ করিতেছে, প্রত্যেক কিরীচ হইতে রক্তবস্ত্রের নিশান বায়ুমার্গে উড়িতেছে। দুর্গসম্মুখে অসংখ্য লোক অসংখ্য প্রকার দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিতে আসিয়াছে, দুর্গপ্রাচীর হইতে মস্‌জীদ-প্রাচীর পর্য্যন্ত সমস্ত পথ শব্দপূর্ণ ও লোকপূর্ণ। অশ্বারোহী, গজারোহী ও শিবিকারোহী, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান পদাভিষিক্ত পুরুষগণ, বহুলোক-সমন্বিত হইয়া বড় সমারোহে সর্ব্বদাই দুর্গদ্বারের ভিতর যাইতেছেন বা বাহিরে আসিতেছেন। তাঁহাদিগের পরিচ্ছদশোভায় নয়ন ঝলসিত হইতেছে, লোকের কলরবে কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে। সকল শব্দকে নিমগ্ন করিয়া মধ্যে মধ্যে দুর্গের মধ্য হইতে কামানের শব্দ নগর কম্পিত করিতেছে, ও রাজাধিরাজ আলমগীর অর্থাৎ জগতের অধিপতির ক্ষমতাবার্ত্তা জগৎসংসারে প্রচার করিতেছে। বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে অনেকক্ষণ এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া অবশেষে শিবজী রামসিংহের সহিত দুর্গদ্বার অতিক্রম করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ করিয়া শিবজী যাহা দেখিলেন, তাহাতে আরও বিস্মিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ "কারখানায়" অসংখ্য শিল্পকারগণ রাজ-ব্যবহার্য্য নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে; অপূর্ব্ব সুবর্ণ ও রৌপ্যখচিত বস্ত্র, মলমল, মসলিন বা ছিট; বহুমূল্য গালিচা, চন্দ্রাতপ, তাম্বু বা পর্দ্দা; সুন্দর পরিধেয় উষ্ণীষ, শাল বা গাত্রাবরণ; অপরূপ সুবর্ণ ও

মণিমাণিক্যের বেগমপরিধেয় অলঙ্কার; সুন্দর চিত্র, সুন্দরকারুকার্য্য, সুন্দর শ্বেত প্রস্তরের গৃহানুকরণ দ্রব্য; রাশি রাশি নীল, পীত, রক্তবর্ণ বা হরিদ্বর্ণ প্রস্তরের নানারূপ খেলনা দ্রব্য;— কত বর্ণনা করিব! ভারত-বর্ষে যত অপূর্ব্ব শিল্পকার ছিল, সম্রাট্ আদেশে তাহারা মাসিক বেতন পাইয়া প্রতিদিন দুর্গে কার্য্য করিতে আসিত। সম্রাট্ রাজকার্য্যার্থ বা নিজ প্রয়োজনের জন্য যে কোন বস্তু আবশ্যক বোধ করিতেন, বিলাস-প্রিয়া বেগমগণ যতরূপ অপূর্ব্ব দ্রব্য আদেশ করিতেন, প্রাসাদবাসী-দিগের যত প্রকার সামগ্রী প্রয়োজন হইত, তৎসমস্তই এই স্থানে প্রস্তুত হইত।

শিবজী এ সমস্ত দেখিবার সময় পাইলেন না। অসংখ্য লোকের মধ্য দিয়া "দেওয়ান আম" নামক উন্নত প্রশস্ত রক্তবর্ণ-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত প্রাসাদের নিকট আসিলেন। সম্রাট্ সচরাচর এই স্থানে সভার অধি-বেশন করিতেন, কিন্তু অদ্য যেন শিবজীকে প্রাসাদের সমস্ত গৌরব দেখাইবার জন্যই সুন্দর শ্বেত প্রস্তরনির্ম্মিত নানারূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত এবং জগতে অতুল্য "দেওয়ান খাস" নামক প্রাসাদে সভার অধিবেশন করিয়াছিলেন। শিবজী সেই স্থানে যাইয়া দেখিলেন, প্রাসা-দের ভিতর রত্ন-মাণিক্য-বিনির্ম্মিত সূর্য্যরশ্মি-প্রতিঘাতী ময়ূর-সিংহাসনের উপর সম্রাট্ আরংজীব উপবেশন করিয়া আছেন। সম্রাটের চারিদিকে রৌপ্য-বিনির্ম্মিত রেল, রেলের বাহিরে ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য রাজা, মনসবদার, ওমরাহ ও সেনাপতিগণ নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। রামসিংহ শিবজীর পরিচয় দান করিয়া রাজসদনে উপস্থিত হইলেন।

শিবজী অদ্য দিল্লী নগরের অসাধারণ শোভা দেখিয়াই আরংজীবের উদ্দেশ্য অনুমান করিয়াছিলেন, এক্ষণে রাজসদনে আসিয়া সেই বিষয় আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। যিনি বিংশতি বৎসর যুদ্ধ করিয়া

আপনার ও স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি সম্প্রতি সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া যুদ্ধে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন, যিনি মহারাষ্ট্রদেশ হইতে সম্রাটকে দর্শন করিতে দিল্লী পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, সম্রাট্ তাঁহাকে কিরূপে আহ্বান করিলেন ? শিবজী অন্য একজন সামান্য কর্ম্মচারীর ন্যায় নম্রভাবে রাজসদনে দণ্ডায়মান ! শিবজীর ধমনীতে উষ্ণ শোণিত বহিতে লাগিল, কিন্তু এক্ষণে তিনি নিরুপায় ! সামান্য রাজকর্ম্ম-চারীর ন্যায় সম্রাট্‌কে "তসলীম" করিয়া রীতিমত "নজর" দান করিলেন। আরংজীবের দূর উদ্দেশ্য সাধন হইল,—জগৎসংসার জানিল, শিবজী জানিল, শিবজী ও আরংজীব সমকক্ষ নহেন, দাসের প্রভুর সহিত, ক্ষীণের বলিষ্ঠের সহিত যুদ্ধ করা মূর্খতা।

এই উদ্দেশ্যসাধনার্থ আরংজীব "নজর" গ্রহণ করিয়া, কোনও বিশেষ সমাদর না করিয়া শিবজীকে "পাঁচহাজারী" অর্থাৎ পঞ্চ সহস্র সেনার সেনাপতিদিগের মধ্যে স্থান দিলেন। শিবজীর নয়ন তখন অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত হইল, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি ওষ্ঠের উপর দন্তস্থাপন করিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিলেন,—শিবজী পাঁচহাজারী? সম্রাট্ যখন মহারাষ্ট্রে যাইবেন, দেখিবেন, শিবজীর অধীনে কত জন পাঁচহাজারী আছে; দেখিবেন, তাহারা দুর্ব্বল হস্তে অসিধারণ করে না !

আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন হইলে সভাভঙ্গ হইল। সম্রাট্ গাত্রো-খান করিয়া পার্শ্বস্থ উচ্চ শ্বেত প্রস্তরবিনির্ম্মিত বেগমমহলে যাইলেন। তখন নদীর স্রোতের ন্যায় দুর্গ হইতে অসংখ্য লোকস্রোত নির্গত হইতে লাগিল। যে যাহার আবাসস্থানে যাইল, সাগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ দিল্লী-নগরে অচিরে লোকস্রোত লীন হইয়া গেল।

শিবজীর আবাসের জন্য একটি বাটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। রোষে,

অভিমানে সন্ধ্যার সময় শিবজী সেই বাটীতে আসিলেন, একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পর রাজসদন হইতে সংবাদ আসিল যে, অদ্য সম্রাটের সম্মুখে শিবজী রুষ্ট হইয়া যে কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সম্রাট্ তাহা শুনিয়াছেন। সম্রাট্ শিবজীকে দণ্ড দিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু ভবিষ্যতে শিবজী রাজসাক্ষাৎ পাইবেন না, রাজসভায় স্থান পাইবেন না।

শিবজী বুঝিলেন, ভবিষ্যৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে। ব্যাধ যেরূপ সিংহকে ধরিবার জন্য জাল পাতে, ক্রূর দুষ্টবুদ্ধি আরংজীব সেইরূপ ধীরে ধীরে শিবজীকে বন্দী করিবার জন্য মন্ত্রণাজাল পাতিতেছেন। শিবজী মনে মনে ভাবিলেন,—এ জাল বিদীর্ণ করিয়া কি পুনরায় স্বাধীনতালাভ করিতে পারিব ? হা সীতাপতি গোস্বামিন্! চিরযুদ্ধের পরামর্শ তুমিই দিয়াছিলে, তোমার গরীয়সী কথা এখনও আমার কর্ণে শব্দিত হইতেছে! আরংজীব! সাবধান, শিবজী এ পর্য্যন্ত তোমার নিকট সত্যপালন করিয়াছে, তাহার সহিত চতুরতা করিও না, কেন না, শিবজীও সে বিদ্যায় শিশু নহেন। যদি কর, ভবানী সাক্ষী থাকুন, মহারাষ্ট্রদেশে যে সমরানল প্রজ্বলিত করিব, তাহাতে এই সুন্দর দিল্লীনগর, এই বিপুল মুসলমান-সাম্রাজ্য একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইবে!

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

নিশীথে আগন্তুক

কে তুমি—বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ।

মধুসূদন দত্ত।

কয়েক দিনের মধ্যে শিবজী আরংজীবের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। শিবজী আর স্বদেশে না যাইতে পারেন, চিরকাল দিল্লীতে বন্দী হইয়া থাকেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা আর কখনও স্বাধীন না হয়, এই আরংজীবের উদ্দেশ্য। শিবজী সম্রাটের এই কপটাচরণে যৎপরোনাস্তি রুষ্ট হইলেন, কিন্তু রোষ গোপন করিয়া দিল্লী হইতে প্রস্থানের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শিবজীর চিরবিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্ত ন্যায়শাস্ত্রী সর্ব্বদা শিবজীর সহিত এই বিষয় আলোচনা করিতেন ও নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেন। অনেক যুক্তি করিয়া উভয়ে স্থির করিলেন যে, প্রথমে দেশ প্রত্যাগমনের জন্য সম্রাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করা বিধেয়, অনুমতি না দিলে অন্য উপায় উদ্ভাবন করা যাইবে।

ন্যায়শাস্ত্রী পণ্ডিতপ্রবর ও বাক্‌পটুতায় অগ্রগণ্য। তিনি শিবজীর আবেদন রাজসদনে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন। আবেদনপত্রে শিবজী যে যে কারণে দিল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তারিত-রূপে লিখিত হইল। শিবজী মোগল সৈন্যের সহায়তা করিয়া যে যে

কার্য্যসাধন করিয়াছিলেন, আরংজীব যে যে বিষয় অঙ্গীকার করিয়া শিবজীকে দিল্লীতে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাও স্পষ্টাক্ষরে দর্শিত হইল। তাহার পর শিবজী প্রার্থনা করিলেন যে,—আমি যে কার্য্য-সাধন করিতে অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহা এখনও সাধন করিতে প্রস্তুত আছি, বিজয়পুর ও গলখন্দ রাজ্য সম্রাটের অধীনে আনিতে যতদূর সাধ্য সাহায্য করিব। অথবা যদি সম্রাট্ আমার সহায়তা না গ্রহণ করেন, অনুমতি দিলে আমি নিজের জায়গীরে প্রত্যাবর্ত্তন করি, কেন না, হিন্দুস্থানের জলবায়ু আমার পক্ষে, আমার সঙ্গিগণ ও আমার সৈন্যগণের পক্ষে যৎপরোনাস্তি অস্বাস্থ্যকর, এ দেশে আমাদের থাকা সম্ভব নহে।

রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রী এইরূপ আবেদনপত্র সম্রাট্সদনে উপস্থিত করিলেন। সম্রাট্ উত্তর পাঠাইলেন, সে উত্তরে নানা কথা লিখিত আছে, কিন্তু শিবজীর প্রত্যাগমনের অনুমতি নাই। শিবজী স্পষ্ট বুঝিলেন, তাঁহাকে চিরবন্দী করাই সম্রাটের একমাত্র উদ্দেশ্য। তখন দিন দিন পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

উপরি-উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর একদিন সন্ধ্যার সময় শিবজী গবাক্ষপার্শ্বে চিন্তিতভাবে উপবেশন করিয়া আছেন। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু এখনও অন্ধকার হয় নাই, রাজপথ দিয়া লোকের স্রোত এখনও অবিরত বহিয়া যাইতেছে। কত দেশের লোক কতরূপ পরিচ্ছদে কত কার্য্যে এই রাজধানীতে আসিয়াছে। কখন কখন দুই একজন শ্বেতাঙ্গ মোগল সদর্পে চলিয়া যাইতেছে। অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ শত শত দেশীয় হিন্দু বা মুসলমান সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, এবং দুই একজন কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রীও কখন কখন দেখা যাইতেছে। পারস্য, আরব, তাতার ও তুরস্ক দেশ হইতে বণিক্ বা মসাফের এই সমৃদ্ধ নগরীতে গমনাগমন করিতেছে, মুসলমান বা হিন্দু সেনাপতি, রাজা বা

মন্সবদার বহুলোক-সমন্বিত হইয়া মহাসমারোহে হস্তী বা অশ্ব বা শিবিকায় আরোহণ করিয়া যাইতেছেন। সৈনিক পুরুষগণ হাস্যকৌতুক করিতে করিতে পথ অতিবাহন করিতেছে, বিক্রেতৃগণ আপন আপন পণ্যদ্রব্য মস্তকে লইয়া চীৎকার করিয়া যাইতেছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সহস্র লোক সহস্র কার্য্যে জলের স্রোতের ন্যায় যাতায়াত করিতেছে।

ক্রমে এই জনস্রোত হ্রাস পাইতে লাগিল। দিল্লীর অসংখ্য দোকানদার আপন আপন দোকান বন্ধ করিতে লাগিল। নগরের অনন্ত কলরব ক্রমে ক্রমে থামিয়া গেল, দুই একটি বাটীর গবাক্ষভিতর হইতে দীপশিখা দেখা যাইতে লাগিল, দূরস্থ অট্টালিকাগুলি ক্রমে অন্ধকারে আবৃত হইতে লাগিল। আকাশে দুই একটি তারা দেখা দিল, পশ্চিমদিকে রক্তিমচ্ছটা আর নাই। শিবজী পূর্ব্বদিকে চাহিলেন, দেখিলেন, শান্ত বিস্তীর্ণ দিগন্ত-প্রবাহিণী যমুনানদী সায়ংকালে নিস্তব্ধতায় অনন্ত সাগরাভিমুখে বহিয়া যাইতেছে।

সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে জুম্মা মসজীদ হইতে আজানের পবিত্র শব্দ উত্থিত হইল, যেন সে গম্ভীর শব্দ ধীরে ধীরে চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল, যেন ধীরে ধীরে মানবের মন আকর্ষণ করিয়া গগনে উত্থিত হইতে লাগিল! শিবজী মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া সেই সায়ংকালীন সুদূর-উচ্চারিত গম্ভীর শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অন্ধকারে পুনরায় চাহিলেন, কেবল জুম্মা মসজীদের শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত গম্বুজগুলি সুনীল আকাশপটে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কেবল প্রসাদের রক্তবর্ণ উন্নত প্রাচীর দূরে পর্ব্বতশ্রেণীর মত দৃষ্ট হইতেছে। এতদ্ভিন্ন সমস্ত নগর অন্ধকারে আচ্ছাদিত, নৈশ নিস্তব্ধতায় স্তব্ধ।

রজনী গভীর হইল, কিন্তু শিবজীর চিন্তাসূত্র এখনও ছিন্ন হইল না, কেন না, অদ্য পূর্ব্বকথা একে একে হৃদয়ে জাগরিত হইতেছিল।

বাল্যকালের সুহৃদ্বর্গ, বাল্যকালের আশা, ভরসা, উদ্যম, সাহসী ও উন্নত-চরিত্র পিতা শাহজী, পিতৃতুল্য বাল্যসুহৃদ্ দাদাজী কানাইদেব, গরীয়সী মাতা জীজী। সেই বীরমাতা শিশু শিবজীকে মহারাষ্ট্রের জয়ের কথা বলিয়াছিলেন, সেই বীরমাতা বালক শিবজীকে বীরকার্য্যে ব্রতী করিয়াছিলেন, সেই বীরমাতা শিবজীকে বিপদে আশ্বাস দিয়াছেন, আহবে উৎসাহ দিয়াছেন!

তাহার পর যৌবনের উন্নত আশা, উন্নত কার্য্য-পরম্পরা, দুর্গ-বিজয়, দেশ-বিজয়, রাজ্য-বিজয়, বিপদের পর বিপদ, যুদ্ধের পর যুদ্ধ, অপূর্ব্ব জয়লাভ, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, দুর্দ্দমনীয় উচ্চাভিলাষ! শিবজী ত্রিংশ বৎসর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন, প্রতি বৎসরই অপূর্ব্ব বিজয়ে বা অসম-সাহসী কার্য্যে অঙ্কিত ও সমুজ্জ্বল!

সে কার্য্যপরম্পরা কি ব্যর্থ? সে আশা কি মায়াবিনী? না, এখনও ভবিষ্যৎ-আকাশে গৌরব-নক্ষত্র লীন রহিয়াছে, এখনও ভারতবর্ষে মুসলমানরাজ্যের অবসান হইবে, হিন্দু রাজচক্রবর্ত্তীর মস্তকের উপর রাজছত্র উন্নত হইবে?

শিবজী এই প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, এরূপ সময় এক প্রহর রজনীর ঘণ্টা বাজিল, রাজপ্রাসাদের নাগরাখানা হইতে সে শব্দ উত্থিত হইয়া সমস্ত বিস্তীর্ণ নগর পরিব্যাপ্ত হইল, নৈশ নিস্তব্ধতায় গম্ভীর শব্দ বহুদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হইল। আকাশগর্ভে সে শব্দ এখনও লীন হয় নাই, এরূপ সময়ে শিবজী উন্মীলিত গবাক্ষদ্বারে একটি দীর্ঘ মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার আকাশপটে যেন একটি দীর্ঘ নিশ্চেষ্ট প্রতিকৃতি।

বিস্মিত হইয়া শিবজী দণ্ডায়মান হইলেন, সেই আকৃতির প্রতি তীব্র-দৃষ্টি করিলেন, কোষ হইতে অসি অর্দ্ধেক বহির্গত করিলেন। অপরিচিত

আগন্তুক তাহা গ্রাহ্য না করিয়া ধীরে ধীরে গবাক্ষ-ভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, ধীরে ধীরে ললাট ও ভ্রূযুগলের উপর নৈশ শিশির মোচন করিলেন।

শিবজী তীক্ষ্ণ নয়নে দেখিলেন, আগন্তুকের মস্তকে জটাজূট, শরীরে বিভূতি, হস্তে বা কোষে অসি বা ছুরিকা কোন প্রকার অস্ত্র নাই। তবে আগন্তুক শিবজীকে হত্যা করিবার জন্য সম্রাট্-প্রেরিত চর নহে। তবে আগন্তুক কে?

তীক্ষ্ণনয়নে অন্ধকার ঘরের ভিতরও শিবজীকে লক্ষ্য করিয়া আগন্তুক বলিলেন,—মহারাজের জয় হউক।

অন্ধকারে আগন্তুকের আকৃতি দেখিয়া শিবজী তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠশব্দ শ্রবণমাত্র চিনিতে পারিলেন। জগতে প্রকৃত বন্ধু অতি বিরল, বিপদের সময় এরূপ বন্ধুকে পাইলে হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠে। শিবজী সীতাপতি গোস্বামীকে প্রণাম ও সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন, একটি দীপ জ্বালিলেন, পরে ঔৎসুক্য সহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—বন্ধুপ্রবর! রায়গড়ের সংবাদ কি? আপনি তথা হইতে কবে কিরূপে আসিলেন? এত দূরেই বা কি প্রয়োজনে আসিলেন? অদ্য নিশীথে গবাক্ষদ্বার দিয়া আমার নিকট আসিবারই বা অর্থ কি?

সীতাপতি। মহারাজ! রায়গড়ের সংবাদ সমস্ত কুশল। আপনি যে সচিবপ্রবরের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহাতে অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এ বিষয় আমি বিশেষ জানি না, কেন না, আপনি রায়গড় পরিত্যাগ করিবার পরে অধিক কাল আমি তথায় ছিলাম না। পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছিলাম, আমার ব্রতসাধনার্থে আমাকে দেশে দেশে পর্য্যটন করিতে হয়, সেই প্রয়োজনেই মথুরা

প্রভৃতি তীর্থস্থানদর্শনার্থ দিল্লী আসিয়াছি। প্রভুর সহিত যখন সাক্ষাৎ করি, তখনই আমার সৌভাগ্য, দিবাই কি, নিশাই কি?

শিবজী। তথাপি কোন বিশেষ কারণ না থাকিলে গবাক্ষ দিয়া নিশীথে আসিতেন না। কি কারণ, প্রকাশ করিয়া বলুন।

সীতাপতি। নিবেদন করিতেছি। কিন্তু পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করি, প্রভু আসিয়া অবধি কুশলে আছেন?

শিবজী। কুশলে শারীরিক আছি, শত্রুমধ্যে মনের কুশল কোথায়?

সীতাপতি। প্রভুর সহিত ত সম্রাটের সন্ধি আছে, আপনার শত্রু কোথায়?

শিবজী। সর্পের সহিত ভেকের সন্ধি কতক্ষণ স্থায়ী? সীতাপতি! আপনি অবশ্যই সমস্ত অবগত আছেন, আর আমাকে লজ্জা দিবেন না। যদি রায়গড়ে আপনার পরামর্শ শুনিতাম, তাহা হইলে কঙ্কণদেশের পর্ব্বত ও উপত্যকার মধ্যে অদ্যাপি স্বাধীন থাকিতে পারিতাম, খল সম্রাটের কথায় বিশ্বাস করিয়া দিল্লীনগরে বন্দী হইতাম না।

সীতাপতি। প্রভু, আত্মতিরস্কার করিবেন না, মনুষ্যমাত্রেই ভ্রান্তির অধীন, এ জগৎ ভ্রমপরিপূর্ণ। বিশেষ এ বিষয়ে আপনার দোষমাত্র নাই, আপনি সন্ধিবাক্যে বিশ্বাস করিয়া, সদাচরণ প্রদর্শন করিয়া এ স্থানে আসিয়াছেন, যিনি অসদাচরণে ও কপটাচরণে দোষী, জগদীশ্বর অবশ্য তাঁহাকেই দণ্ড দিবেন। প্রভু! খলতার জয় নাই, অদ্য আরংজীব যে পাপ করিয়া আপনাকে রুদ্ধ করিয়াছেন, সেই পাপে সবংশে নিধন হইবেন। মহারাজ! আপনি রায়গড়ে যে কথা বলিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রদেশে সে কথা এখনও কেহ বিস্মৃত হয় নাই; আরংজীব যদি কপটাচরণ করেন, তবে মহারাষ্ট্রদেশে যে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইবে, সমস্ত মোগল-সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে।

উৎসাহে, উল্লাসে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে লাগিল, তিনি বলিলেন, সীতাপতি! সে ভরসা এখনও লোপ হয় নাই। এখনও আরংজীব দেখিবেন, মহারাষ্ট্র-জীবন লোপ পায় নাই। কিন্তু হায়! যে সময়ে আমার বীরাগ্রগণ্য সৈন্তেরা মোগলদিগের সহিত তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হইবে, সে সময়ে আমি কি দূর দিল্লীনগরে নিশ্চেষ্ট বন্দিস্বরূপ থাকিব?

সীতাপতি। যবে গগনসঞ্চারী বায়ুকে আরংজীব জালমধ্যে রুদ্ধ করিতে পারিবেন, তখন আপনাকে দিল্লীর প্রাচীরমধ্যে বন্দী রাখিতে পারিবেন, তাহার পূর্ব্বে নহে।

শিবজী ঈষৎ হাস্ত করিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—তবে বোধ করি, আপনি কোন পলায়নের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাই বলিবার জন্য এরূপ গুপ্তভাবে অদ্য রজনীতে আমার গৃহে আসিয়াছেন।

সীতাপতি। প্রভু তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রভুর নিকট কিছুই গোপন রাখিতে পারি, এরূপ সম্ভাবনা নাই।

শিবজী। সে উপায় কি?

সীতাপতি। অন্ধকার রজনীতে প্রভু অনায়াসে ছদ্মবেশে গৃহ হইতে বাহির হইতে পারেন, দিল্লীর চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, কিন্তু পূর্ব্বদিকে এক স্থানে সেই প্রাচীরে লৌহশলাকা স্থাপিত হইয়াছে, তদ্দারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা মহারা য় বীরের অসাধ্য নহে। অপর পার্শ্বে ক্ষুদ্র তরীতে আট জন মাল্লা আছে, নিমেষমধ্যে মথুরায় পৌঁছিবেন। তথায় প্রভুর অনেক বন্ধু আছেন, অনেক হিন্দু দেবালয়ে অনেক ধর্ম্মাত্মা পুরোহিত আছেন, তথা হইতে প্রভু অনায়াসে স্বদেশে যাইতে পারিবেন।

শিবজী। আমি আপনার উদ্যোগে তুষ্ট হইলাম, আপনি যে প্রকৃত বন্ধু, তাহার আর একটি নিদর্শন পাইলাম। কিন্তু প্রাচীর

উল্লঙ্ঘনের সময় যদি কেহ আমাকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে পলায়ন দুঃসাধ্য, আরংজীবের হস্তে মৃত্যু নিশ্চয়।

সীতাপতি। পাচীরের যে স্থানে লৌহশলাকা দেওয়া আছে, তাহার অনতিদূরে আপনার সেনার মধ্যে দশজন তীরন্দাজ ছদ্মবেশে লুক্কায়িত আছে। যদি কেহ প্রভুকে দেখিতে পায় বা গতিরোধ করে, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।

শিবজী। ভাল, নৌকায় গমনকালে তীরস্থ কোন প্রহরী যদি সন্দেহ প্রযুক্ত নৌকা ধরিতে চাহে ?

সীতাপতি। অষ্টজন ছদ্মবেশী নৌকাবাহক আপনারই অষ্ট জন যোদ্ধা। তাহাদিগের শরীর বর্ম্মাচ্ছাদিত, তূণ পরিপূর্ণ। সহসা নৌকা কেহ রোধ করিতে পারে. তাহার সম্ভাবনা নাই।

শিবজী। মথুরা পৌঁছিয়া যদি প্রকৃত বন্ধু না পাই ?

সীতাপতি। আপনার পেশোয়ার ভগিনীপতি মথুরায় আছেন, তিনি আপনার চিরপরিচিত ও বিশ্বস্ত, তাহা আপনি জানেন। আমি অদ্য তাঁহার নিকট হইতে আসিতেছি। তিনি সমস্ত প্রস্তুত রাখিয়াছেন, তাঁহার পত্র পাঠ করুন।

বস্ত্রের ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া সীতাপতি শিবজীর হস্তে দিলেন। শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া পত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন,—আপনি পাঠ করিয়া শুনান।

সীতাপতি লজ্জিত হইলেন, তাঁহার তখন স্মরণ হইল যে, শিবজী আপন নাম লিখিতেও জানিতেন না, কখনও লেখাপড়া শিখেন নাই।

সীতাপতি পত্রপাঠ করিয়া শুনাইলেন। যাহা যাহা আবশ্যক, মুরেশ্বরের কুটুম্ব সমস্ত স্থির করিয়াছেন, পত্রে বিস্তীর্ণ লেখা আছে।

শিবজী বলিলেন,—গোস্বামিন্! আপনার সমস্ত জীবন যাগযজ্ঞে

অতিবাহিত হইয়াছে, কখনই বোধ হয় না। শিবজীর প্রধান মন্ত্রীও আপনা অপেক্ষা সুন্দররূপে উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিত না। কিন্তু এখনও একটি কথা আছে। আমি পলাইলে আমার পুত্র কোথায় থাকিবে, আমার বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্ত ও প্রিয়সুহৃদ্ তন্নজী মালশ্রী কোথায় থাকিবে? আমার বিশ্বস্ত সৈন্যগণই বা কিরূপে আরংজীবের কোপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে?

সীতাপতি। আপনার পুত্র, প্রিয়সুহৃদ্ ও মন্ত্রিবর আপনার সহিত অদ্য রজনীতে যাইতে পারে। আপনার সেনাগণ দিল্লীতে থাকিলে হানি নাই, আরংজীব তাহাদিগকে লইয়া কি করিবেন, অগত্যা ছাড়িয়া দিবেন।

শিবজী। সীতাপতি! আপনি আরংজীবকে জানেন না; তিনি ভ্রাতৃদিগকে বধ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।

সীতাপতি। যদি আপনার সেনাগণের উপর কঠোর আদেশ দেন, কোন্ মহারাষ্ট্রসেনা আপনার নিরাপদবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া উল্লাসের সহিত প্রাণ বিসর্জ্জন না করিবে?

শিবজী ক্ষণেক নীরবে চিন্তা করিলেন, পরে মহানুভব ধীরে ধীরে বলিলেন,—গোস্বামিন্! আমি আপনার চেষ্টা, আপনার উদ্যোগের জন্য আপনার নিকট চিরবাধিত রহিলাম, কিন্তু শিবজী তাহার বিশ্বস্ত ও চিরপালিত ভৃত্যদিগকে বিপদে রাখিয়া আপনার উদ্ধার চাহে না, এরূপ ভীরুতার কার্য্য কখনও করিবে না। সীতাপতি! অন্য উপায় উদ্ভাবন করুন, নচেৎ চেষ্টা ত্যাগ করুন।

সীতাপতি। অন্য উপায় নাই।

শিবজী। তবে সময় দিন, শিবজীর এই প্রথম বিপদ নহে, উপায় উদ্ভাবনে শিবজী কখনও পরাঙ্মুখ হয় নাই।

সীতাপতি। সময় নাই। অদ্য রজনীতে প্রভু পলায়ন করুন, নতুবা কল্য আপনার পলায়ন নিষিদ্ধ।

শিবজী। আপনি কোন্ যোগবলে এরূপ জানিলেন, জানি না, কিন্তু আপনার কথা যদি যথার্থ ই হয়, তথাপি শিবজীর অন্য উত্তর নাই। শিবজী আশ্রিত প্রতিপালিত লোককে বিপদে রাখিয়া আত্মপরিত্রাণ করিবে না। গোস্বামিন্! এ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে।

সীতাপতি। প্রভু! বিশ্বাসঘাতকের শাস্তিদান করা ক্ষাত্রয়ের ধর্ম্ম, আরংজাবকে শাস্তিদান করুন। সেই দূর মহারাষ্ট্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, তথা হইতে সাগরতরঙ্গের ন্যায় সমরতরঙ্গ প্রবাহিত করুন। অচিরে আরংজীবের সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইবে, অচিরে এই পাপপূর্ণ সাম্রাজ্য অতল জলে মগ্ন হইবে!

শিবজী। সীতাপতি! যিনি ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, তিনি বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিবেন, আমার কথা অবধারণা করুন, তাহার অধিক বিলম্ব নাই। শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না।

সীতাপতি। প্রভু! এখনও এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করুন, এখনও বিবেচনা করিয়া আদেশ করুন, কল্য বিবেচনার সময় থাকিবে না, কল্য আপনি বন্দী।

শিবজী। তাহাই হউক। শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না শিবজীর এ প্রতিজ্ঞা অবিচলিত

সীতাপতি নীরব হইয়া রহিলেন। শিবজী চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার নয়নে জলবিন্দু। তখন সস্নেহে সীতাপতির হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—গোস্বামিন্! দোষ গ্রহণ করিবেন না। আপনার যত্ন, আপনার চেষ্টা, আপনার ভালবাসা আমি জীবন থাকিতে ভূলিব না। রায়গড়ে আপনার বীর পরামর্শ ও দিল্লীতে আমার উদ্ধারার্থ আপনার

এতদূর উদ্যোগ চিরকাল আমার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। আপনি আমার সহিত অবস্থান করুন, আপনার পরামর্শে শীঘ্র সকলেরই উদ্ধারসাধন করিব।

সীতাপতি। প্রভু! আপনার মিষ্টবাক্যে যথোচিত পুরস্কৃত হইলাম, জগদীশ্বর জানেন, আপনার সঙ্গে থাকা ভিন্ন আমার আর অন্য অভিলাষ নাই। কিন্তু আমার ব্রত অলঙ্ঘনীয়, ব্রতসাধনের জন্য নানা স্থানে নানা কার্য্যে যাইতে হয়, এখানে অবস্থিতি অসম্ভব।

শিবজী। এ কি অসাধারণ ব্রত জানি না, সীতাপতি! এ কি কঠোর ব্রত ধারণ করিয়াছেন?

সীতাপতি। সমস্ত এক্ষণে কিরূপে বিস্তার করিয়া বলিব, সাধনের একটি অঙ্গ এই যে, দিবসে রাজদর্শন নিষিদ্ধ।

শিবজী। ভাল, এ ব্রত কি উদ্দেশ্য ধারণ করিয়াছেন?

[illegible] । করিয়া সীতাপতি বলিলেন,—আমার ললাটে একটি অমঙ্গল লিখিত আছে, আমার ইষ্টদেবতা—যাঁহাকে আমি বাল্যকাল হইতে পূজা করিয়াছি, যাঁহার নাম জপ করিয়া জীবনধারণ করিয়াছি, বিধির নির্ব্বন্ধে তিনি আমার উপর বিমুখ। সেই অমঙ্গলখণ্ডনার্থ ব্রত ধারণ করিয়াছি।

শিবজী। এ অমঙ্গল কে গণনা করিয়া আপনাকে জানাইল? কেই বা আপনাকে অমঙ্গলখণ্ডনার্থ এ বিষম ব্রত ধারণ করিতে বলিল?

সীতাপতি। কার্য্যবশতঃ আমি স্বয়ংই এটি জানিতে পারিলাম, ঈশানী-মন্দিরে একজন আমাকে এই ব্রত ধারণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। যদি সফল হই, সমস্ত আপনার নিকট নিবেদন করিব, যদি অকৃতার্থ হই, তবে এ অকিঞ্চিৎকর জীবন ত্যাগ করিব। যাঁহার পূজার্থ জীবনধারণ করিতেছি, তিনি বিমুখ হইলে এ জীবনে আবশ্যক কি?

শিবজী। সীতাপতি! যাহা বলিলেন, যথার্থ। যাঁহার জন্য প্রাণপণ করি, যাঁহার জন্য আত্মসমর্পন করি, তাঁহার অসন্তোষ অপেক্ষা জগতে মর্ম্মভেদী দুঃখ আর নাই।

সীতাপতি। প্রভু! আপনি কি এ যাতনা কখনও ভোগ করিয়াছেন

শিবজী। জগদীশ্বর আমাকে মার্জ্জনা করুন, আমি একজন নির্দ্দোষ বীরপুরুষকে এই যাতনা দিয়াছি। সে বালকের কথা মনে হইলে এখনও আমার সময়ে সময়ে হৃদয়ে বেদনা হয়।

সীতাপাত। সে হতভাগার নাম কি ?

শিবজী বলিলেন,—রঘুনাথজী হাবিলদার।

ঘরে দীপ সহসা নির্ব্বাণ হইল। শিবজী প্রদীপ জ্বালিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় সীতাপতি বলিলেন,—দীপ অনাবশ্যক, বলুন, শ্রবণ করিতেছি।

শিবজী। আর কি বলিব। তিন বৎসর অতীত হইয়াছে, সেই বালকবেশী বীরপুরুষ আমার নিকট আইসে ও সৈনিকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহার বদনমণ্ডল উদার। সীতাপতি! আপনারই ন্যায় তাহার উন্নত ললাট ও উজ্জ্বল নয়ন ছিল। বালকের বয়স আপনা অপেক্ষা অল্প, আপনার ন্যায় তাহার বুদ্ধির প্রখরতা ছিল না, কিন্তু সেই উন্নত হৃদয়ে আপনার ন্যায়ই দুর্দ্দমনীয় বীরত্ব ও সাহস সর্ব্বদা বিরাজ করিত। আপনার বলিষ্ঠ উন্নত দেহ যখন দেখি, আপনার পরিস্কার কণ্ঠস্বর যখন শুনি, আপনার বীরোচিত বিক্রম যখন আলোচনা করি, সেই বালকের কথা সর্ব্বদাই হৃদয়ে জাগরিত হয়।

সীতাপতি। তাহার পর ?

শিবজী। সেই বালককে যে দিন প্রথম দেখিলাম, সেইদিন

প্রকৃত বীর বলিয়া চিনিলাম, সে দিন আমার নিজের একখানি অসি তাহাকে দান করিলাম, রঘুনাথ সে অসির অবমাননা করে নাই। বিপদের সময় সর্ব্বদা আমার ছায়ার ন্যায় নিকটে থাকিত, যুদ্ধের সময় দুর্দ্দমনীয় তেজে শত্রুরেখা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইত। এখনও বোধ হয়, তাহার সেই বীর আকৃতি, সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ, সেই উজ্জ্বল নয়ন আমি দেখিতে পাইতেছি।

সীতাপতি। তাহার পর?

শিবজী। সেই বালক এক যুদ্ধে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল, অন্য এক যুদ্ধে তাহারই বিক্রমে দুর্গজয় হইয়াছিল, অনেক যুদ্ধে সে আপন অসাধারণ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল।

সীতাপতি। তাহার পর?

শিবজী। আর জিজ্ঞাসা করেন কি জন্য? আমি একদিন ভ্রমে পতিত হইয়া সেই চিরবিশ্বাসী অনুচরকে অবমাননা করিয়া কার্য্য হইতে দূর করিয়া দিলাম। শেষ পর্য্যন্তও রঘুনাথ একটিও কর্কশ কথা উচ্চারণ করে নাই, যাইবার সময়ও আমার দিকে মস্তক নত করিয়া চলিয়া গেল।

শিবজীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, নয়ন দিয়া অশ্রু বহিয়া পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ পরে সীতা-পতি বলিলেন,—তাহাতে আক্ষেপের কারণ কি? দোষীর দণ্ডই রাজধর্ম্ম

শিবজী। দোষী? রঘুনাথের উন্নত চরিত্রে দোষ স্পর্শে না, আমি কি কুক্ষণে ভ্রান্ত হইলাম, জানি না। রঘুনাথের যুদ্ধস্থানে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল, আমি তাহাকে বিদ্রোহী মনে করিলাম। মহানুভব জয়সিংহ পরে এ বিষয় অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে,

তাঁহার একজন পুরোহিতের নিকট রঘুনাথ যুদ্ধপূর্ব্বে আশীর্ব্বাদ লইতে গিয়াছিল, সেই জন্যই বিলম্ব হইয়াছিল। নির্দ্দোষকে আমি অবমাননা করিয়াছিলাম, শুনিয়াছি, সেই অবমাননায় রঘুনাথ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যুদ্ধে সে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, আমি তাহার প্রাণবিনাশ করিয়াছি।

শিবজীর কথা সমাপ্ত হইল, তাঁহার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইল, তিনি অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে ডাকিলেন,—সীতাপতি!

কোনও উত্তর পাইলেন না। কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া প্রদীপ জ্বালিলেন; দেখিলেন, সীতাপতি ঘরের মধ্যে নাই।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

আরংজীব

সর্ব্বশাস্ত্র পড়ি বেটা হলি হতমূর্খ।
বল্লে কথা বুঝিস্ নাহি এই বড় দুঃখ॥

কৃত্তিবাস ওঝা।

পরদিন প্রায় একপ্রহর বেলার সময় শিবজীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি জাগরিত হইয়াই রাজপথে একটি গোলযোগ শুনিলেন। উঠিয়া গবাক্ষ দিয়া নিম্নদিকে চাহিলেন, যাহা দেখিলেন, তাহাতে চকিত ও স্তম্ভিত হইলেন।

দেখিলেন, বাটীর পশ্চাতে, দুই পার্শ্বে ও সম্মুখদ্বারে অস্ত্রহস্তে প্রহরিগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিশেষ পরিচয় না পাইলে প্রহরিগণ বাহিরের লোককে গৃহে প্রবেশ করিতে দিতেছে না, গৃহের লোককে বাহিরে যাইতে দিতেছে না। দেখিয়া সীতাপতির কথা স্মরণ হইল,—কল্য শিবজী পলাইতে পারিতেন, অদ্য তিনি আরংজীবের বন্দী!

তখন শিবজী বিশেষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। জানিলেন যে, তিনি সম্রাটের নিকট স্বদেশ যাইবার প্রার্থনা করিয়া অবধি আরংজীবের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল এবং সেই সন্দেহ প্রযুক্ত সম্রাট্ নগরের কোতোয়ালকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, শিবজীর বাটীর

চতুর্দ্দিকে দিবারাত্র প্রহরী থাকিবে, শিবজী বাটী হইতে কোথাও যাইলে সেই লোক সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিবে। শিবজী তখন বুঝিতে পারিলেন যে, সীতাপতি গোস্বামী আরংজীবের এই আদেশের কথা জানিতে পারিয়া পূর্ব্বেই শিবজীর পলায়নের সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন, এবং রজনী দ্বিপ্রহরের সময় সংবাদ দিতে আসিয়াছিলেন। শিবজী মনে মনে সীতাপতিকে সহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

আরংজীবের কপটাচারিতা এত দিনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। সম্রাট্ প্রথমে শিবজীকে বহু সমাদর পূর্ব্বক পত্র লিখিয়া দিল্লীতে আহ্বান করিলেন, শিবজী আসিলে তাঁহাকে রাজসভায় অবমাননা করিলেন, পরে রাজসভায় যাইতে নিষেধ করিলেন, তৎপরে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে নিষেধ করিলেন, তৎপরে প্রকৃত বন্দী করিলেন। কোন কোন সর্প গো-মহিষাদি ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বে যেরূপ আপন দীর্ঘ শরীর ভক্ষ্যের চতুর্দ্দিকে জড়াইয়া জড়াইয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে, পরে ক্রমে চুষিতে চুষিতে ধীরে ধীরে উদরস্থ করে, ক্রূর আরংজীবও সেইরূপ কপটতাজালে শিবজীকে ক্রমে সম্পূর্ণ অধীন করিয়া পরে ধীরে ধীরে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। মানসচক্ষে অতীত ও বর্ত্তমান সমুদায় ঘটনা মুহূর্ত্তমধ্যে দৃষ্টি করিয়া শিবজী শত্রুর নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন, বুঝিয়া রোষে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। দ্রুত পদবিক্ষেপে সেই গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অধরোষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপিত রহিয়াছে, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। অনেকক্ষণ পর অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিলেন,—আরংজীব! শিবজীকে এখনও জান না, চতুরতায় আপনাকে অদ্বিতীয় মনে কর, কিন্তু শিবজীও সে বিদ্যায় বালক নহে। এই ঋণ একদিন পরিশোধ করিব, সে দিন দাক্ষিণাত্য হইতে হিন্দুস্থান পর্য্যন্ত সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে।

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া শিবজী বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্তকে ডাকাইলেন। প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রী উপস্থিত হইলেন, নিঃশব্দে সম্মুখে উপবেশন করিলেন। শিবজী বলিলেন,—পণ্ডিতপ্রবর! আপনি আরংজীবের খেলা দেখিতেছেন, এই খেলা আমাদের খেলিতে হইবে, আপনার প্রসাদে শিবজী এ খেলায় অপরিপক্ক নহে। অদ্য আমরা বন্দী হইব, আমি কল্য রজনীতে ইহার সংবাদ পাইয়াছিলাম! কিন্তু অনুচর-বর্গকে পূর্ব্বে পরিত্রাণ না করিয়া আমার আত্মপরিত্রাণের ইচ্ছা নাই, সে বিষয়ে আপনার উপদেশ কি?

ন্যায়শাস্ত্রী অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—আপনার অনুচর-দিগের স্বদেশগমনের জন্য সম্রাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করুন। এক্ষণে আপনাকে বন্দী করিয়াছে, আপনার অনুচরসংখ্যা যত হ্রাস হয়, তাহাতে সম্রাট্ আহ্লাদিত ভিন্ন দুঃখিত হইবেন না। আমি বিবেচনা করি, অনুমতি চাহিলেই পাইবেন।

শিবজী। মন্ত্রিবর, আপনার পরামর্শই শ্রেয়ঃ, আমারও বোধ হয়, ধূর্ত্ত আরংজীব এ বিষয়ে আপত্তি করিবে না।

সেই মর্ম্মে একখানি আবেদনপত্র প্রস্তুত হইল। শিবজী যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল, শিবজীর অনুচর সকল দিল্লী হইতে প্রস্থান করিবে শুনিয়া সম্রাট্ আহ্লাদিত হইয়া তাহাদিগের যাইবার জন্য এক একখানি অনুমতিপত্র দান করিলেন। শিবজী কয়েক দিন মধ্যে সেই সমস্ত অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইলেন। মনে মনে বলিলেন,—মূর্খ! শিবজীকে বন্দী রাখিবে? এখন একজন অনুচরের বেশ ধরিয়া ইহার মধ্যে একখানি অনুমতিপত্র লইয়া দিল্লীত্যাগ করিলে কি করিতে পার? যাহা হউক, অনুচরবর্গ এখন নিরাপদে যাউক, শিবজী আপনার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে সক্ষম।

পাঠক! যিনি অসাধারণ চতুরতা, বুদ্ধিকৌশল ও রণনৈপুণ্যে ভ্রাতৃগণকে পরাস্ত করিয়া, বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করিয়া, দিল্লীর ময়ূর-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, যিনি কাশ্মীর হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের অধিপতি হইয়াও পুনরায় দাক্ষিণাত্যদেশ জয়পূর্ব্বক সমগ্র ভারতের একাধীশ্বর হইবার মহৎ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যিনি অসামান্য চতুরতা দ্বারা মহাবীর সুচতুর শিবজীকেও বন্দী করিয়াছিলেন, চল, একবার সেই কপটাচারী, অদূরদর্শী আরংজীবের প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মনের ভাবগুলি নিরীক্ষণ করি।

রাজকার্য্য সমাধা হইয়াছে, আরংজীব "গোসলখানা" নামক একটি ঘরে উপবেশন করিয়া আছেন। সেটি মন্ত্রীদিগের সহিত গুপ্ত পরামর্শের স্থল, কিন্তু অদ্য আরংজীব একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। কখন তাঁহার ললাটে গভীর চিন্তার রেখা দেখা যাইতেছে, কখন বা উজ্জ্বল নয়নে রোষ বা অভিমান বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞার লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, কখন বা মন্ত্রণা-সফলতাজনিত সন্তোষে তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্ত হাস্যরেখায় অঙ্কিত হইতেছে। সম্রাট্ কি করিতেছেন? আপন বুদ্ধিবলে সমস্ত হিন্দুস্থানের একাধীশ্বর হইয়াছেন, সেই কথা স্মরণ করিতেছেন? হিন্দু-ধর্ম্মের আরও অবমাননা অথবা রাজপুত বা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আরও পদদলিত করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন? শিবজীকে বন্দী করিয়া মনে মনে উল্লাসিত হইতেছেন? জানি না সম্রাটের কি চিন্তা, তাঁহার সভার মধ্যে, ভারতবর্ষের মধ্যে কোনও মন্ত্রীকে সন্দিগ্ধমনা আরংজীব কখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না, মনের ভাব বলিতেন না। নিজের বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে সকলকে পুত্তলিকার ন্যায় চালাইবেন, সমগ্র দেশ সুন্দর শাসন করিবেন, আরংজীবের এই উদ্দেশ্য। বাসুকি যেরূপ নিজের মস্তকে এই জগৎ ধারণ করিতেছেন, বিশ্রাম চাহেন না,

কাহারও সহায়তা চাহেন না, আরংজীব নিজের অসাধারণ মানসিক বলে সাম্রাজ্যের শাসনকার্য্য একাকী বহন করিবার মানস করিয়াছিলেন, কাহারও পরামর্শ চাহিতেন না।

অনেকক্ষণ উপবেশন করিয়াছিলেন, এরূপ সময় একজন সৈনিক তস্‌লীম করিয়া বলিল,—সম্রাটের জয় হউক! জহাঁপনা! দানেশমন্দ নামক আপনার সভাসদ্‌ আপনার সাক্ষাৎ অভিলাষী, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন। সম্রাট্‌ দানেশমন্দকে আসিতে আজ্ঞা দিলেন, চিন্তারেখাগুলি ললাট হইতে অপসৃত করিলেন, মুখে সুন্দর হাস্য ধারণ করিলেন।

দানেশমন্দ আরংজীবের মন্ত্রী ছিলেন না, রাজকার্য্যে পরামর্শ দিতে সাহস করিতেন না। তবে তিনি পারস্য ও আরবী ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত, সুতরাং সম্রাট্‌ তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন, কখন কখন কোন কোন কথায় বাক্যচ্ছলে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। উদারচেতা দানেশমন্দ প্রায়ই উদার সরল পরামর্শ দিতেন, এমন কি, আরংজীবের জ্যেষ্ঠ দারা যখন বন্দী হন, দানেশমন্দ তাঁহার প্রাণরক্ষার পরামর্শই দিয়াছিলেন। এবংবিধ পরামর্শ কুটিল আরংজীবের মনোগত হইত না, আরংজীব তাঁহাকে অল্পবুদ্ধি ও অদূরদর্শী বলিয়া মনে করিতেন, তথাপি তাঁহার বিদ্যা, ধন ও পদমর্য্যাদার জন্য সম্যক্‌ আদর করিতেন। সরলস্বভাব বৃদ্ধ দানেশমন্দ সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিয়া উপবেশন করিলেন।

দানেশমন্দ। এ সময়ে জহাঁপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসা দাসের ধৃষ্টতা, কেন না, এ সময় সম্রাট্‌ রাজকার্য্যের পর বিশ্রাম করেন। তবে যে আসিয়াছি, কেবল আপনি অনুগ্রহ করেন এই নিমিত্ত। পারস্য-কবি সুন্দর লিখিয়াছেন, 'সূর্য্যের দিকে জগতের সকল প্রাণী সকল সময়ে

চাহিয়া দেখে, সূর্য্য কি তাহাতে বিরক্ত বা কিরণদানে বিরত হয়েন ?'

সম্রাট্ সহাস্য বদনে বলিলেন,—দানেশমন্দ! অন্যের সম্বন্ধে যাহাই হউক, আপনি সর্ব্বসময়েই সমাদরের পাত্র।

ক্ষণেক এইরূপ মিষ্টালাপ হইলে পর দানেশমন্দ অন্য কথা আনিলেন; বলিলেন,—জহাঁপনা! "আলমগীর" নাম সার্থক করিবেন! সমস্ত হিন্দুস্থান আপনার পদতলে রহিয়াছে, এক্ষণে দাক্ষিণাত্য জয় করিতেও বড় বিলম্ব নাই।

ঈষৎ হাস্য করিয়া আরংজীব বলিলেন,—কেন, সে বিষয়ে আমার কি উদ্যোগ দেখিলেন ?

দানেশমন্দ। দক্ষিণদেশের প্রধান শত্রু আপনার পদতলে।

আরংজীব। শিবজীর কথা বলিতেছেন ? হাঁ, ইন্দুর কলে পড়িয়াছে।

তৎক্ষণাৎ আপন মন্ত্রণা গোপনার্থে বলিলেন,—দানেশমন্দ! আপনি আমাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই জানেন, দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই সম্মান করা আমার উদ্দেশ্য। শিবজী ধূর্ত্ত ও বিদ্রোহী হউক, যোদ্ধা বটে, তাহাকে সম্মানার্থই দিল্লীতে আনিয়াছিলাম, রাজসভায় সমুচিত সম্মান করিয়া তাঁহাকে বিদায় দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সে এরূপ মূর্খ যে, রাজসভায় অসদাচরণ করিয়াছিল। আমি তাহাকে বন্দী করিতে বা তাহার প্রাণ লইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, সুতরাং অন্য শাস্তি না দিয়া কেবল রাজসভায় আসিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন শুনিতেছি যে, দিল্লীর মধ্যেই সে অনেক সন্ন্যাসী ও বিদ্রোহীর সহিত পরামার্শ করে, সুতরাং কোনও রূপ অনিষ্ট করিতে না পারে, এই জন্যই কোতোয়ালকে দৃষ্টি রাখিতে কহিয়াছি, কয়েক দিন পর সম্মান পূর্ব্বক বিদায় দিব।

দানেশমন্দ। সম্রাটের এ আদেশ শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম।

আরংজীব। কেন?

উদারচেতা দানেশমন্দ বলিলেন,—সম্রাট্‌কে পরামর্শ দিই. আমার কি সাধ্য, কিন্তু জহাঁপনা! যদি শিবজীর প্রতি দয়ালু আচরণ না করিতেন, যদি তাহাকে চিরকালের জন্য বন্দী করিতেন, তাহা হইলে মন্দলোকে নানারূপ অখ্যাতি করিত, বলিত যে, শিবজীকে আহ্বান করিয়া রুদ্ধ করা ন্যায়সঙ্গত নয়।

আরংজীব ঈষৎ কোপ সঙ্গোপন করিয়া সেইরূপ হাস্যবদনে বলিলেন,—দানেশমন্দ! মন্দলোকের কথায় দিল্লীশ্বরের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, তবে সুবিচার ও দয়া সিংহাসনের শোভন, সুবিচার করিয়া শিবজীর দোষের জন্য তাহাকে সতর্ক করিয়া দিব, পরে দয়াপ্রকাশে তাহাকে সসম্মান বিদায় দিব।

দানেশমন্দ। এরূপ সদাচরণেই জহাঁপনার প্রপিতামহ আকবরশাহ দেশ-শাসন করিয়াছিলেন, এরূপ সদাচরণে আপনারও খ্যাতি ও ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে।

আরংজীব। সে কিরূপ?

দানেশমন্দ। সম্রাটের অগোচর কিছুই নাই। দেখুন, আকবর-শাহ যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন সমস্ত সাম্রাজ্য শত্রুসঙ্কুল ছিল, রাজস্থানে, বিহারে, দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বস্থানেই বিদ্রোহী ছিল, দিল্লীর সন্নিকট স্থানও শত্রুশূন্য ছিল না। তাঁহার মৃত্যুকালে সমস্ত সাম্রাজ্য নিঃশত্রু ও নির্ব্বিরোধ হইয়াছিল, যাহারা পূর্ব্বে পরম শত্রু ছিল, সেই রাজপুতেরাই বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া কাবুল হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরের বিজয় পতাকা উড্ডীন করে। জয়সাধন কিরূপে হইয়াছিল? কেবল বাহুবলে? কেবল সাহসে?

তৈমুরের বংশে কাহারও সাহস বা বাহুবলের অভাব নাই, তবে আর কেহ এরূপ জয়সাধন করিতে পারেন নাই কি জন্য? না জহাঁপনা! কেবল সদাচরণেই এরূপ জয়লাভ হইয়াছিল। তিনি শত্রুদিগের প্রতি সদাচরণ করিতেন, অধীন হিন্দুদিগের বিশ্বাস করিতেন, হিন্দুরাও এবম্বিধ সম্রাটের বিশ্বাসভাজন হইবার চেষ্টা করিত। মানসিংহ, টোডরমল্ল, বীরবল প্রভৃতি হিন্দুগণই মুসলমান-সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ হইয়াছিলেন। উত্তম ব্যক্তিকেও অবিশ্বাস করিলে সে ক্রমে অধম হইয়া যায়, অধম কাফেরের প্রতিও সদাচরণ ও বিশ্বাস করিলে তাহারা ক্রমে বিশ্বাসযোগ্য হয়, মানবের এই প্রকৃতি, শাস্ত্রের এই লেখন। আমাদের দক্ষিণদেশের যুদ্ধে শিবজী অনেক সহায়তা করিয়াছেন, জহাঁপনা! তাঁহাকে সম্মান করিলে তিনি যত দিন জীবিত থাকিবেন, দক্ষিণদেশে মোগল-সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ থাকিবেন।

দানেশমন্দ কি জন্য সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, পাঠক বোধ হয় এতক্ষণে বুঝিয়াছেন। দিল্লীশ্বর শিবজীকে আহ্বান করিয়া বন্দী করায় জ্ঞানী ও সদাচারী মুসলমান সভাসদ্‌মাত্রেই লজ্জিত হইয়াছিলেন। দানেশমন্দকে সম্রাট্ সমাদর করিতেন, তিনি কোনরূপে কথাচ্ছলে সম্রাটের কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ উদ্দেশ্য তাঁহাকে দেখাইয়া দিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। শিবজীর প্রতি ভদ্রাচরণ করিয়া সম্রাট্ তাঁহাকে স্বদেশে যাইতে দেন, দানেশমন্দ এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। দানেশমন্দ জানিতেন না যে, হস্ত দ্বারা প্রকাণ্ড ভূধরকে বিচলিত করা সম্ভব, কিন্তু পরামর্শ দ্বারা আরংজীবের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও গভীর উদ্দেশ্যগুলি বিচলিত করা যায় না।

দানেশমন্দের উদার সারগর্ভ কথাগুলি কুটিল আরংজীবের নিকট অতিশয় নির্ব্বোধের কথার ন্যায় বোধ হইল। তিনি ঈষৎ

হাস্য করিয়া বলিলেন,—হাঁ, দানেশমন্দ যেরূপ শাস্ত্রবিশারদ, মানবহৃদয়ও সেইরূপ পাঠ করিয়াছেন, দেখিতেছি। দক্ষিণদিকে শিবজী স্তম্ভ স্থাপিত করিবে, রাজস্থানে ত বিদ্রোহিগণ স্তম্ভস্থাপন পূর্ব্বেই করিয়াছে। কাশ্মীর পুনরায় স্বাধীন করিয়া দিব ও বঙ্গদেশে পাঠানদিগকে পুনরায় সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিব। এই চতুঃস্তম্ভের উপর মোগলসাম্রাজ্য সুন্দর ও সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হইবে।

দানেশমন্দের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—সম্রাটের পিতা দাসকে অনুগ্রহ করিতেন, সম্রাট্‌ও যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন, সেই জন্য কখন কখন মনের কথা বলি, নচেৎ জহাঁপনাকে পরামর্শ দিই, এরূপ বিদ্যাবুদ্ধি নাই।

আরংজীব দানেশমন্দকে নির্ব্বোধ সরল ব্যক্তি জানিয়াও তাঁহার সেই সরলতার জন্য তাঁহাকে ভালবাসিতেন, তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছেন দেখিয়া বলিলেন,—দানেশমন্দ! আমার কথার দোষ গ্রহণ করিও না। আক্‌বরশাহ বুদ্ধিমান্‌ ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কাফের ও মুসলমানকে সমান চক্ষে দেখিয়া তিনি কি ধর্ম্মসঙ্গত আচরণ করিয়াছিলেন? আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি,—আমাদের সামান্য দৈনিক কার্য্যসম্পাদনকালেও দেখিতে পাই যে, আপনি করিলে যেরূপ কার্য্য হয়, পরের হস্তে সেরূপ হয় না। এরূপ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যশাসনকার্য্যও সেইরূপ পরের উপর বিশ্বাস না করিয়া স্বয়ং সম্পাদন করিলে কি ভাল হয় না? নিজ বাহুবলে যদি সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন করিতে সমর্থ হই, কি জন্য ঘৃণিত কাফেরদিগের সহায়তা গ্রহণ করিব? আরংজীব বাল্যকালাবধি নিজ অসির উপর নির্ভর করিয়াছে, নিজ অসি দ্বারা সিংহাসনের পথ পরিষ্কার করিয়াছে, নিজ অসি দ্বারা দেশশাসন করিবে, কাহারও সহায়তা চাহিবে না, কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না।

দানেশমন্দ। জহাঁপনা! স্বহস্তে দৈনিক কার্য্য নির্ব্বাহ করা যায়, কিন্তু এরূপ সাম্রাজ্য-শাসন কি সহায়তা ভিন্ন সম্পাদিত হয়? বঙ্গদেশ, দক্ষিণদেশ প্রভৃতি স্থানে কি সর্ব্বসময়ে আপনি বর্ত্তমান থাকিতে পারেন? অন্য কাহাকেও নিযুক্ত না করিলে কার্য্য কিরূপে সম্পাদিত হইবে?

আরংজীব। অবশ্য ভৃত্য নিযুক্ত করিব, কিন্তু তাহারা চিরকাল ভৃত্যের ন্যায় থাকিবে, যেন প্রভু হইতে না চাহে! অদ্য আমি যাহাকে অধিক ক্ষমতা দিব, কল্য সে সেই ক্ষমতা আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারে। অদ্য যাহাকে অধিক বিশ্বাস করিব, কল্য সে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে! এই অবস্থায় ক্ষমতা ও বিশ্বাস অন্যে ন্যস্ত না করিয়া আপনাতে রাখাই ভাল। দানেশমন্দ! তুমি যখন অশ্বে আরোহণ কর, অশ্বকে বল্‌গা ও গুণের দ্বারা সম্পূর্ণ বশীভূত কর, যে দিকে ফিরাও সেই দিকে যাইতে বাধ্য হয়। সম্রাটেরও সেইরূপে শাসন করা উচিত। কাহাকেও বিশ্বাস করিও না, কাহারও হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত করিও না। সমস্ত ক্ষমতা নিজ হস্তে রাখিবে, কর্ম্মচারী ও সেনাপতিদিগকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া তাহাদিগের নিকট কার্য্য গ্রহণ করিবে।

দানেশমন্দ। প্রভু! মনুষ্য ত আর অশ্ব নহে, তাহাদিগের মহত্ত্ব আছে, নিজ নিজ সম্মান-জ্ঞান আছে।

আরংজীব। মনুষ্য অশ্ব নহে, তাহা জানি, সেই জন্যই অশ্বকে বল্‌গা দ্বারা চালাই, মনুষ্যকে উন্নতির আশা ও শাস্তির ভয়ের দ্বারা চালাই। যে উত্তম কার্য্য করিবে, তাহাকে পুরস্কার দিব; যে অধম কার্য্য করিবে, তাহাকে শাস্তি দিব। পুরস্কার-আশা ও শাস্তি-ভয়ে সকলে কার্য্য করিবে; ক্ষমতা, বিশ্বাস, মন্ত্রণা আরংজীব নিজ হৃদয়ে ও নিজ বাহুবলে ন্যস্ত রাখিবে।

দানেশমন্দ। প্রভু! পুরস্কার-আশা ও শাস্তি-ভয় ভিন্ন মনুষ্য-হৃদয়ে ত অন্য ভাবও আছে। মনুষ্যের মহত্ব আছে, উচ্চাভিলাষ আছে, নিজ সম্মানজ্ঞান আছে! যে শাস্তিভয়ে কার্য্য করে, সে কোনরূপে কেবল কার্য্য সমাপ্ত করিয়া নিরস্ত থাকে, কিন্তু যাহাকে আপনি সম্মান করেন, সমাদর করেন, ক্ষমতা দিয়া বিশ্বাস করেন, সে আপনাকে সেই সমাদর ও বিশ্বাসের উপযোগী প্রমাণ করিবার জন্য প্রভুকার্য্যে নিজের ধন, মান, প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিয়াছে, এরূপ উদাহরণও শাস্ত্রে দেখা যায়।

আরংজীব। দানেশমন্দ! আমি তোমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ নহি; কবিতায় যাহা লিখে, তাহা বিশ্বাস করি না। মানব-প্রকৃতি আমার শাস্ত্র। মানবের মহত্ত্ব আমি অল্প দেখিয়াছি। শঠতা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা অনেক দেখিয়াছি, সেই শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমি নিজ হস্তে ক্ষমতা রাখিতে শিখিয়াছি। সেই জন্য কাফেরদিগের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিব, বিদ্রোহোন্মুখ রাজপুতদিগের উপর কঠোর শাসন করিব, মহারাষ্ট্রদেশ নিঃশত্রু করিব, বিজয়পুর, গলখন্দ জয় করিব, হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত একাকী শাসন করিব। কাহারও সহায়তা লইব না, আলমগীর নিজের নাম সার্থক করিবে।

উৎসাহে সম্রাটের নয়ন উজ্জ্বল হইয়াছিল। তিনি মনের গভীর অভীষ্ট কখন কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না, অদ্য কথায় কথায় অনেকটা হঠাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি দানেশ-মন্দের উদার চরিত্র জানিতেন, তাঁহার নিকট দুই একটি কথা কহিলে কোনও হানি নাই, জানিতেন।

ক্ষণেক পর ঈষৎ হাস্য করিয়া আরংজীব বলিলেন,—সরলস্বভাব বন্ধু! অদ্য আমার অভীষ্ট ও মন্ত্রণা কিছু কিছু বুঝিতে পারিলে?

তীক্ষ্ণবুদ্ধি আরংজীব যদি আপনার গভীর মন্ত্রণা কিয়দংশ ত্যাগ করিয়া

সেই দিন সরল দানেশমন্দের সরল পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে মুসলমান-সাম্রাজ্য বোধ হয়, এত শীঘ্র ধ্বংস প্রাপ্ত হইত না।

এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে সৈনিক পুনরায় আসিয়া সংবাদ দিল,—রামসিংহ জহাঁপনার সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষী, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।

সম্রাট্ আদেশ করিলেন,—আসিতে দাও।

ক্ষণেক পর রাজা জয়সিংহের পুত্র রাজসদনে উপস্থিত হইলেন।

রামসিংহ। সম্রাট্‌কে এরূপ সময় সাক্ষাৎ করা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অবিধেয়; কিন্তু পিতার নিকট হইতে অতিশয় গুরু সংবাদ আসিয়াছে, প্রভুকে জানাইতে আসিলাম।

আরংজীব। আপনার পিতার নিকট হইতে আমরাও অদ্য পত্র পাইয়াছি ও সমস্ত অবগত আছি।

রামসিংহ। তবে সম্রাট্ অবগত আছেন যে, পিতা সমস্ত শত্রু পরাজিত করিয়া, শত্রুদের বিদীর্ণ করিয়া রাজধানী বিজয়পুর আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের সৈন্যের অল্পতাবশতঃ সে নগর এ পর্য্যন্ত হস্তগত করিতে পারেন নাই, বিশেষতঃ গলখন্দের সুলতান বিজয়-পুরের সাহায্যার্থ নেকনাম খাঁ নামক সেনাপতিকে বহুসংখ্যক সৈন্য সমেত প্রেরণ করিয়াছেন।

আরংজীব। সমস্ত অবগত হইয়াছি।

রামসিংহ। চতুর্দ্দিকে শত্রুবেষ্টিত হইয়া পিতা সম্রাটের আদেশে এখনও যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু এযুদ্ধে জয় অসম্ভব, প্রভুর নিকট আর অল্পসংখ্যক সৈন্যের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

আরংজীব। আপনার পিতা বীরাগ্রগণ্য, তিনি নিজের সৈন্যে বিজয়পুর হস্তগত করিতে পারিবেন না?

রামসিংহ। মনুষ্যের যাহা সাধ্য, পিতা তাহা করিবেন। শিবজী পূর্ব্বে পরাস্ত হন নাই, পিতা তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছেন; বিজয়পুর পূর্ব্বে আক্রান্ত হয় নাই, পিতা সেই নগর আক্রমণ করিয়াছেন; এখন আপনার নিকট অল্পমাত্র সৈন্য-সহায়তা প্রার্থনা করিতেছেন। তাহা হইলে সমস্ত কার্য্য শেষ হয়, দক্ষিণদেশে মোগল-সাম্রাজ্য বিস্তৃত ও দৃঢ়ীভূত হয়।

এরূপ অবস্থায় অন্য কোন সম্রাট্ সেই সহায়তা প্রেরণ করিয়া দাক্ষিণাত্যদেশ-বিজয়কার্য্য সাধন করিতেন। আরংজীব আপনাকে বহুদর্শী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনে করিতেন, তিনি সে সহায়তা প্রেরণ করিলেন না। বলিলেন,—রামসিংহ! আপনার পিতা আমাদের সুহৃদ্‌প্রবর, তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি শোকাকুল হইলাম। তাঁহাকে পত্র লিখিবেন যে, তিনি নিজের অসাধারণ বাহুবলে জয়সাধন করিবেন, সম্রাট্ দিবানিশি এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন। কিন্তু এখন দিল্লীতে সেনাসংখ্যা অতি অল্প, আমি সহায়তা প্রেরণ করিতে অক্ষম।

রামসিংহ কাতর স্বরে বলিলেন,—জঁহাপনা! পিতা দিল্লীশ্বরের পুরাতন দাস, আপনার কালে, আপনার পিতার কালে অসংখ্যক যুদ্ধে যুঝিয়াছেন, অনেক কার্য্যসাধন করিয়াছেন, দিল্লীশ্বরের কার্য্যসাধন ভিন্ন তাঁহার জীবনের অন্য উদ্দেশ্য নাই। এই ঘোর বিপদে আপনি কিঞ্চিৎ সাহায্যদান না করিলে তিনি বোধ হয়, সসৈন্যে নিধন প্রাপ্ত হইবেন।

বালক জানিত না যে, তাহার কাতরস্বরে ও অশ্রুজলে আরংজীবের গভীর উদ্দেশ্য, গূঢ়মন্ত্রণা বিচলিত হয় না! সে উদ্দেশ্য, সে মন্ত্রণা কি? রাজা জয়সিংহ অতিশয় ক্ষমতাশালী, প্রতাপান্বিত সেনাপতি,

তাঁহার অসংখ্য সৈন্য, বিস্তীর্ণ যশ, অনন্ত প্রতাপ। আজীবন তিনি নিষ্কলঙ্কে দিল্লীশ্বরের কার্য্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু এত ক্ষমতা কোন সেনাপতির বিধেয় নহে, সম্রাট্ জয়সিংহকে এতদূর বিশ্বাস করিতে পারেন না। এ যুদ্ধে যদি জয়সিংহ সার্থকতা লাভ করিতে না পারিয়া অবমানিত হয়েন, তবে সে প্রতাপ ও যশের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইবে। যদি সসৈন্যে বিজয়পুর সম্মুখে নষ্ট হয়েন, দিল্লীশ্বরের হৃদয়ের একটি কণ্টকোদ্ধার হইবে। ঊর্ণনাভের জালের ন্যায় আরংজীবের উদ্দেশ্য-গুলি বহু বিস্তীর্ণ ও অব্যর্থ, অদ্য জয়সিংহ-কীট তাহাতে পড়িয়াছেন, উদ্ধার নাই।

জয়সিংহ বহুকালাবধি দিল্লীশ্বরের কার্য্যে জীবন পণ করিয়াছেন বটে, সে জন্য কি সূক্ষ্ম মন্ত্রণাজাল অদ্য ব্যর্থ হইবে ?

জয়সিংহের উদারচিত্ত পুত্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতে-ছেন বটে, বালকের রোদনের জন্য কি দূরদর্শী সম্রাট্ উদ্দেশ্য ত্যাগ করিবেন ?

দয়া, মায়া প্রভৃতি সুকুমার মনোবৃত্তিসমূহে আরংজীব বিশ্বাস করিতেন না, নিজ হৃদয়েও স্থান দিতেন না। আত্মপথপরিষ্কারার্থ অদ্য একটি পতঙ্গ সরাইয়া ফেলিলেন, কল্য একজন সহোদর ভ্রাতাকে হনন করিলেন, উভয় কার্য্য একইরূপ ধীর নিরুদ্বেগ হৃদয়ে করিতেন ! একদিন পিতা, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, আত্মীয়বর্গ সেই উন্নতি-পথে পড়িয়া-ছিলেন, ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে সরাইয়া দিয়াছিলেন। পিতাকে মায়াবশতঃ জীবিত রাখেন নাই, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারাকে ক্রোধবশতঃ হত্যা করেন নাই, সমস্ত বালকোচিত মনোবৃত্তি তাঁহার ছিল না। পিতা জীবিত থাকিলে ভবিষ্যতে বিপদের সম্ভাবনা নাই, আপন উদ্দেশ্য-সাধনে কোনও প্রতিবন্ধক হইবে না, তিনি জীবিত থাকুন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা

জীবিত থাকিলে উদ্দেশ্যসাধনে প্রতিবন্ধক হইতে পারে। জল্লাদ! তাহাকে সরাইয়া সম্রাট্ আলমগীরের পথ পরিষ্কার করিয়া দাও!

মন্ত্রণাসাধনের জন্য অদ্য আবশ্যক যে জয়সিংহ সসৈন্যে হত হইবেন। তিনি ভাল কি মন্দ, বিশ্বাসী কি বিদ্রোহী, অনুসন্ধানে আবশ্যক নাই, তিনি সসৈন্যে মরিবেন! এই পরিচ্ছেদ বিবৃত সময়ের পর কয়েক মাসের মধ্যেই দিল্লীতে সংবাদ আসিল, অবমানিত অকৃতার্থ জয়সিংহ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! তখনকার ইতিহাস-লেখক কেহ কেহ সন্দেহ করিয়াছেন, সম্রাটের আদেশে বিষপ্রয়োগে জয়সিংহের মৃত্যু হয়।

অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রামসিংহ বলিলেন,—প্রভু! আমার একটি যাচ্ঞা আছে।

আরংজীব। নিবেদন করুন।

রামসিংহ। শিবজী যখন দিল্লী আগমন করিয়াছিলেন, পিতা তাঁহাকে বাক্যদান করিয়াছিলেন যে, দিল্লীতে শিবজীর কোন আপদ ঘটিবে না।

আরংজীব। আপনার পিতা সে কথা আমাদের অবগত করাইয়াছেন।

রামসিংহ। রাজপুতদিগের মধ্যে বাক্যদান করিয়া তাহা লঙ্ঘন হইলে অতিশয় নিন্দার বিষয়। পিতার প্রার্থনা ও দাসের প্রার্থনা যে, শিবজীর যে কোনও দোষ হইয়া থাকে, প্রভু ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিন।

আরংজীব ক্রোধ সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—সম্রাটের যাহা উচিত কার্য্য, সম্রাট্ তাহা করিবেন, সে বিষয়ে আপনি চিন্তিত হইবেন না।

শিবজী নামে দ্বিতীয় একটি কীট সম্রাটের সেই বিস্তীর্ণ মন্ত্রণাজালে পতিত হইয়াছেন, দানেশমন্দ ও রামসিংহ তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না!

জয়সিংহের যে দোষ, শিবজীরও সেই দোষ। শিবজীও সন্ধি-স্থাপনাবধি প্রাণপণে দিল্লীর কার্য্য করিয়াছেন, নিজ সৈন্য দ্বারা অনেক দুর্গ দিল্লীর অধীনে আনিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারও বিপুল ক্ষমতা। আরংজীব কোনও ভৃত্যের উপর বিপুল ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে পারেন না, কাহাকেও বিশ্বাস করেন না।

যাহাদিগকে অবিশ্বাস করা যায়, তাহারা ক্রমে অবিশ্বাসের যোগ্য হয়। আরংজীবের জীবিতকালের মধ্যেই মহারাষ্ট্রীয়েরা ও রাজপুতেরা দিল্লীর বিরুদ্ধে যে ভীষণ যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিল, মোগল-সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া গেল

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

পীড়া

দূরে গেল জটাজূট।

মধুসূদন দত্ত।

শিবজীর অতিশয় সঙ্কটজনক পীড়া হইয়াছে, সমগ্র দিল্লী-নগরে এ সংবাদ প্রচারিত হইল। দিবানিশি শিবজীর গৃহের গবাক্ষ ও দ্বার রুদ্ধ, দিবানিশি চিকিৎসক আসিতেছেন! এ ভীষণ রোগের উপশম সন্দেহস্থল, অদ্য যেরূপ রোগবৃদ্ধি হইয়াছে, কল্য পর্য্যন্ত জীবিত থাকা অসম্ভব। কখন কখন বা সংবাদ রাষ্ট হইতেছে যে, শিবজী আর নাই! রাজপথ দিয়া বহুসংখ্যক লোক গমনাগমন করিত ও সেই রুদ্ধ গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিত। অশ্বারোহী সৈনিক ও সেনাপতিগণ ক্ষণেক অশ্ব থামাইয়া প্রহরীদিগের নিকট শিবজীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন। শিবিকারোহী রাজা বা মন্সবদার শিবজীর গৃহের সম্মুখে আসিয়া একবার উঠিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন। শিবজী কিরূপ আছেন, তিনি উদ্ধার পাইবেন কি না, তিনি কল্য পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবেন কি না, এরূপ নানা কথা নগরবাসী সকলেই বাজারে, পথে, ঘাটে, সর্ব্বসময়ে আন্দোলন করিত। আরংজীব সর্ব্বদাই শিবজীর রোগের সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন, তথাপি গৃহের চারিদিকে যে প্রহরী সন্নিবেশিত ছিল, তাহা পূর্ব্বমত রাখিতেন।

লোকের নিকট শিবজীর রোগের বিষয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, মনে মনে ভাবিতেন, যদি এই রোগেই শিবজীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার বিশেষ কোন নিন্দা না হইয়াই অনায়াসে কণ্টকোদ্ধার হইবে।

সন্ধ্যাকাল সমাগত, এরূপ সময়ে একজন প্রাচীন সম্ভ্রান্ত মুসলমান হাকিম শিবজীর গৃহদ্বারের নিকট অবতীর্ণ হইলেন। প্রহরিগণ জিজ্ঞাসা করিল,—কি উদ্দেশে শিবজীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন? হাকিম উত্তর করিলেন,—সম্রাটের আদেশ অনুসারে রোগীর চিকিৎসা করিতে আসিয়াছি। সসম্মানে প্রহরিগণ পথ ছাড়িয়া দিল।

শিবজী শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার ভৃত্য সংবাদ দিল যে, সম্রাট্ একজন হাকিম পাঠাইয়া দিয়াছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী তৎক্ষণাৎ বিবেচনা করিলেন, কোনরূপ বিষপ্রয়োগের জন্য সম্রাট্ এ কাণ্ড করিতেছেন! তিনি ভৃত্যকে আদেশ করিলেন,—হাকিমকে আমার সেলাম জানাইও ও বলিও, হিন্দু কবিরাজে আমার চিকিৎসা করিতেছে। আমি হিন্দু, অন্যরূপ চিকিৎসা ইচ্ছা করি না। সম্রাটের এই অনুগ্রহের জন্য আমার কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাইবেন।

ভৃত্য এই আদেশ লইয়া ঘর হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই হাকিম অনাহূত হইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। শিবজীর হৃদয়ে ক্রোধসঞ্চার হইল, কিন্তু তাহা সঙ্গোপন করিয়া তিনি অতি ক্ষীণ মৃদুস্বরে হাকিমকে অভ্যর্থনা করিলেন ও শয্যাপার্শ্বে বসিতে আদেশ দিলেন। হাকিম উপবেশন করিলেন।

আকৃতি দেখিলে হাকিমের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ হইতে পারে না। বয়স অনেক হইয়াছে; অতি শুক্ল শ্মশ্রু লম্বিত হইয়া উরঃস্থল আবৃত করিয়াছে, মস্তকোপরি প্রকাণ্ড উষ্ণীষ, হাকিমের স্বর ধীর ও গম্ভীর।

হাকিম বলিলেন,—মহারাজ! ভৃত্যকে যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়াছি, আপনি আমার চিকিৎসা ইচ্ছা করেন না। তথাপি মানবজীবন রক্ষা করা আমাদের ধর্ম্ম, আমি স্বধর্ম্মসাধন করিব।

শিবজী মনে মনে আরও ক্রুদ্ধ হইলেন, ভাবিলেন, এ বিপদ্ কোথা হইতে আসিল? কিছু বলিলেন না।

হাকিম। আপনার পীড়া কি?

কাতরস্বরে শিবজী বলিলেন,—জানি না, এ কি ভীষণ পীড়া! শরীর সর্ব্বদাই অগ্নিবৎ জ্বলিতেছে, হৃদয়ে বেদনা, সর্ব্বস্থানে বেদনা।

হাকিম গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—পীড়া অপেক্ষা জিঘাংসায় শরীর অধিক জ্বলে, হৃদয়ের বেদনা অনেক সময় মানসিক ক্লেশসঞ্জাত। আপনার কি সেই পীড়া?

বিস্মিত ও ভীত হইয়া শিবজী এই অপরূপ হাকিমের দিকে চাহিলেন। মুখ সেইরূপ গম্ভীর, কোন ভাব-বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না। শিবজী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। হাকিম তাঁহার হস্ত ও শরীর দেখিতে চাহিলেন। শিবজী আরও ভীত হইলেন, অগত্যা হস্ত ও শরীর দেখাইলেন।

অনেকক্ষণ অতিশয় মনোনিবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া হাকিম উত্তর করিলেন,—আপনার বচন যেরূপ ক্ষীণ, নাড়ী সেরূপ ক্ষীণ নহে, ধমনীতে শোণিত সজোরে সঞ্চালিত হইতেছে, পেশীগুলি পূর্ব্ববৎ দৃঢ়বদ্ধ। আপনার এ সমস্ত কি প্রবঞ্চনামাত্র?

পুনরায় বিস্মিত হইয়া শিবজী এই অপূর্ব্ব চিকিৎসকের দিকে চাহিলেন, চিকিৎসকের মুখমণ্ডল গম্ভীর ও অকম্পিত, কোন কপট ভাব লক্ষিত হইল না। শিবজীর শরীরে ক্রমে উষ্ণ শোণিত সঞ্চারিত হইতে লাগিল, কিন্তু ক্রোধসম্বরণ করিয়া পুনরায় ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—

আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, অন্যান্য চিকিৎসকগণও সেইরূপ বলেন। এ মহৎ পীড়া বাহ্যলক্ষণশূন্য, কিন্তু দিনে দিনে তিল তিল করিয়া আমার জীবননাশ করিতেছে।

হাকিম ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আলফ্ লায়লা ও লায়লুন" নামক আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র আছে, তাহাতে এক সহস্র এক পীড়ার বিষয় নির্দেশ আছে, তাহার মধ্যে কয়েকটি বাহ্যলক্ষণশূন্য পীড়ার চিকিৎসার কথা লিখিত আছে। একটির চিকিৎসা "বকুসূতনে আসিরী ইশারৎ বর্দ।" কয়েদিগণ কাজ না করিবার জন্য পীড়ার ভাণ করে, তাহার চিকিৎসা শিরশ্ছেদন। আর একটি পীড়ার নাম "দিগরান্ দোজখ্ এখ্তিয়ার কুনন্দ।" যুবকগণ এই পীড়ার ভাণ করিয়া নরক-পথগামী হয়, তাহার ঔষধি পাদুকা-প্রহার। তৃতীয় এক প্রকার বাহ্যলক্ষণশূন্য পীড়া আছে, তাহার নাম "আয়েবহা বরগেরেফ্তা জেরেবগল।" প্রবঞ্চকগণ নিজ প্রবঞ্চনা গোপনার্থ এই পীড়া ভাণ করে। তাহারও ঔষধি-নির্দ্দেশ আছে, আমি সেই ঔষধি আপনাকে দিতেছি।

শিবজী এ সমস্ত শাস্ত্রকথা বিশেষ বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু হাকিম তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চতুর, শিবজীর মনের ভাব বুঝিয়াছেন, তাহা শিবজী বুঝিতে পারিলেন। ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে ঔষধি কি?

হাকিম উত্তর করিলেন,—সে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধিও বটে, উৎকট বিষও বটে। "রব্বুল আলমিনার" নাম লইয়া তাহাই আপনাকে দিব, যদি রোগ যথার্থ হয়, অব্যর্থ ঔষধিতে তৎক্ষণাৎ পীড়া আরোগ্য হইবে, যদি প্রতারণা হয়, অব্যর্থ বিষে তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশ হইবে।

শিবজীর হৃৎকম্প হইল, ললাট হইতে স্বেদবিন্দু পড়িতে লাগিল।

ঔষধিসেবনে অস্বীকৃত হইলে তাঁহার প্রতারণা প্রচারিত হইবে, সেবন করিলে নিশ্চয় মৃত্যু।

হাকিম ঔষধি প্রস্তুত করিয়া আনিলেন, শিবজী বলিলেন,—মুসলমানের স্পৃষ্ট পানীয় আমি পান করিব না।

শিবজী সজোরে হস্ত-সঞ্চালনে পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন। হাকিম কিছুমাত্র রুষ্ট হইলেন না, ধীরে ধীরে বলিলেন,—এরূপ সজোরে হস্ত-সঞ্চালন ক্ষীণতার লক্ষণ নহে।

শিবজী অনেকক্ষণ অতিকষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিয়াছিলেন, আর পারিলেন না, সহসা উঠিয়া বসিলেন,—"রোগীকে উপহাস করিবার এই শাস্তি" এই বলিয়া এক চপেটাঘাত করিলেন ও হাকিমের শুক্ল শ্মশ্রু সজোরে আকর্ষণ করিলেন। বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সেই মিথ্যা শ্মশ্রু সমস্ত খসিয়া আসিল, চপেটাঘাতে উষ্ণীষ দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, তাঁহার বাল্যসুহৃদ্ তন্নজী মালশ্রী খিল্ খিল্ করিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন।

তন্নজী অনেকক্ষণ পরে হাস্য সম্বরণ করিয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। পরে শিবজীর নিকটে আসিয়া উপবেশন করিয়া বলিলেন,—প্রভু কি সর্ব্বদাই চিকিৎসককে এইরূপ পারিতোষিক দিয়া থাকেন? তাহা হইলে রোগীর মৃত্যুর পূর্ব্বে দেশের চিকিৎসক নিঃশেষিত হইবে! বজ্রসম চপেটাঘাতে এখনও মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে!

শিবজী সহাস্যে বলিলেন,—বন্ধু, ব্যাঘ্রের সহিত খেলা করিলে কখন কখন আহত হইতে হয়। যাহা হউক, তোমাকে দেখিয়া কতদূর আহ্লাদিত হইলাম, বলিতে পারি না, এ কয় দিনই তোমাকে প্রত্যাশা করিতেছিলাম। এখন সংবাদ কি বল।

তন্নজী। প্রভুর সমস্ত আদেশ সম্পাদিত করিয়াছি, একে একে

নিবেদন করিতেছি। সম্রাট্ যে অনুমতি-পত্র দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা আপনার অনুচরবর্গ সকলেই নিরাপদে দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে।

শিবজী। সে জন্য জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করি। এখন আমার মন শান্ত হইল, আমি আপনার পলায়নের জন্য তত ভাবি না। গগনবিহারী পক্ষী সামান্য পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া থাকে না।

তন্নজী। সেই সমস্ত অনুচর দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গোস্বামীর বেশ ধরিয়া মথুরা ও বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিতেছে, মথুরায় অনেক দেবালয়ের পুরোহিতগণও প্রত্যহ আপনাকে প্রতীক্ষা করিতেছে। আমি দিল্লী হইতে মথুরার পথ বিশেষরূপে দৃষ্টি করিয়াছি, যে যে স্থানে লোক সন্নিবেশিত করিবার আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাও করিয়াছি।

শিবজী। চিরবন্ধু! তুমি যেরূপ কার্য্যদক্ষ, অবশ্যই আমরা নিরাপদে স্বদেশে যাইতে পারিব।

তন্নজী। দিল্লীর প্রাচীরের বাহিরে আপনি যেরূপ একটি তীব্রগতি অশ্ব রাখিতে বলিয়াছিলেন, তাহাও রাখিয়াছি। যে দিন স্থির করিবেন, সেই দিনে সমস্ত প্রস্তুত থাকিবে।

শিবজী। ভাল।

তন্নজী। রাজা জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের নিকট গিয়াছিলাম, তাঁহার পিতা আপনাকে যে বাক্যদান করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম। রামসিংহ পিতার ন্যায় সত্যপ্রিয় ও উদারচেতা; শুনিয়াছি, স্বয়ং সম্রাটের নিকট যাইয়া আপনার জন্য সাশ্রু-নয়নে আবেদন করিয়াছিলেন।

শিবজী। সম্রাট্ কি বলিলেন?

তন্নজী। বলিলেন, সম্রাটের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিবেন।

শিবজী। বিশ্বাসঘাতক! কপটাচারী! এখনও একদিন শিবজী ইহার প্রতিশোধ দিবে।

তন্নজী। রামসিংহ সে বিষয়ে বিফলপ্রযত্ন হইয়াছেন বটে, কিন্তু যুবক সরোষে আমার নিকট বলিলেন যে, রাজপুতের বাক্য অন্যথা হয় না। অর্থ দ্বারা, সৈন্য দ্বারা যেরূপে পারেন, তিনি আপনার সহায়তা করিবেন, তাহাতে যদি তাঁহার প্রাণ যায়, তাহাতে স্বীকৃত আছেন

শিবজী। পিতার উপযুক্ত পুত্র! কিন্তু আমি তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে চাহি না। আমি পলায়নের যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি, তাহা তুমি তাঁহাকে জানাইয়াছ?

তন্নজী। জানাইয়াছি, তিনি জানিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং আপনার সম্পূর্ণ সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

শিজবী। ভাল।

তন্নজী। এতদ্ভিন্ন দানেশমন্দ প্রভৃতি যাবতীয় আরংজীবের সভাসদ্‌কে মিষ্ট কথায় বা অর্থ দ্বারা আপনার পক্ষবর্ত্তী করিয়াছি। দিল্লীতে হিন্দু কি মুসলমান, এরূপ বড়লোক কেহ নাই, যিনি আপনার পক্ষবর্ত্তী নহেন। কিন্তু আরংজীব কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্য করেন না।

শিবজী। তবে সমস্ত প্রস্তুত? আমি আরোগ্যলাভ করিতে পারি?

সহাস্যে তন্নজী বলিলেন,—আমার ন্যায় বিজ্ঞ হাকিম যখন আপনার পীড়ার চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছে, তখন পীড়া কি থাকিতে পারে? কিন্তু আপনার পানের জন্য সুন্দর মিষ্ট শরবৎ প্রস্তুত করিয়াছিলাম, সমস্তটা নষ্ট করিলেন?

শিবজী আর এক পাত্র প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তন্নজী সেই

পাত্র লইয়া পুনরায় শরবৎ প্রস্তুত করিলেন, শিবজী তাহা পান করিয়া সহাস্যে বলিলেন,—চিকিৎসক! আপনার ঔষধি যেরূপ মিষ্ট, সেইরূপ ফলদায়ী। আমার পীড়া একেবারে আরাম হইয়াছে।

শিবজীকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় উষ্ণীষ ও শ্মশ্রু ধারণ করিয়া তন্নজী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বারদেশে প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল,—পীড়া কিরূপ দেখিলেন?

হাকিম উত্তর করিলেন,—পীড়া অতিশয় সঙ্কটজনক, কিন্তু আমার অব্যর্থ ঔষধিতে অনেক উপশম হইয়াছে। বোধ করি, অল্পদিনের মধ্যেই শিবজী এ ক্লেশ হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিবেন।

হাকিম শিবিকাযোগে চলিয়া গেলেন। একজন প্রহরী অন্যকে বলিল,—হাকিম বড় ভাল, এত বৈদ্যে যে পীড়া আরাম করিতে পারিল না, হাকিম একদিনে তাহা আরাম করিলেন কিরূপে?

দ্বিতীয় প্রহরী উত্তর করিল,—হবে না কেন, এ যে রাজবাটীর হাকিম।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

আরোগ্য

এত শুনি উত্তর ক্ষণেক স্তব্ধ হয়ে।
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম করিয়ে॥
হে বীর, কমলচক্ষে কর পরিহার।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমিবা আমার॥

কাশীরাম দাস।

উপরি-উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর নগরে সংবাদ প্রচারিত হইল যে, শিবজীর পীড়ার কিছু উপশম হইয়াছে। নগরে পুনরায় ধুমধাম পড়িয়া গেল, সকলেই সেই কথা কহিতে লাগিল। হিন্দুমাত্রেই এ কথা শুনিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিল, মহদাশয় মুসলমানগণ এই সংবাদ পাইয়া সুখী হইলেন। পথে, ঘাটে, দোকানে, মস্‌জীদে সকলেই এই কথা কহিতে লাগিল। আরংজীব এ সংবাদ শুনিয়া যথোচিত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

নগরে ধুমধাম পড়িয়া গেল। শিবজী ব্রাহ্মণদিগকে রাশি রাশি মুদ্রা দান করিতে লাগিলেন, দেবালয়ে পূজা পাঠাইতে লাগিলেন, চিকিৎসক সকলকে অর্থদানে সন্তুষ্ট করিলেন। বাজারে আর মিষ্টান্ন রহিল না, শিবজী রাশি রাশি মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া দিল্লীর সমস্ত বড়-লোকের বাটীতে পাঠাইতে লাগিলেন। পরিচিত সমস্ত লোকের নিকট ভেট পাঠাইতে লাগিলেন, এমন কি, প্রতি মস্‌জীদে ও ফকীরগণের

সেবার্থ প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন পাঠাইতে লাগিলেন। সম্রাটের মনে যাহাই থাকুক, অন্য সকলেই শিবজীর এই বদান্যতা ও সদাচরণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। "দিল্লীকা লাড্ডুর" ছড়াছড়ি হইতে লাগিল, তাহাতে আর কেহ পস্তিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু আরংজীব অতি শীঘ্রই পস্তিয়াছিলেন!

শিবজী কেবল মিষ্টান্ন প্রেরণ করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না, মিষ্টান্ন ক্রয় করাইয়া নিজের গৃহে আনিতেন ও অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আধার সমস্ত নির্ম্মাণ করাইয়া স্বয়ং মিষ্টান্ন সাজাইয়া প্রেরণ করিতেন। সে আধার কখন কখন তিন চারি হাত দীর্ঘ হইত, আট কি দশ জন লোক বহিয়া লইয়া যাইত। কয়েক দিন এইরূপে মিষ্টান্ন বিতরণ হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় এইরূপ দুইটি প্রকাণ্ড মিষ্টান্নের আধার শিবজীর গৃহ হইতে বাহির হইল। প্রহরিগণ জিজ্ঞাসা করিল,—এ কাহার বাটীতে যাইবে? বাহকেরা উত্তর করিল—রাজা জয়সিংহ-সদনে।

প্রহরিগণ। তোমাদের প্রভু আর কতদিন এরূপ মিষ্টান্ন পাঠাইবেন?

বাহকেরা। এই অদ্যই শেষ।

মিষ্টান্নের ভার লইয়া বাহকগণ চলিয়া গেল।

কতক পথ যাইয়া বাহকেরা একটি অতি সঙ্গোপন স্থানে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই দুইটি আধার নামাইল। বাহকগণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, জনমাত্র নাই, শব্দমাত্র নাই, কেবল সন্ধ্যার বায়ু রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছে। বাহকেরা একটি ইঙ্গিত করিল, একটি আধার হইতে শিবজী, অপরটি হইতে শম্ভুজী বাহির হইলেন। উভয়ে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

বিলম্ব না করিয়া উভয়ে ছদ্মবেশে দিল্লীর প্রাচারাভিমুখে যাইলেন।

সন্ধ্যার সময় লোক অতি অল্প, তথাপি রাজপথে দুই একজন লোক যখন নিকট দিয়া যায়, শম্ভুজীর হৃদয় ভয়ে ও উদ্বেগে কম্পিত হইয়া উঠে। শিবজীর চিরজীবন এইরূপ বিপদপূর্ণ, তাঁহার পক্ষে এ বিপদ্ কিছু নূতন নহে, তথাপি তাঁহারও হৃদয় উদ্বেগশূন্য ছিল না।

উভয়ে কম্পিতহৃদয়ে প্রাচীর পার হইলেন। একজন প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল,—কে যায়?

শিবজী উত্তর করিলেন,—গোস্বামী। হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্।

প্রহরী। কোথায় যাইতেছ?

শিবজী। মথুরা তীর্থস্থানে। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

উভয়ে প্রাচীর পার হইলেন।

প্রাচীরের বাহিরেও অনেক হর্ম্ম্যাদি ছিল। অনেক ধনাঢ্য উচ্চপদাভিষিক্ত লোক বাস করিতেন। সে সকল দুই পার্শ্বে রাখিয়া শিবজী ও শম্ভুজী ত্বরায় পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

দূরে একটি বৃক্ষতলে একটি অশ্ব বদ্ধ রহিয়াছে দেখিলেন। অতি সতর্কভাবে সেই দিকে যাইলেন, দেখিলেন, তন্নজী-বর্ণিত অশ্বই বটে। জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভাই অশ্বরক্ষক! তোমার নাম কি?

রক্ষক। জানকীনাথ।

শিবজী। কোথায় যাইবে?

রক্ষক। মথুরা।

শিবজী বলিলেন,—হাঁ, এই অশ্ব বটে। শিবজী অশ্বে আরোহণ করিলেন, পশ্চাতে শম্ভুজীকে উঠাইয়া লইলেন, মথুরার দিকে চলিলেন। অশ্বরক্ষক পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে চলিতে লাগিল।

অন্ধকার নিশীথে নিঃশব্দে পল্লী বা প্রান্তর দিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া শিবজী পলায়ন করিতেছেন। আকাশে নক্ষত্রগুলি মিট্‌মিট্ করিতেছে, অল্প অল্প মেঘ এক একবার গগন আচ্ছাদিত করিতেছে, বর্ষাকালে পূর্ণ-কলেবরা যমুনা প্রবলবেগে বহিয়া যাইতেছে, পথ-ঘাট কর্দ্দম বা জলপূর্ণ। শিবজী উদ্বেগপূর্ণহৃদয়ে পলায়ন করিতেছেন।

দূর হইতে অশ্বের পদশব্দ শ্রুত হইল। শিবজী লুকাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে স্থানে বৃক্ষ বা কুটীর নাই, অগত্যা পূর্ব্ববৎ গমন করিতে লাগিলেন।

তিনজন অশ্বারোহী বেগে দিল্লী অভিমুখে আসিতেছেন, তাঁহা-দিগের কোষে অসি। দূর হইতে শিবজীর অশ্ব দেখিতে পাইয়া তাঁহারা সেই দিকে অশ্ব প্রধাবিত করিলেন। শিবজীর হৃদয় উদ্বেগে দুরু দুরু করিতে লাগিল। নিকটে আসিয়া একজন অশ্বারোহী জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে যায়?

শিবজী। গোস্বামী।

অশ্বারোহী। কোথা হইতে আসিতেছ?

শিবজী। দিল্লীনগরী হইতে।

অশ্বারোহী। আমরা দিল্লীনগরী যাইব, কিন্তু পথ হারাইয়াছি, আমাদের সঙ্গে আসিয়া পথ দেখাইয়া দেও, পরে তুমি মথুরায় যাইও।

শিবজীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। দিল্লী যাইতে অস্বীকার করিলে সৈনিকেরা বল প্রকাশ করিবে, দিবাদের সময় সহসা শিবজীকে চিনিলেও চিনিতে পারে, কেন না, দিল্লীতে এরূপ সৈনিক ছিল না যে, শিবজীকে দেখে নাই। আর দিল্লীতে পুনর্গমন করিলে সহস্র বিপদ! ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একজন অশ্বারোহী সম্মুখে আসিয়া শিবজীর সহিত কথা কহিয়াছিল, অপর দুইজন অস্পষ্টস্বরে পরামর্শ করিতেছিল। কি পরামর্শ?

একজন বলিল,—এ স্বর আমি জানি, আমি দক্ষিণদেশে সায়েস্তা খাঁর অধীনে অনেকদিন যুদ্ধ করিয়াছি, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, পথিক গোস্বামী নহে।

অপর জন বলিল,—তবে কে?

প্রথম। আমি সন্দেহ করি, এ স্বয়ং শিবজী। দুইজন মনুষ্যের কণ্ঠস্বর ঠিক একরূপ হয় না।

দ্বিতীয়। দূর মূর্খ! শিবজী দিল্লীতে বন্দী হইয়াছে।

প্রথম। সেইরূপ আমরাও মনে করিয়াছিলাম যে, শিবজী সিংহগড় দুর্গে আছে, সহসা একদিন রজনীযোগে পুনা ধ্বংস করিয়া গিয়াছিল!

দ্বিতীয়। ভাল, মস্তকের বস্ত্র তুলিয়া দেখিলেই সকল সন্দেহ দূর হইবে।

সহসা একজন অশ্বারোহী আসিয়া শিবজীর উষ্ণীষ দূরে নিক্ষেপ করিলেন, শিবজী তাঁহাকে চিনিলেন, তিনি সায়েস্তা খাঁর অধীনস্থ একজন প্রধান সেনানী।

যদি হস্তে কোনরূপ অস্ত্র থাকিত, শিবজী একাকী তিনজনকে হত করিবার চেষ্টা করিতেন। রিক্তহস্তেও একজনকে মুষ্টি-আঘাতে অচেতন করিলেন, এমন সময় আর দুইজন অসি হস্তে নিকটে আসিয়া শিবজীকে ধরিয়া ভূতলশায়ী করিল।

শিবজী ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন, আবার বন্দী হইলেন, বিদেশে বন্ধুশূন্য হইয়া আরংজীব কর্তৃক হত হইবেন, এই চিন্তা করিতেছিলেন। শম্ভুজীর দিকে নয়ন পড়িল, চক্ষু জলে আপ্লুত হইল।

সহসা একটি শব্দ হইল, শিবজী দেখিলেন, একজন অশ্বারোহী

তীরবিদ্ধ হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। আর একটি তীর, আর একটি তীর; শিবজীর তিনজন শত্রুই ভূতলশায়ী! তিনজনই গতজীবন!

শিবজী পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া উঠিয়া দেখিলেন, পশ্চাৎ হইতে সেই অশ্বরক্ষক জানকীনাথ তীর নিক্ষেপ করিয়াছিল। বিস্মিত হইয়া জানকীকে নিকটে ডাকিয়া জীবনরক্ষার জন্য শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সে নিকটে আসিলে শিবজী আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সে অশ্বরক্ষক নহে, অশ্বরক্ষকবেশে সীতাপতি গোস্বামী!

তখন সহস্রবার গোস্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—সীতাপতি! আপনি ভিন্ন শিবজীর বিপদের সময় প্রকৃত বন্ধু আর কে আছে? আপনাকে অশ্বরক্ষক মনে করিয়া তুচ্ছ করিয়াছিলাম, ক্ষমা করুন। আপনার এ কার্য্যের জন্য আমি কি উপযুক্ত পুরস্কার দিতে পারি?

সীতাপতি শিবজীর সম্মুখে জানু পাতিয়া করযোড়ে বলিলেন,—রাজন্! ছদ্মবেশ ক্ষমা করুন, আমি অশ্বরক্ষকও নহি, গোস্বামীও নহি, আমি আপনার পুরাতন ভৃত্য রঘুনাথজী হাবিলদার! জ্ঞান হইয়া অবধি আপনার সেবা করিয়াছি, আজীবনকাল আপনার সেবা করিব, ইহা ভিন্ন অন্য কামনা নাই, অন্য পুরস্কার চাহি না। প্রভুর কাছে যদি না জানিয়া কখন কোন দোষ করিয়া থাকি, প্রভু নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দোষ ক্ষমা করুন।

শিবজী চকিত হইয়া সেই বালক রঘুনাথের দিকে চাহিলেন, হৃদয়ের উদ্বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সজল-নয়নে রঘুনাথকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন,—রঘুনাথ! রঘুনাথ! তোমার নিকট শিবজী শত অপরাধে অপরাধী, কিন্তু এই মহৎ আচরণে আমাকে যথেষ্ট দ

দিয়াছ। তোমাকে সন্দেহ করিয়াছিলাম, তোমার অবমাননা করিয়াছিলাম, স্মরণ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। শিবজী যতদিন জীবিত থাকিবে, তোমার গুণ বিস্মৃত হইবে না, প্রণয় ও যত্নে যদি এ মহৎ ঋণ পরিশোধ করা যায়, তবে পরিশোধ করিবার চেষ্টা করিব।

শান্ত নিস্তব্ধ রজনীতে উভয়ে পরস্পরের আলিঙ্গনসুখে বিমুগ্ধ হইলেন। রঘুনাথের ব্রত অদ্য শেষ হইল, শিবজীর হৃদয়বেদনা অদ্য দূর হইল, বালকের ন্যায় উভয়ে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রাসাদে

কি দারুণ বুকের ব্যথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি পাপ পীরিতের কথা॥
সই! কে বলে পীরিতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পীরিতি করিয়া কাঁদিয়া জনম গেল॥
কুলবতী হইয়া কুলে দাঁড়াইয়া যে ধনী পীরিতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া এমতি পুড়িয়া মরে।
হায় বিনোদিনী, এ দুঃখে দুঃখিনী, প্রেমে ছল ছল আঁখি।
চণ্ডিদাস কহে, সে গতি হইয়া, পরাণ সংশয় দেখি॥

চণ্ডিদাস।

নিশীথে সীতাপতি গোস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া রাজপুতবালা গৃহে আসিলেন, কিন্তু গৃহে আসিয়া সরযূ দেখিলেন, হৃদয় শূন্য। যে স্বদেশীয় যোদ্ধাকে প্রথম দর্শন করিয়াই সরযূ চকিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন, যাহাকে কয়েক মাস অবধি সরযূ হৃদয়েশ্বর বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, যাহাকে জনার্দ্দন বিবাহের বাক্যদান করিয়াছিলেন, সে রঘুনাথের অদর্শনে আজি সরযূর হৃদয় শূন্য।

সে দিন গেল, সপ্তাহ গত হইল, মাস অতিবাহিত হইল, সরযূ হৃদয়ের ধন আর ফিরিয়া পাইলেন না। অন্ধকার নিশীথে কখন কখন

বালিকা একাকী গবাক্ষপার্শ্বে উপবেশন করিয়া সন্ধ্যা হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, দ্বিপ্রহর হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত চিন্তা করিতেন। দিবসে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নীরবে সেই গবাক্ষ দিয়া পথপানে চাহিয়া থাকিতেন, সে পথ দিয়া রঘুনাথ আর আসিলেন না!

কখন বা অপরাহ্নে একাকী সরযূ আম্র-কাননে ভ্রমণ করিতেন, ভ্রমণ করিতে করিতে কত কথা হৃদয়ে জাগরিত হইত! তোরণদুর্গের কথা, কণ্ঠমালার কথা, রায়গড়ে আগমনের কথা, বিদায়ের কথা। নীরবে সরযূর গণ্ডস্থল দিয়া এক এক বিন্দু অশ্রু বহিত, কখন কখন রজনীতে সহসা হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হইত, ভাদ্রমাসের নদীর ন্যায় শোক-পারাবার উথলিয়া উঠিত। তখন কেহ দেখিবার নাই, সরযূ প্রাণভরে কাঁদিতেন, শ্রাবণ মাসের ধারার ন্যায় নয়ন হইতে অজস্র বারিধারা বহিতে থাকিত। রজনী প্রভাত হইত, প্রাতঃকালের রক্তিমচ্ছটা পূর্ব্ব-দিকে দেখা দিত। বালিকা তখনও শোকে বিবশা হইয়া লুণ্ঠিত রহিয়াছে।

প্রাতঃকালে পুষ্পচয়ন করিতে উদ্যানে যাইতেন, প্রফুল্ল পুষ্পগুলি একে একে চয়ন করিতেন, হৃদয়ে স্থাপন করিতেন, আর কি চিন্তা করিতেন, কে বলিবে? চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় পুষ্পের দিকে চাহিতেন, পুষ্পদলগত প্রাতঃশিশিরবিন্দুর সহিত দুই একটি পরিষ্কার স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দু মিশাইয়া যাইত। সায়ংকালে বীণা হস্তে করিয়া কখন কখন গীত গাইতেন, আহা! সে শোকের গীত শুনিয়া শ্রোতৃদিগের নয়নেও জল আসিত। এরূপ চিন্তায় ক্রমে সরযূর শরীর শুষ্ক হইতে লাগিল, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, নয়ন কালিমাবেষ্টিত হইল। সরলস্বভাব জনার্দ্দন এখনও সরযূর হৃদয়ের কথা কিছু জানেন না, কিন্তু সরযূর শরীরের অবস্থা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইলেন, কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

নারীর নিকট নারীর মনের কথা গুপ্ত থাকে না, সরযূ অনেক যত্নে শোক সংগোপন করিলেও তাঁহার সখী ও দাসীগণ তাঁহার গুপ্তকথা কিছু কিছু অনুমান করিয়াছিল। তাহারা কথাচ্ছলে বৃদ্ধ জনার্দ্দনকে বলিল,—সরযূর বয়স হইয়াছে, বিবাহ স্থির করুন। সরযূর কাণে এ কথা উঠিল। সরযূ বলিয়া পাঠাইলেন,—পিতাকে বলিও আমার বিবাহে রুচি নাই চিরকাল অবিবাহিতা থাকিয়া তাঁহারই পদসেবা করিব।

জনার্দ্দন সে কথা মানিলেন না, বিবাহের পাত্র স্থির করিতে লাগিলেন। রাজপুরোহিত দ্বারা পালিতা ভদ্র ক্ষত্রিয়কন্যার পাত্রের অভাব ছিল না, অবশেষে রাজা জয়সিংহের একজন প্রধান সেনানীর সহিত বিবাহ স্থির হইল। সরযূর কাণে এ কথা উঠিল, সরযূ শিহরিয়া উঠিলেন। লজ্জার মাথা খাইয়া পিতাকে বলিয়া পাঠাইলেন,—পিতাকে বলিও, তিনি অন্য একজন সেনানীকে বাক্‌দান করিয়াছিলেন, তিনিই আমার বাগ্‌দত্ত পতি। অন্য কাহারও সহিত বিবাহ হইলে ব্যভিচার-দোষ ঘটিবে।

জনার্দ্দন এ কথা শুনিয়া রুষ্ট হইলেন, সরযূকে কতক তিরস্কার করিলেন, আবার নিজের ঘরে গিয়া মনের দুঃখে কাঁদিলেন। অবশেষে কন্যার আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিলেন, রাজা জয়সিংহকে জানাইলেন। সরযূর কাণে এ কথা উঠিল। সরযূ তখন নিজে পিতার পদে লুণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া বলিলেন,—পিতা ক্ষমা করুন, এ বিষয়ে ক্ষান্ত হউন, নচেৎ আপনার চিরপালিতা এই অভাগিনী কন্যাকে জন্মের মত হারাইবেন। জনার্দ্দন কন্যাকে বুকে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কিন্তু কন্যার কথা কে গ্রাহ্য করে, পাঁচজন ভদ্রলোক যেরূপ পরামর্শ দেয়, সমাজে থাকিলে সেইরূপ কাজ করিতে হয়। বিবাহের

দিন নিকটে আসিতে লাগিল, জনার্দ্দন অনেক বুঝাইলেন, অনেক কাঁদিলেন, অনেক তিরস্কার করিলেন। অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া বিবাহের পূর্ব্বদিন সরযূকে বলিলেন,—পাপীয়সি, তোর জন্য কি আমি এই বৃদ্ধবয়সে অবমানিত হইব? তুই তোর পিতার নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক দিবি?

ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণ-নয়নে সরযূ উত্তর করিলেন,—পিতঃ! আমি অবোধ, যদি আপনার নিকট কখন কোনও দোষ করিয়া থাকি, মার্জ্জনা করুন। কিন্তু জগদীশ্বর আমার সহায় হউন, আমা হইতে আপনার অবমাননা হইবে না।

এ কথার অর্থ তখন জনার্দ্দন বুঝিলেন না, এ কথার অর্থ তাহার পরদিন বৃদ্ধ বুঝিতে পারিলেন। বিবাহের দিন বিবাহের কন্যাকে কেহ দেখিতে পাইল না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

তীরে

দুঃখে সুখে খুল্লনা শরৎকাল ভাবে।
আশ্বিনে আসিবেন প্রভু দেবীর উৎসবে ॥
কার্ত্তিক মাসেতে হইল হিমের প্রকাশ।
গৃহে নাহি প্রাণনাথ করি বনবাস ॥

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

শরৎকালের প্রাতের কমনীয় আলোকে বেগবতী নীরানদী বহিয়া যতাইতেছে, সূর্য্যকিরণে জলের হিল্লোল হাস্য করিতে করিতে যাইতেছে। সেই সুন্দর নদীর উভয় পার্শ্বে সুন্দর শস্যক্ষেত্র বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে, কৃষকের পূজায় যেন সন্তুষ্ট হইয়া মেদিনী সে হরিৎ পরিচ্ছদে হাস্য করিতেছে। উত্তর ও পূর্ব্বদিকে সেইরূপ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র অথবা সুদূরে দুই একটি গ্রাম দৃষ্ট হইতেছে, দক্ষিণ ও পশ্চিমে পর্ব্বতরাশির পর পর্ব্বতরাশি বাল-সূর্য্যকিরণে অপরূপ শোভা ধারণ করিতেছে।

সেই নদীকূলে শ্যামলক্ষেত্রবেষ্টিত একটি সুন্দর গ্রাম সন্নিবেশিত ছিল। গ্রামের এক প্রান্তে একটি কৃষকের কুটীরের নিকট একটি বালিকা নদীকূলে খেলা করিতেছে, নিকটে একজন দাসী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কৃষকপত্নী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছে।

গৃহ দেখিলে কৃষককে সম্ভ্রান্ত বলিয়াই বোধ হয়। প্রাঙ্গণে দুই

একটি গোলাঘর রহিয়াছে, পার্শ্বে চারি পাঁচটি গরু বাঁধা রহিয়াছে, বাটীর ভিতর তিন চারিখানি ঘর, বাহিরে একখানি বড় ঘর। দেখিলেই বোধ হয়, গৃহস্বামী কৃষক হইলেও গ্রামের মধ্যে একজন মাতব্বর লোক, ব্যবসা ও মহাজনী-কার্য্যও কিছু কিছু করিয়া থাকে।

বালিকা সপ্তমবর্ষীয়া ও শ্যামবর্ণা, চঞ্চল, প্রফুল্ল ও উজ্জ্বলনয়না। একবার নদীকূলে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, একবার মাতা যে ঘরে রন্ধন করিতেছে, তথায় দৌড়াইয়া যাইতেছে, এক একবার দাসীর নিকট আসিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া কোন কথা কহিতেছে।

বালিকা বলিল,—দিদি, আয় না, কালুকের মত ঘাটে যাই, কাপড় দিয়া মাছ ধরিব।

দাসী। না দিদি, মা বারণ করেছেন, ঘাটে যেও না।

বালিকা। মা টের পাবে না।

দাসী। না ছি, মা যা বারণ করেন, তা করিতে নাই, মা'র কথা কি অন্যথা করে?

বালিকা। আচ্ছা দিদি, মা কি তোরও মা হয়?

দাসী। হয় বৈ কি।

বালিকা। না, সত্য করিয়া বল্।

দাসী। সত্যই মা হয়।

বালিকা। না দিদি, তুই যে রাজপুতের মেয়ে, আমরা ত রাজপুত নই।

দাসী বালিকাকে চুম্বন করিল; বলিল,—তবে জিজ্ঞাসা কর কেন?

বালিকা। জিজ্ঞাসা করি, তবে তুই মাকে মা বলিস্ কেন?

দাসী। যিনি আমাকে খাইতে পরিতে দিতেছেন, যিনি আমাকে থাকিবার স্থান দিয়াছেন, যিনি আমাকে মেয়ের মত লালন-পালন

করেন, তাঁকে মা বলিব না ত কি বলিব? এ জগতে আমার অন্য স্থান নাই, মা আমাকে জগতে স্থান দিয়াছেন।

বালিকা। ছি দিদি, তোর চক্ষে জল কেন, তুই কথায় কথায় কাঁদিস্ কেন দিদি?

দাসী। না দিদি, কাঁদিব কেন?

বালিকা। তোর চক্ষে জল দেখ্‌লে আমার চক্ষে জল আসে।

দাসী বালিকাকে পুনরায় চুম্বন করিয়া বলিল,—তুমি যে আমাকে ভালবাস।

বালিকা। আর তুই আমাকে ভালবাসিস্?

দাসী। বাসি বৈ কি।

বালিকা। বরাবর ভালবাস্‌বি, কখনও আমাকে ভুল্‌বিনি?

দাসী। না। আর তুমি দিদি, তুমি আমাকে ভালবাস্‌বে, কখনও ভুলবে না?

বালিকা। না।

দাসী। হাঁ, তুমি আমাকে একদিন ভুল্‌বে।

বালিকা। কবে?

দাসী। যবে তোমার বর আসিবে।

বালিকা। সে কবে?

দাসী। আর দুই এক বৎসরের মধ্যেই।

বালিকা। না দিদি, কখনও তোকে ভুলিব না, বরের চেয়ে তোকে অধিক ভালবাস্‌ব, আর তুই দিদি, তোর যখন বর আস্‌বে, তখন আমাকে ভুল্‌বি নি?

দাসীর চক্ষে পুনরায় জল আসিল, সে বলিল,—না, কখনও ভুলিব না।

বালিকা। বরের চেয়ে আমাকে অধিক ভালবাস্‌বি ?

দাসী হাস্য করিয়া বলিল,—সমান সমান।

বালিকা। তোমার বর কবে আস্‌বে দিদি ?

দাসী। ভগবান্ জানেন ছাড়, রান্নার বেলা হইয়াছে, আমি যাই।

পাঠককে বলা অনাবশ্যক যে, অনাথিনী সরযূবালা জগতে আর স্থান না পাইয়া একজন কৃষকের বাটীতে দাসীবৃত্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। কৃষকের কিছু সম্পত্তি ছিল, মহাজনী ছিল, নাম গোকর্ণনাথ। গোকর্ণের অন্তঃকরণ সরল ও স্নেহযুক্ত, নিরাশ্রয় রাজপুতকন্যাকে নিজের বাটীতে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিলেন। গোকর্ণের গৃহিণীও স্বামীর উপযুক্ত, নিরাশ্রয় ভদ্র রাজপুতকন্যাকে দেখিয়া অবধি নিজের কন্যার ন্যায় লালন-পালন করিতেন। সরযূও কৃতজ্ঞ হইয়া গোকর্ণ ও তাঁহার স্ত্রীর যথোচিত সমাদর করিতেন, নিজে দুই বেলা অন্ন প্রস্তুত করিতেন, বালিকার তত্ত্বাবধারণ করিতেন, সুতরাং কৃষক ও কৃষক-পত্নীর কার্য্যের অনেক লাঘব হইল, তাঁহারাও দিন দিন সরযূর উপর অধিক প্রসন্ন হইতে লাগিলেন।

রঘুনাথের অবর্ত্তমানে যদি সরযূর কোথাও সুখের সম্ভাবনা থাকিত, তবে উদারস্বভাব গোকর্ণনাথ ও তাঁহার সরলা গৃহিণীর বাটীতে থাকিয়া সরযূ পরম সুখলাভ করিতে পারিতেন। গোকর্ণের বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসর হইবে, কিন্তু চিরকাল নিয়মিত পরিশ্রম করিতেন বলিয়া এখনও শরীর সুবদ্ধ ও বলিষ্ঠ। গোকর্ণের একটি পুত্র শিবজীর সৈনিক, বহুদিন অবধি বাটী ত্যাগ করিয়াছে। শেষে যে একটি কন্যা হইয়াছিল, পিতামাতা উভয়েই তাহাকে ভালবাসিতেন। প্রাতঃকালে গোকর্ণ কৃষিকার্য্যে বা অন্য কার্য্যে বাহির হইয়া যাইতেন, সরযূ গৃহের সমস্ত

কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। গৃহিণী অনেক সময় বলিতেন,—বাছা, তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে, এরূপ পরিশ্রম করিলে তোমার শরীর থাকিবে কেন ? তোমায় করিতে হইবে না, আমিই করিব। সরযূ সস্নেহে উত্তর করিতেন,—মা, তুমি আমাকে যেরূপ যত্ন কর, তোমার কাজ করিতে পরিশ্রম হয় না, আমি জন্ম জন্ম তোমার সেবা করিব, তুমি আমাকে এইরূপ স্নেহ করিও। স্নেহবাক্যে সরল-স্বভাব বৃদ্ধা গৃহিণীর নয়নে জল আসিত, চক্ষুর জল মুছিয়া বলিতেন,—সরযূ ! বাছা, তোর মত মেয়ে আমি কখন দেখি নাই। তোর মত আমাদের জাতির একটি মেয়ে পাই, তবে আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিই। পুত্র অনেক দিন গৃহত্যাগ করিয়াছে, সে কথা স্মরণ করিয়া প্রাচীনা ক্ষণেক রোদন করিলেন।

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। একদিন সায়ংকালে গোকর্ণনাথ গৃহিণীর নিকট বসিয়া আছেন, এক প্রান্তে সরযূ বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, এরূপ সময়ে গোকর্ণ বলিলেন,—গৃহিণি, শান্ত হও, আজ সুসংবাদ আছে।

গৃহিণী। আহা, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, বাছা ভীমজীর কোন সংবাদ পাইয়াছ ?

গোকর্ণ। শীঘ্রই পাইব। পুত্র শিবজীর সহিত দিল্লী গিয়াছিল, অদ্য শুনিলাম, শিবজী দুষ্ট বাদশাহের হস্ত হইতে পলাইয়াছেন, দেশে আসিতেছেন। আমাদের ভীমজী অবশ্য তাঁহার সঙ্গে আসিবেন।

গৃহিণী। আহা ভগবান্ তাহাই করুন, প্রায় এক বৎসর হইল, বাছাকে না দেখিয়া যে মন কি অবস্থায় আছে, তাহা ভগবান্ই জানেন।

গোকর্ণ। ভীমজী অবশ্যই আসিবে, সে রঘুনাথজী হাবিলদারের অধীনে কার্য্য করিত, রঘুনাথজীরও সংবাদ পাইয়াছি।

সরযূর হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, উদ্বেগে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া তিনি

গোকর্ণের কথা শুনিতে লাগিলেন। গোকর্ণ বলিতে লাগিলেন,—যে দিন রঘুনাথকে বিদ্রোহী বলিয়া শিবজী দূর করিয়া দেন, সে দিন পুত্র আমাদের কি বলিয়াছিল, মনে আছে?

গৃহিণী। আমি মেয়েমানুষ, আমার কি অত মনে থাকে?

গোকর্ণ। পুত্র বলিয়াছিল,—পিতা, আমি হাবিলদারকে চিনি, তাঁহার ন্যায় বীর শিবজীর সৈন্যে আর নাই। কি ভ্রমে পতিত হইয়া রাজা তাঁহার অবমাননা করিলেন, পশ্চাৎ জানিবেন, তখন তিনি রঘুনাথের গুণ জানিতে পারিবেন। পুত্রের কথা এত দিনে সত্য হইল।

সরযূর হৃদয় উল্লাসে, উদ্বেগে দুরু দুরু করিতে লাগিল, তাঁহার মস্তক হইতে স্বেদবিন্দু বহির্গত হইতে লাগিল।

গোকর্ণনাথ বলিতে লাগিলেন,—রঘুনাথজী ছদ্মবেশে রাজার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী গিয়াছিলেন, আপন বুদ্ধিকৌশলে রাজাকে উদ্ধার করিয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে আপন নির্দোষিতা প্রমাণ করিয়াছেন। শুনিয়াছি, শিবজী রঘুনাথের নিকট আপন দোষের ক্ষমা চাহিয়াছেন, রঘুনাথকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন, হাবিলদারের পদ হইতে একেবারে পাঁচহাজারী করিয়া দিয়াছেন। সহরে অন্য কথা নাই, হাটে-বাজারে অন্য কথা নাই, গ্রামে অন্য কথা নাই, কেবল রঘুনাথের বীরত্ব-কথা শুনিয়া সকলে জয় জয় নাদে ধন্যবাদ দিতেছে।

আনন্দে, উল্লাসে সরযূ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

স্বপ্নদর্শন

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হইও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে, বাঁধিলাম প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া, একমন লইয়া, নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়া দেখিলাম, এ তিন ভুবনে, আর কেহ মোর আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে॥
এ-কুলে ও-কুলে গোকুলে দুকুলে, আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইলাম, ও দুটি কমল-পায়॥

চণ্ডিদাস।

সেই দিন অবধি সরযূর আকৃতি ফিরিল। বহু দিন পর আশা, আনন্দ ও উল্লাস আবার সেই হৃদয়ে স্থান পাইল। নয়ন দুইটি আবার হাসিল, ওষ্ঠ দুইটি আবার প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় পরিমল ধারণ করিল, ললাট ও সুন্দর গণ্ডস্থলে আবার লাবণ্য ফুটিল, রেশমবিনিন্দিত কেশ-গুলি আবার সেই সুন্দর, মধুময়, লাবণ্যময় মুখখানিকে লইয়া খেলা করিতে লাগিল। প্রাতঃকালের সুমন্দ সমীরণের সহিত দূরবৃক্ষ হইতে কোকিলের রব আসিলে সরযূ উল্লাসিত হৃদয়ে সেই রব শুনিতেন;

অপরাহ্ণে গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া নদীকূলে দণ্ডায়মান হইয়া নয়ন দুইটি সূর্য্য-উত্তাপ হইতে হস্ত দ্বারা আবরণ করিয়া নদীর অপর পার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত চাহিয়া থাকিতেন ; আবার সন্ধ্যার সময় দূরে বংশীধ্বনি হইলে চকিত মৃগের ন্যায় সহসা চমকিয়া উঠিতেন।

গোকর্ণের কন্যা পর্য্যন্ত সরযূর এই পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইল। এক-দিন সন্ধ্যার সময় নদীর ঘাটে যাইবার সময় কন্যা জিজ্ঞাসা করিল,—দিদি, দিন দিন তোর রূপ কেমন ফুটে বেরুচ্ছে।

সরযূ। কে বলিল ?

বালিকা। বলিবে কে ? আমি বুঝি দেখিতে পাই না ?

সরযূ। না, ও তোমার দেখিবার ভুল।

বালিকা। হাঁ ভুল বৈ কি ? আর আগে মাথায় কিছু থাকিত না, এখন মধ্যে মধ্যে চুলের ভিতর ফুল গোঁজা হয়, তা বুঝি আমি দেখিতে পাই না ?

সরযূ। দূর!

বালিকা। আর লুকাইয়া লুকাইয়া গলায় একটি কণ্ঠমালা পরা হয়, তাহাতে দুইটি করিয়া মুক্তা, একটি করিয়া পলা, তা বুঝি আমি দেখিতে পাই না ?

সরযূ। দূর!

বালিকা। আর নদীর তীরে অনেকক্ষণ ধরিয়া সুন্দর মুখখানি জলে দেখা হয়, তা বুঝি আমি দেখি না ?

সরযূ। মিথ্যা কথা বলিও না।

বালিকা। আর গাছতলায় লুকাইয়া মধ্যে মধ্যে কুহুস্বরে গান করা হয়, তাহা বুঝি আমি শুনি না ?

সরযূ এবার আসিয়া বালিকার মুখ চাপিয়া ধরিল।

বালিকা হাসিতে হাসিতে বলিল,—আমি এ সব কথা মাকে বলিয়া দিব।

সরযূ। না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, বলিও না।

বালিকা। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বলিবে?

সরযূ। বলিব।

বালিকা। এর অর্থ কি? এ পুষ্প, এ কণ্ঠমালা, এ গীত কাহার জন্য? তোর চক্ষু দুইটি যে সদাই হাসিতেছে, তোর ওষ্ঠ দুইটি যে রক্তে ফেটে পড়িতেছে, তোর সমস্ত শরীর যে লাবণ্যে চল চল করিতেছে, এ কাহার জন্য?

সরযূ। তোমার মা তোমার খোঁপা বাঁধিয়া দেন, গহনা পরাইয়া দেন, সে কাহার জন্য?

বালিকা আর একটু লজ্জিত হইল, বলিল,—মা বলিয়াছেন, আগামী বৎসর আমার বিবাহ হইবে, আমার বর আসিবে।

সরযূ। আমারও বর আসিবে।

বালিকা। সত্য?

সরযূর সহিত বালিকার কথা হইতেছিল, এরূপ সময় একজন দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী "হর হর মহাদেব" শব্দ উচ্চারণ করিয়া দ্বারে উপনীত হইলেন। সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে তাঁহার বিভূতি-ভূষিত দীর্ঘ শরীর বড় সুন্দর দেখাইল। বালিকা ভয়ে পলায়ন করিল, সরযূ তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসী সীতাপতি গোস্বামী!

সরযূর হৃদয় সহসা কম্পিত হইল, মনের আবেগে সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু সরযূ সে আবেগ সংযম করিয়া লজ্জা বা ভয় ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে সন্ন্যাসীর নিকট যাইয়া প্রণাম করিয়া স্থিরস্বরে বলিলেন,—প্রভু, আপনি যে অভাগিনীকে এক দিন জমাদ্দারের

প্রাসাদে দেখিয়াছিলেন, তাহাকে অদ্য এই কুটীরে দাসীকার্য্যে নিযুক্ত দেখিতেছেন। পিতা কলঙ্কিনী বলিয়া আমাকে দূরীকৃত করিয়াছেন, কিন্তু ভগবান্ জানেন, আমি বাগ্‌দত্ত পতির অনুচারিণী, ইহা ভিন্ন আমার অন্য দোষ নাই।

সন্ন্যাসীর নয়ন জলে পূর্ণ হইল, ধীরে ধীরে বলিলেন,—রঘুনাথের জন্য এত কষ্ট সহ্য করিয়াছ?

সরযূ। নারী যতদিন পতির নাম জপিতে পারে, ততদিন কষ্টকে কষ্ট বলিয়া বোধ করে না।

সন্ন্যাসীর বক্ষঃস্থল স্ফীত হইতে লাগিল।

সরযূ আবার বলিলেন,—প্রভুর সহিত কি সেই দেবপুরুষের সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

গোস্বামী। হইয়াছিল।

সরযূ। প্রভু তাঁহাকে দাসীর কথা জানাইয়াছিলেন?

গোস্বামী। জানাইয়াছিলাম।

সরযূ। কি জানাইয়াছিলেন?

গোস্বামী। আপনার একটি বাক্য, একটি অক্ষরও বিস্মৃত হই নাই। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম,—সরযূ রাজপুতবালা, জীবন অপেক্ষা যশ অধিক জ্ঞান করে। সরযূ যতদিন জীবিত থাকিবে, রঘুনাথকে কলঙ্কশূন্য বীর বলিয়া তাঁহারই যশোগীত গাইবে।

সরযূ। ভাল।

আমি তাঁহাকে আরও জানাইয়াছিলাম, যদি কর্ত্তব্যসাধনে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়, সরযূ তাঁহার যশোগীত গাইতে গাইতে উল্লাসে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে।

সরযূ। ভাল।

গোস্বামী। আমি আরও তাহাকে বলিয়াছিলাম যে, সরযূ তাহার উন্নত উদ্দেশ্য প্রতিরোধ করিবে না। রঘুনাথ অসিহস্তে যশের পথ পরিষ্কার করুন, যিনি জগতের আদিপুরুষ, তিনি তাহার সহায় হইবেন।

উদ্বেগ-গদ্‌গদস্বরে সরযূ জিজ্ঞাসা করিলেন,—তিনি কি উত্তর প্রদান করিয়াছেন?

জলন্ত-স্বরে গোস্বামী উত্তর করিলেন,—রঘুনাথ উত্তর দান করেন নাই, কেবল আপনার কথাগুলি হৃদয়ে ধারণ করিয়া অসাধ্যসাধন করিয়াছেন, অসিহস্তে যশের পথ পরিষ্কার করিয়াছেন।

সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে গোস্বামীর নয়ন ধক্-ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল, সেই নদীতীরে ও বৃক্ষমধ্যে গোস্বামীর জ্বলন্ত বাক্যগুলি বার বার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

"যিনি জগতের আদিপুরুষ, তাঁহাকে প্রণাম করি"—এই বলিয়া সরযূবালা আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়া যোড়করে প্রণাম করিলেন। গোস্বামীও জগতের আদিপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রণাম করিলেন।

অনেকক্ষণ উভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, সন্ধ্যার সুশীতল সমীরণে উভয়ের শরীর শীতল হইল, নয়নের জল শুকাইয়া গেল।

অনেকক্ষণ পর গোস্বামী কহিলেন,—দেবতার প্রসাদে কার্য্যসিদ্ধ করিবার পথ রঘুনাথ একটি কথা আমার দ্বারা আপনার নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছেন।

সরযূ উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে কি?

গোস্বামী। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এতদিন সরযূ তাঁহার দাসকে মনে রাখিবেন? আমি যাইলে সরযূ আমাকে চিনিতে পারিবেন?

সরযূ। এ জীবনে কি আমি তাঁহাকে ভুলিতে পারি?

গোস্বামী। আপনার ভালবাসা তিনি জানেন, তথাপি নারীর মন সর্ব্বদাই চপল, কি জানি, যদি ভুলিয়া গিয়া থাকেন।

গোস্বামীর চপলতা ও ঈষৎ হাস্য দেখিয়া সরযূ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন; বলিলেন,—নারীর মন চপল, তাহা আমি জানিতাম না।

গোস্বামী। আমিও জানিতাম না, কিন্তু অদ্য দেখিতেছি।

সরযূ। কিসে দেখিলেন?

গোস্বামী। যিনি আমার বাগ্‌দত্তা বধূ, তিনি আমাকে অদ্য ভুলিয়াছেন, দেখিয়াও আমাকে চিনিতে পারেন নাই।

সরযূ। সে কোন্ হতভাগিনী?

গোস্বামী। তিনি সেই ভাগ্যবতী, যাঁহাকে তোরণদুর্গে জনার্দ্দনের গৃহের ছাদে প্রথম দর্শন করিয়া আমি মন-প্রাণ হারাইয়াছিলাম; তিনি সেই ভাগ্যবতী, যাঁহার কণ্ঠে মুক্তামালা একদিন পরাইয়া দিয়া আমি জীবন চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলাম; তিনি সেই ভাগ্যবতী, যিনি তোরণদুর্গে জয়সিংহের শিবিরে, যুদ্ধের সময় ও সন্ধির সময়, সর্ব্বদাই আমার নয়নের মণির ন্যায় ছিলেন; তিনি সেই ভাগ্যবতী, যাঁহার দর্শন আমার নয়নে সূর্য্যালোক, যাঁহার শব্দ আমার কর্ণে সঙ্গীত, যাঁহার স্পর্শ আমার শরীরে চন্দন-প্রলেপ, যাঁহার প্রীতি আমার জীবনের জীবন! তিনি সেই ভাগ্যবতী, যাঁহার নাম স্মরণ করিয়া, যাঁহার জলন্ত উৎসাহবাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমি দিল্লীযাত্রা করিয়াছিলাম, যশের পথ পরিষ্কার করিয়াছি, অনন্ত বিপদ্‌সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছি। বহুদিন পর, বহু বিপদ পার হইয়া, অদ্য সেই ভাগ্যবতীর চরণোপান্তে উপস্থিত হইয়াছি, তিনি কি আজ চিনিতে পারিবেন?

সেই কোকিল-বিনিন্দিত স্বর সরযূর হৃদয় মন্থন করিল, তারকা-লোকে ছদ্মবেশধারী সেই দীর্ঘকায় পুরুষশ্রেষ্ঠকে সরযূ চিনিতে

পারিলেন। সরযূ হৃদয়ের আবেগ আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার মস্তক ঘুরিতেছিল, নয়ন মুদিত হইয়াছিল। "রঘুনাথ! ক্ষমা কর।"—এইমাত্র কহিয়া সরযূ রঘুনাথের দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন। পতনোন্মুখ প্রিয়তমা-দেহ রঘুনাথ নিজ অঙ্কে ধারণ করিলেন, সেই উদ্বেগপূর্ণ হৃদয় আপন হৃদয়ে স্থাপন করিলেন।

ক্ষণেক পর চৈতন্যলাভ করিয়া সরযূ নয়ন উন্মীলিত করিলেন। কি দেখিলেন? হৃদয়নাথ অভাগিনীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, চির-প্রার্থিত পতি আজ সরযূকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছেন!

বহুদিন পর আজ সরযূর তপ্ত হৃদয় রঘুনাথের প্রশান্ত হৃদয়-স্পর্শে শীতল হইল; সরযূর ঘনশ্বাস রঘুনাথের নিশ্বাসে মিশ্রিত হইল, সরযূর কম্পিত রক্তবর্ণ ওষ্ঠদ্বয় জীবনের মধ্যে প্রথমবার রঘুনাথের ওষ্ঠ স্পর্শ করিল।

সে সংস্পর্শে বালিকা শিহরিয়া উঠিল। সেই প্রিয় প্রগাঢ় আলিঙ্গনে সেই বারংবার ঘন চুম্বনে বালিকা কাঁপিতে লাগিল।

এ কি প্রকৃত, না স্বপ্ন?

বায়ুতাড়িত পত্রের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে সরযূ মনে মনে বলি-লেন,—জগদীশ্বর! এ যদি স্বপ্ন হয়, যেন এ সুখানন্দ হইতে কখনও জাগরিত না হই!

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জীবন-নির্ব্বাণ

হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুনহ রাজন্।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় অবশ্য ঘটন॥
ধর্ম্ম অনুসারে জয় ঈশ্বর বচন।

কাশীরাম দাস।

মহারাষ্ট্রদেশে মহাসমারোহ আরম্ভ হইল। শিবজী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, পুনরায় আরংজীবের সহিত যুদ্ধ করিবেন, ম্লেচ্ছদিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবেন, হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিবেন। নগরে, গ্রামে, পথে, ঘাটে এই জনরব হইতে লাগিল।

একদিকে রাজা জয়সিংহ বিজয়পুর নগর আক্রমণ করিয়াও সে স্থান হস্তগত করিতে পারিলেন না। তিনি বার বার দিল্লীর সম্রাটের নিকট সহায়তার জন্য যে আবেদন করিয়াছিলেন, তাহাও বিফল হইল, অবশেষে তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন যে, তাঁহার সৈন্যসমেত বিনাশ ভিন্ন আরংজীবের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। তখন তিনি বিজয়পুর পরিত্যাগ করিয়া আরঙ্গাবাদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শেষ পর্য্যন্ত আরংজীবের বিশ্বস্ত অনুচরের ন্যায় কার্য্য করিলেন; আরংজীব তাঁহার প্রতি অভদ্র আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও সম্রাটের কার্য্যে ঔদাস্য প্রকাশ করিলেন না। যখন নিশ্চয়

দেখিলেন, মহারাষ্ট্রদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, তখন পর্য্যন্ত যতদূর সাধ্য সম্রাটের ক্ষমতা-রক্ষার চেষ্টা করিলেন। লৌহগড়, সিংহগড়, পুরন্দর প্রভৃতি স্থানে সম্রাটের সেনা সন্নিবেশিত করিলেন, তদ্ভিন্ন যে যে দুর্গ অধিকারে রাখিবার সম্ভাবনা ছিল না, সে সমস্ত একেবারে চূর্ণ করিয়া দিলেন—যেন আর শত্রুরা ব্যবহার করিতে না পারে।

কিন্তু এ জগতে এরূপ বিশ্বস্ত কার্য্যের পুরস্কার নাই। জয়সিংহ অকৃতকার্য্য হইয়াছেন শুনিয়া আরংজীব যৎপরোনাস্তি রুষ্ট হইলেন, আরও অবমানিত করিবার জন্য তাঁহাকে দক্ষিণদেশের সেনাপতিত্ব হইতে অপসৃত করিয়া দিল্লীতে তলব করিলেন। যশোবন্তসিংহকে তাঁহার স্থলে পাঠাইয়া দিলেন।

বৃদ্ধ সেনাপতি আজীবন সাধ্যমতে দিল্লীর কার্য্যসাধন করিয়াছিলেন, শেষদশায় এ অবমাননায় তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইল, তিনি পথেই মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলেন।

অবমানিত, পীড়িত, বৃদ্ধ জয়সিংহ মৃত্যুশয্যায় শায়িত রহিয়াছেন, এরূপ সময় একজন দূত সংবাদ দিলেন, মহারাজ, একজন মহারাষ্ট্রীয় সেনানী আপনার দর্শনাভিলাষী, তিনি আপনার চরণোপান্তে বসিয়া একদিন উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর একবার উপদেশ পাইবার জন্য আসিয়াছেন।

রাজা উত্তর করিলেন,—সম্মানপূর্ব্বক লইয়া আইস। যে মহাপুরুষ আসিয়াছেন, আমি তাঁহাকে বিশেষরূপে জানি। তিনি আসুন, আমি তাঁহাকে নির্ভয় দিতেছি।

ক্ষণেক পর একজন মহারাষ্ট্র ছদ্মবেশে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা তাঁহার দিকে না চাহিয়াই বলিলেন,—সুস্বাগত শিবজী! মৃত্যুর

পূর্ব্বে আর একবার আপনার সহিত দেখা হইল, চরিতার্থ হইলাম। উঠিয়া অভ্যর্থনা করিবার ক্ষমতা নাই, দোষ গ্রহণ করিবেন না।

সজলনয়নে শিবজী বলিলেন,—পিতঃ! যখন শেষ আপনার নিকট বিদায় লইয়াছিলাম, তখন আপনাকে এত শীঘ্র এরূপ অবস্থায় দেখিব, কখনও মনে করি নাই।

জয়সিংহ। রাজন্! মনুষ্যদেহ ক্ষণভঙ্গুর, ইহাতে বিস্ময় কি? শিবজী, আমাদের শেষ যখন সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আপনি মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব দেখিয়াছিলেন, এখন কি দেখিতেছেন?

শিবজী। মহারাজ সেই সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, আপনাকে যখন এ অবস্থায় দেখিতেছি, তখন মোগল সাম্রাজ্যের আর আশা নাই।

জয়সিংহ। বৎস! তাহা নহে। রাজস্থানভূমি বীরপ্রসবিনী, জয়সিংহ মরিলে অন্য জয়সিংহ হইবে, জয়সিংহের ন্যায় শত যোদ্ধা এখনও বর্ত্তমান আছেন। মাদৃশ একজন লোকের মৃত্যুতে সাম্রাজ্যের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

শিবজী। আপনার অমঙ্গল অপেক্ষা সাম্রাজ্যের আর অধিক কি অনিষ্ট হইতে পারে।

জয়সিংহ। শিবজী! একজন যোদ্ধা যাইলে অন্য যোদ্ধা হয়, কিন্তু পাতকে যে ক্ষয়সাধন করে, তাহার পুনঃসংস্কার হয় না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, যথায় পাপ ও কপটাচারিতা, তথায় অবনতি ও মৃত্যু। এক্ষণে প্রত্যক্ষ তাহা অবলোকন করুন।

শিবজী। নিবেদন করুন।

জয়সিংহ। যখন আপনাকে আমি দিল্লী পাঠাইয়াছিলাম, তখন আপনার হৃদয়ও দিল্লীশ্বরের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল; আপনার স্থির

সক্ষম ছিল, দিল্লীশ্বর যত দিন আপনাকে বিশ্বাস করিবেন, আপনি তত দিন বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না। আপনার প্রতি সদাচরণ করিলে সম্রাটের দক্ষিণদেশে একজন পরাক্রান্ত বন্ধু থাকিত, কপটাচরণ বশতঃ সেই স্থানে একজন দুর্দ্দমনীয় শত্রু হইয়াছে।

শিবজী। মহারাজ! আপনার বুদ্ধি অসাধারণ ও বহুদূরদর্শী, জগতে সকলে যথার্থই জয়সিংহকে বিজ্ঞ বলিয়া জানে।

জয়সিংহ। আমি আরংজীবের পিতার সময় হইতে দিল্লীর কার্য্য করিয়াছি। বিপদে, যুদ্ধসময়ে, যতদূর সাধ্য দিল্লীশ্বরের উপকার করিয়াছি। স্বজাতি-বিজাতি বিবেচনা করি নাই, আত্ম-পর বিবেচনা করি নাই, যাঁহার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, জীবন পণ করিয়া তাঁহার কার্য্যসাধন করিয়াছি। বৃদ্ধকালে সম্রাট্ আমার প্রতি প্রথমে অসদাচরণ করিলেন, পরে অবমাননা করিলেন। তথাপি ঈশ্বরেচ্ছায় আমার কার্য্যে বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই, আমি যে সমস্ত সৈন্য প্রধান প্রধান দুর্গে রাখিয়া যাইলাম, শিবজী তাহারা বিনা যুদ্ধে আপনাকে দুর্গ হস্তগত করিতে দিবে না। কিন্তু এ আচরণে আরংজীব স্বয়ং ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। অম্বরাধিপেরা, দিল্লীশ্বরের চিরবিশ্বস্ত অনুচর ও সহায়, অম্বরের ভবিষ্যৎ রাজগণ দিল্লীর প্রধান শত্রু হইবে।

শিবজী। আপনি প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন। আরংজীব আপন অসদাচরণে অম্বর ও মহারাষ্ট্র এই দুইটি দেশকে তাঁহার শত্রু করিয়াছেন।

জয়সিংহ। দুইটি উদাহরণ দিলাম, মহারাষ্ট্রদেশ ও অম্বরদেশ। সমস্ত ভারতবর্ষ এইরূপ। শিবজী! আরংজীব সমস্ত ভারতবর্ষের বিশ্বস্ত অনুচরের অবমাননা করিতেছেন, মিত্রদিগকে শত্রু করিতেছেন, বারাণসী-মন্দির বিনষ্ট করিয়া তথায় মসজীদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন,

রাজস্থানে হিন্দুদিগের অবমাননা করিতেছেন, সর্ব্বদেশে হিন্দুদিগের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিতেছেন।

ক্ষণেক পরে নয়ন মুদিত করিয়া জয়সিংহ অতি গম্ভীরস্বরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, যেন মৃত্যুশয্যায় মহাত্মার দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইল, সেই চক্ষুতে ভবিষ্যৎ দেখিয়াই যেন রাজর্ষি কহিতে লাগিলেন,—শিবজী! আমি দেখিতেছি যে, এই কপটাচারিতায় চারিদিকে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইল, রাজস্থানে অনল জ্বলিল, মহারাষ্ট্রদেশে অনল জ্বলিল, পূর্ব্বদিকে অনল জ্বলিল! আরংজীব বিংশতি বৎসর যত্ন করিয়া সে অনল নির্ব্বাণ করিতে পারিলেন না; তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তাঁহার অসামান্য কৌশল, তাঁহার অসাধারণ সাহস ব্যর্থ হইল; বৃদ্ধবয়সে পশ্চাত্তাপ করিয়া দিল্লীশ্বর প্রাণত্যাগ করিলেন! অনল আরও প্রবলবেগে জ্বলিতেছে, চারিদিক্ হইতে ধূ ধূ শব্দে অগ্রসর হইতেছে, সেই অনলে মোগল সাম্রাজ্য দগ্ধ হইয়া গেল। তাহার পর? তাহার পর মহারাষ্ট্র জাতির নক্ষত্র উন্নতিশীল, মহারাষ্ট্রীয়গণ! অগ্রসর হও, দিল্লীর শূন্য সিংহাসনে উপবেশন কর!

রাজার বচনরোধ হইল। চিকিৎসকেরা পার্শ্বে ছিলেন, তাঁহারা নানারূপ সন্দেহ করিতে লাগিলেন, গোপনে অস্পষ্ট স্বরে রোগের প্রকৃত কারণ অনুভব করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পর মৃদুস্বরে জয়সিংহ বলিলেন,—কপটাচারী আপনাকেই শাস্তিদান করে, 'সত্যমেব জয়তি'।

শ্বাসরোধ হইল, শরীর হইতে প্রাণ বহির্গত হইল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত

ধনুর্দ্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি,
চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা—
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে।

মধুসূদন দত্ত।

রজনী এক প্রহরমাত্র আছে, এরূপ সময়ে শিবজী রাজপুত-শিবির ত্যাগ করিলেন। প্রাতঃকালের পূর্ব্বেই প্রধান প্রধান সেনানী ও অমাত্যদিগকে একত্র করিলেন, ক্ষণেক পরামর্শ করিলেন, পরে শিবিরের বাহিরে আসিয়া আপনার সমস্ত সৈন্য আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"বন্ধুগণ! প্রায় এক বৎসর হইল, আমরা আরংজীবের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলাম, আরংজীবের নিজের দোষে ও কপটাচারিতায় সে সন্ধি খণ্ডন হইয়াছে। অদ্য আমরা সে কপট আচরণের প্রতিশোধ দিব, মুসলমানদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিব।

"যিনি আরংজীবের প্রধান সেনাপতি ছিলেন, ঈশানীদেবী যাঁহার সহিত যুদ্ধ নিষেধ করিয়াছিলেন, যাঁহার নিকট শিবজী বিনাযুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন, কল্য নিশীথে সেই মহাত্মা রাজা জয়সিংহ আরংজীবের অসদাচরণে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছেন। সৈন্যগণ! দিল্লীতে আমার

কারারোধ, হিন্দুপ্রবর জয়সিংহের মৃত্যু, এ সমস্ত একণে আমরা পরিশোধ করিব।

"মৃত্যুশয্যায় রাজা জয়সিংহের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল, তিনি দেখিলেন, মোগলদিগের ভাগ্যনক্ষত্র অবনতিশীল, মহারাষ্ট্রদিগের ভাগ্যনক্ষত্র উন্নতিশীল, দিল্লীর সিংহাসন স্বরায় শূন্য! বন্ধুগণ! অগ্রসর হও, পৃথুরায়ের সিংহাসন আমরা অধিকার করিব।

"পূর্ব্বদিকে রক্তিমচ্ছটা দেখিতে পাইতেছ, ও প্রভাতের রক্তিমচ্ছটা। কিন্তু উহা আমাদের পক্ষে সামান্য প্রভাত নহে; মহারাষ্ট্রগণ! অদ্য আমাদের জীবন-প্রভাত।"

সমস্ত সেনানী ও সৈনিকগণ এই মহৎ বাক্য শুনিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল,—অদ্য আমাদের জীবন-প্রভাত।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিচার

পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইল উচিত।

কাশীরাম দাস।

সেই দিবস সন্ধ্যার সময় রঘুনাথ একাকী নদীতীরে পদচারণ করিতেছিলেন। আপনার পদোন্নতি, সরযূর সহিত পুনর্ম্মিলন, মুসলমানদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ, হিন্দুদিগের ভাবী স্বাধীনতা, এরূপ নূতন নূতন বিষয়ের চিন্তায় তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইতেছিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে একজন ডাকিলেন,—"রঘুনাথ!"

রঘুনাথ পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, চন্দ্ররাও জুমলাদার। রোষে তাঁহার শরীর কাঁপিতেছিল, কিন্তু ঈশানী-মন্দিরের প্রতিজ্ঞা তিনি বিস্মৃত হয়েন নাই।

চন্দ্ররাও বলিলেন,—রঘুনাথ! এ জগতে তোমার ও আমার উভয়ের স্থান নাই। একজন মরিব।

রঘুনাথ রোষ সম্বরণ করিয়া ধীরস্বরে বলিলেন,—চন্দ্ররাও! কপটাচারী মিত্রহন্তা চন্দ্ররাও! তোমার উপযুক্ত শাস্তি শিরশ্ছেদন, কিন্তু রঘুনাথ তোমাকে ক্ষমা করিলেন, জগদীশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।

চন্দ্ররাও। বালকের ক্ষমা গ্রহণ করা আমার অভ্যাস নাই। তোমার

আর অধিক জীবিত থাকিবার সময় নাই, মন দিয়া আমার কথাগুলি শুন। জন্ম অবধি তুমি আমার পরম শত্রু, আমিও তোমার পরম শত্রু। বাল্যকালে তোমাকে আমি বিষচক্ষুতে দেখিতাম, সহস্রবার প্রস্তরের উপর তোমার মস্তক আঘাত করিবার সংকল্প মনে উদয় হইয়াছে। তাহা করি নাই, কিন্তু তোমার বিষয় নাশ করিয়াছি, তোমাকে দেশত্যাগী করিয়াছি, তোমাকে বিদ্রোহী বলিয়া অপমানিত ও দূরীকৃত করিয়াছি। চন্দ্ররাওয়ের ভীষণ জিঘাংসা তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত হইয়াছিল। তোমার ভাগ্য মন্দ, পুনরায় উন্নত-পদ লাভ করিয়া সৈন্যমধ্যে আসিয়াছ। চন্দ্ররাওয়ের স্থিরপ্রতিজ্ঞা জীবনে কখনও নিষ্ফল হয় নাই, এখনও হইবে না। অন্য উপায় ত্যাগ করিলাম, এই অসি দ্বারা তোমার হৃদয় বিদ্ধ করিব, হৃদয়ের শোণিত পান করিয়া এ ভীষণ পিপাসা নির্ব্বাণ করিব। ভীরু! অদ্য আমার হস্তে রক্ষা নাই।

রোষে রঘুনাথের নয়ন অগ্নিবৎ জ্বলিতেছিল, কম্পিতস্বরে বলিলেন,—পামর! সম্মুখ হইতে দূর হ, নচেৎ আমি পবিত্র প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইব, তোর পাপের দণ্ড দিব।

চন্দ্ররাও। ভীরু! এখনও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ? তবে আরও শোন্! উজ্জয়িনীর যুদ্ধে যে তীরে তোর পিতার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল, সে শত্রু-নিক্ষিপ্ত নহে, চন্দ্ররাও তোর পিতৃহন্তা!

রঘুনাথ আর নয়নে কিছু দেখিতে পাইলেন না, কর্ণে শুনিতে পাইলেন না, রোষে অসি নিষ্কোষিত করিয়া চন্দ্ররাওকে আক্রমণ করিলেন। চন্দ্ররাও ক্ষীণহস্তে অসিধারণ করেন নাই, অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল, উভয়ের অসিতে উভয়ের ঢাল ক্ষত হইল, শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল, বর্ষার ধারার ন্যায় উভয়ের শরীর দিয়া রক্ত বহিতে লাগিল। চন্দ্ররাও বলে ন্যূন নহেন, কিন্তু রঘুনাথ দিল্লীতে চমৎকার অসিযুদ্ধ শিক্ষা

করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর তিনি চন্দ্ররাওকে পরাস্ত করিলেন, তাঁহাকে ভূমিতে পাতিত করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে জানুস্থাপন করিলেন, পরে বলিলেন,—পামর! অদ্য তোর পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত হইল, পিতার মৃত্যুর পরিশোধ হইল।

মৃত্যুর সময়েও চন্দ্ররাও নির্ভীক, তিনি বিকট হাস্য করিয়া বলিলেন,—আর তোর ভগিনী বিধবা হইল, সে চিন্তা করিয়া সুখে প্রাণবিসর্জ্জন করিব।

বিদ্যুতের ন্যায় সমস্ত কথা তখন রঘুনাথের মনে উপলব্ধি হইল। এই জন্য লক্ষ্মী স্বামীর নাম করেন নাই, এ জন্য চন্দ্ররাওয়ের অনিষ্ট না হয়, প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পিতৃহন্তা রক্তপিশাচ চন্দ্ররাও বলপূর্ব্বক প্রাণের লক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়াছে! রোষে রঘুনাথের নয়ন দিয়া অগ্নি বহির্গত হইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার উন্নত অসি চন্দ্ররাওয়ের হৃদয়ে স্থাপিত হইল না। তিনি ধীরে ধীরে চন্দ্ররাওকে ছাড়িয়া দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

উভয় যোদ্ধা পরস্পরের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া রোষে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। চন্দ্ররাও অসিযুদ্ধে পরাজিত হইয়া, ধূলি ও কর্দ্দমে ধূসরিত হইয়া বিকট অসুরের ন্যায় আরক্ত নয়নে রঘুনাথের দিকে চাহিতে লাগিলেন। রঘুনাথ পিতার হত্যা-কথা ও ভগিনীর অবমাননা-কথা স্মরণ করিয়া রোষে, অভিমানে ও জিঘাংসায় বিদগ্ধচেতা অথচ শাস্তিদানে অপারগ হইয়া চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। এমন সময়ে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে সহসা একজন যোদ্ধা নিষ্ক্রান্ত হইলেন। উভয়ে সভয়ে দেখিলেন,—শিবজী!

শিবজী কোন কথা কহিলেন না, কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। আপনার সহচর চারিজন সৈন্যকে ইঙ্গিত করিলেন। সেই চারিজন সৈনিক

নিস্তব্ধে চন্দ্ররাওয়ের নিকটে আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে অসি ও চর্ম্ম কাড়িয়া লইয়া, তাঁহার হস্তদ্বয় পশ্চাতে বদ্ধ করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া গেল। শিবজী অদৃশ্য হইলেন, রঘুনাথ চকিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

পরদিন প্রাতে চন্দ্ররাওয়ের বিচার। তিনি রঘুনাথের পিতাকে হনন করিয়াছিলেন, সে দোষের বিচার নহে; রঘুনাথকে কল্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে দোষের বিচার নহে। রুদ্রমণ্ডল-দুর্গ আক্রমণের পূর্ব্বে শত্রু রহমৎ খাঁকে চন্দ্ররাওই গুপ্ত সংবাদ দিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অদ্য তাহারই বিচার।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আফগান-সেনাপতি রহমৎ খাঁ রুদ্রমণ্ডলে বন্দী হইলে পর শিবজী তাঁহাকে ভদ্রাচরণ পূর্ব্বক ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, রহমৎ খাঁ স্বাধীনতা-প্রাপ্ত হইয়া আপন প্রভু বিজয়পুরের সুলতানের নিকট গমন করিয়াছিলেন। জয়সিংহ যখন বিজয়পুর আক্রমণ করেন, তখন রহমৎ খাঁ আপন নৈসর্গিক সাহসের সহিত যুদ্ধ করেন, একটি যুদ্ধে অতিশয় আহত হইয়া জয়সিংহের বন্দী হয়েন। জয়সিংহ তাঁহাকে আপন শিবিরে আনাইয়া অনেক যত্ন ও শুশ্রূষা করাইয়াছিলেন, কিন্তু সে রোগ আরাম হইল না, তাহাতেই রহমৎ খাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পূর্ব্বদিন জয়সিংহ রহমৎ খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—খাঁ সাহেব! আপনার আর অধিক পরমায়ু নাই, আমার সমস্ত যত্ন ও চিকিৎসা বৃথা হইল। এক্ষণে যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে, তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।

রহমৎ খাঁ বলিলেন,—আমার মরণের জন্য আক্ষেপ নাই, কিন্তু আপনি শত্রু হইয়া আমার প্রতি যেরূপ সদাচরণ করিয়াছেন, তাহার পরিশোধ করিতে পারিলাম না, এই আক্ষেপ রহিল। কি জিজ্ঞাসা করিবেন, করুন, আপনার নিকট আমার অবক্তব্য কিছুই নাই।

জয়সিংহ। রুদ্রমণ্ডল আক্রমণের পূর্ব্বে একজন শিবজীর সেনানী আপনাকে সংবাদ দিয়াছিল। সে কে, আমরা জানি না, আমার বোধ হয়, একজন অন্যায়রূপে দণ্ডিত হইয়াছে।

রহমৎ। আমি জীবিত থাকিতে সে নাম প্রকাশ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। রাজপুত! আপনার ভদ্রাচরণে আমি অতিশয় সম্মানিত হইয়াছি, কিন্তু পাঠান প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে অশক্ত।

জয়সিংহ। যোদ্ধা! আপনার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে আমি বলিতেছি না, কিন্তু যদি কোন নিদর্শন থাকে, তাহা আমাকে দিতে আপত্তি আছে?

রহমৎ। প্রতিজ্ঞা করুন, সে নিদর্শন আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে পাঠ করিবেন না।

জয়সিংহ তাহাই প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন রহমৎ খাঁ তাঁহাকে কতকগুলি কাগজ দিলেন। রহমতের মৃত্যুর পরে রাজা জয়সিংহ সেই সমস্ত পত্রাদি পাঠ করিয়া দেখিলেন, বিদ্রোহী চন্দ্ররাও!

চন্দ্ররাও রহমৎ খাঁকে স্বহস্তলিখিত পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা রাজা পড়িলেন, সে সম্বন্ধে অন্যান্য যে যে কাগজ ছিল, তাহাও পাঠ করিলেন, চন্দ্ররাও পাঠানদিগের নিকট যে পারিতোষিক পাইয়াছিলেন, তাহার প্রাপ্তিস্বীকার পর্য্যন্ত রাজা জয়সিংহ দেখিলেন। জয়সিংহের মৃত্যুর দিনে তাঁহার মন্ত্রী সেই সমস্ত কাগজ শিবজীকে দিয়াছিলেন।

বিচারকার্য্যে অধিক সময় আবশ্যক হইল না শিবজীর চিরবিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রী একে একে সেই পত্রগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন। যখন পাঠ সমাধা হইল, তখন রোষে সমস্ত সেনানীগণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। চন্দ্ররাও বিদ্রোহী, স্বয়ং শত্রুদিগকে সংবাদ

দিয়া পারিতোষিক গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দোষে নির্দোষী নিকলঙ্ক বীর রঘুনাথের প্রাণদণ্ডের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এ কথা সকলে জানিতে পারিয়া রোষে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন।

তখন শিবজী বলিলেন,—পাপাচারী বিদ্রোহী, তোর মৃত্যু সন্নিকট, তোর কিছু বলিবার আছে?

মৃত্যু সময়েও চন্দ্ররাও নির্ভীক, তাঁহার দুর্দ্দমনীয় দর্প অভিমান এখনও পূর্ব্ববৎ। বলিলেন,—আমি আর কি বলিব? আপনার বিচার-ক্ষমতা প্রসিদ্ধ! একদিন এই দোষে রঘুনাথকে দণ্ড দিয়াছিলেন, অদ্য আমাকে দণ্ড দিতেছেন, আমার মৃত্যুর পর আর একদিন আর একজনকে দণ্ড দিবেন, তখন জানিবেন, চন্দ্ররাও এ বিষয়ের বিন্দু-বিসর্গও জানে না, এ সমস্ত প্রমাণ জাল।

এই বিদ্রূপে শিবজী মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ করিলেন,—জল্লাদ, চন্দ্ররাওয়ের দুই হস্ত ছেদন কর, তাহা হইলে আর ঘুস লইতে পারিবে না। তাহার পর তপ্ত লৌহ দ্বারা ললাটে "বিশ্বাসঘাতক" অঙ্কিত করিয়া দাও, তাহা হইলে আর কেহ বিশ্বাস করিবে না।

জল্লাদ এই নৃশংস আদেশ পালন করিতে যাইতেছিল, এরূপ সময় রঘুনাথ দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন,—মহারাজ! আমার একটি নিবেদন আছে।

শিবজী। রঘুনাথ! এ বিষয়ে তোমার নিবেদন আমরা অবশ্য শুনিব; কেন না, এই পামর তোমার প্রাণনাশের যত্ন করিয়াছিল; তাহার কি প্রতিহিংসা লইতে ইচ্ছা কর, নিবেদন কর।

রঘুনাথ। মহারাজের অঙ্গীকার অলঙ্ঘ্য। আমি এই প্রতিহিংসা যাচ্ঞা করি যে, চন্দ্ররাওয়ের কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ না করে—অনুগ্রহ করিয়া বিনা দণ্ডে মুক্তি দিন।

সভাস্থ সকলে বিস্মিত ও স্তব্ধ।

শিবজী ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কহিলেন,—তোমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিল, তোমার অনুরোধে সে জন্য চন্দ্ররাওকে ক্ষমা করিলাম। রাজবিদ্রোহাচরণের শাস্তি দিবার অধিকারী রাজা। সে শাস্তির আদেশ করিয়াছি, জল্লাদ, আপন কার্য্য কর।

রঘুনাথ। মহারাজের বিচার অনিন্দনীয়, কিন্তু দাস প্রভুর নিকট ভিক্ষা চাহিতেছে, চন্দ্ররাওকে বিনা দণ্ডে মুক্তিদান করুন।

শিবজী। এ ভিক্ষাদানে আমি অসমর্থ, রঘুনাথ, তোমাকে এবার ক্ষমা করিলাম, অন্যকে এতদূর ক্ষমা করিতাম না। শিবজীর আদেশের উপর কথা কহিও না।

রঘুনাথ। প্রভু, দুই একটি যুদ্ধে এ দাস প্রভুর কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিল, প্রভুও অভিলষিত দাসকে পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। অদ্য সেই পুরস্কার চাহিতেছি, চন্দ্ররাওকে বিনা দণ্ডে মুক্ত করুন।

রোষে শিবজীর নয়ন হইতে অগ্নিকণা বাহির হইতেছিল। গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—রঘুনাথ! রঘুনাথ! কখন কখন আমাদের উপকার করিয়াছিলে বলিয়া অদ্য আমাদিগের বিচার অন্যথা করিতে চাহ? রাজ-আদেশ অন্যথা হয় না; তুমিও আপনার পদের কথা আপনি বলিতে ক্ষান্ত হও।

এ তিরস্কার-বাক্যে রঘুনাথের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি ধীরে ধীরে কম্পিতস্বরে উত্তর করিলেন,—প্রভু! পুরস্কার চাওয়া দাসের অভ্যাস নাই। অদ্য জীবনের মধ্যে প্রথমবার পুরস্কার চাহিয়াছি। প্রভু যদি এ পুরস্কার দানে অসম্মত হয়েন, এ দাস দ্বিতীয়বার চাহিবে না। দাসের কেবল এইমাত্র ভিক্ষা, প্রভু, সদয় হইয়া তাহাকে বিদায়

দিন, রঘুনাথ সৈনিকের ব্রত ত্যাগ করিবে, পুনরায় গোস্বামী হইয়া দেশে দেশে ভিক্ষা করিতে থাকিবে।

শিবজী ক্ষণেক নিস্তব্ধ ও নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। তখন একজন অমাত্য নিকটে আসিয়া কাণে কাণে জানাইল, চন্দ্ররাও রঘুনাথের ভগিনীপতি, সেই জন্য রঘুনাথ ভগিনীপতির প্রাণভিক্ষা করিতেছেন।

তখন বিস্ময়পূর্ণ হইয়া শিবজী চন্দ্ররাওকে খালাস দিবার আদেশ করিলেন। শেষে বজ্রনাদে বলিলেন,—যাও চন্দ্ররাও, শিবজীর রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হও। অন্য দেশে যাও, অন্য আত্মীয়-কুটুম্বকে বধ কর, অন্য মিত্রের সর্ব্বনাশ-সাধন কর, শত্রুর নিকটে উৎকোচ গ্রহণ, ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহাচরণ করিতে করিতে পাপ জীবনের অবশিষ্ট ভাগ সমাপ্ত কর।

চন্দ্ররাও ভীরু নহেন। ধীরে ধীরে ক্রোধ-জর্জ্জরিত শরীরে রঘুনাথের নিকট যাইয়া বলিলেন,—বালক! তোর দয়া আমি চাহি না, তোর দেওয়া জীবন আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি। পরক্ষণেই আপন ছুরিকা নিজ বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া অভিমানী ভীষণপ্রতিজ্ঞ চন্দ্ররাও জুমলা।ার আপনার চিরনিষ্কৃতি সাধন করিলেন। জীবনশূন্য দেহ সভাস্থলে পতিত হইল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ভ্রাতা-ভগিনী

সুত পরিবার, কেবা বল কার,
যেমত বৃক্ষের ছায়া।
জলবিম্ব-প্রায়, সব মিছামায়,
কেবল ভবের মায়া॥

কৃত্তিবাস ওঝা।

আমাদের আখ্যায়িকা শেষ হইয়াছে; এক্ষণে উপন্যাস-লিখিত ব্যক্তিদিগের বিষয়ে দুই একটি কথা বলিয়া বিদায় লইব।

বৃদ্ধ জনার্দ্দন পালিতকন্যাকে হারাইয়া বাতুলের ন্যায় হইয়াছিলেন, পুনরায় সরযূকে পাইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি পুলকিত হৃদয়ে রঘুনাথকে আহ্বান করিলেন, সানন্দহৃদয়ে শুভদিনে কন্যাদান করিলেন, সরযূর সুখ কে বর্ণনা করিবে? চারি বৎসর যে দেবকান্তির জপ করিয়াছিলেন, সেই পুরুষদেব যখন সরযূকে কোমল হৃদয়ে ধারণ করিলেন, সরযূর ওষ্ঠে যখন উষ্ণ ওষ্ঠ স্থাপন করিলেন, তখন সরযূ উন্মাদিনী হইলেন।

আর রঘুনাথ?—রঘুনাথ তোরণদুর্গে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা অদ্য সার্থক হইল। সেই প্রিয় কণ্ঠমালা বার বার সরযূর হৃদয়ে দোলাইয়া দিলেন, সেই পুষ্পবিনিন্দিত দেহ হৃদয়ে ধারণ

করিলেন, সেই বিশাল স্নেহপূর্ণ নয়নের দিকে চাহিয়া চাহিয়া জগৎ বিস্মৃত হইলেন।

সরযূ তাঁহার সপ্তমবর্ষীয়া "দিদি"কে বিস্মৃত হইলেন না। রঘুনাথের অনুরোধে শিবজী গোকর্ণকে একটি জায়গীর দান করিলেন ও গোকর্ণের পুত্র ভীমজীকে উন্নীত করিয়া হাবিলদার পদে নিযুক্ত করিলেন।

সরযূ দিদিকে সর্ব্বদাই আপন গৃহে রাখিতেন ও বরের সহিত "সমান সমান" ভালবাসিতেন, এবং কয়েক বৎসর পরে একটি সদ্বংশীয় সুচরিত্র পাত্র দেখিয়া দিদির বিবাহ দিলেন। বিবাহ দিবসে সরযূ ও রঘুনাথ স্বয়ং উপস্থিত রহিলেন। সরযূ কন্যার কাণে কাণে বলিলেন,—দেখিও দিদি! যাহা বলিয়াছিলে, সে কথা মনে রাখিও, বরের চেয়ে আমাকে ভালবাসিবে!

রঘুনাথ আখ্যায়িকাবিবৃত সময়ের পর ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত সুখ্যাতি ও সম্মানের সহিত শিবজীর অধীনে কার্য্য করিতে লাগিলেন। যশোবন্তসিংহ যখন জানিতে পারিলেন যে, রঘুনাথ তাঁহারই প্রিয় অনুচর গজপতিসিংহের পুত্র, তখন রঘুনাথকে স্বদেশে আহ্বান করিলেন। কিন্তু শিবজী রঘুনাথকে দেশে যাইতে দিলেন না, যত দিন জীবিত ছিলেন, রঘুনাথকে নিকটে রাখিলেন। পরে যখন ১৬৮০ খৃঃ অব্দের চৈত্রমাসে শিবজীর মৃত্যু হয়, তখন শিবজীর অযোগ্য পুত্র শম্ভুজী পিতার পুরাতন ভৃত্যদিগকে একে একে অপমানিত বা কারারুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ আর মহারাষ্ট্রে থাকিলে উপকার নাই দেখিয়া সরযূ ও জনার্দ্দনের সহিত স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সূর্য্য-মহলের পুরাতন দুর্গে তিলকসিংহের প্রপৌত্র প্রবেশ করিলেন।

পাঠক! ইচ্ছা, এই স্থানেই আপনার নিকট বিদায় লই, কিন্তু

আর একজনের কথা বলিতে বাকী আছে, শান্ত চিরসহিষ্ণু লক্ষ্মীরূপিণী লক্ষ্মীর কথা বলিতে বাকী আছে।

যে দিন চন্দ্ররাও আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, রঘুনাথ সেই দিনই ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইল। দেখিলেন, শবের পার্শ্বে লক্ষ্মী আলুলায়িত-কেশে গড়াগড়ি দিতেছেন, ঘন ঘন মোহ যাইতেছেন, সময়ে সময়ে হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদে ঘর পরিপূরিত করিতেছেন। হিন্দুরমণীর পতির মৃত্যুতে যে ভীষণ যাতনা হয়, কে বর্ণন করিতে পারে? অদ্য লক্ষ্মীর নয়নের আলোক নির্ব্বাণ হইয়াছে, হৃদয় শূন্য হইয়াছে, জগৎ অন্ধকারময় হইয়াছে! শোকে, বিষাদে, নৈরাশ্যে, নব-বৈধব্যের অসহ্য যাতনায় বিধবা ঘন ঘন আর্ত্তনাদ করিতেছে!

রঘুনাথ সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলেন, সান্ত্বনা দূরে থাকুক, লক্ষ্মী প্রাণের ভ্রাতাকে চিনিতেও পারিলেন না। ঝর ঝর করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে রঘুনাথ গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন।

সন্ধ্যার সময় রঘুনাথ পুনরায় ভগিনীকে দেখিতে আসিলেন, লক্ষ্মীর ভাবপরিবর্ত্তন দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন, লক্ষ্মীর নয়নে জল নাই, ধীরে ধীরে স্বামীর মৃতদেহ সুন্দর সুগন্ধ পুষ্প দিয়া সাজাইতে-ছেন। বালিকা যেরূপ মনোনিবেশ করিয়া পুত্তলী সাজায়, লক্ষ্মী সেইরূপ মনোনিবেশ পূর্ব্বক মৃতদেহ সাজাইতেছেন।

রঘুনাথ গৃহে আসিলে, লক্ষ্মী ধীরে ধীরে রঘুনাথের নিকটে আসিলেন, অতি মৃদুপদবিক্ষেপে আসিলেন, যেন শব্দ হইলে স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হইবে! অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—ভাই রঘুনাথ! তোমার সঙ্গে যে আর একবার দেখা হইল, আমার পরম ভাগ্য, এখন আর আমার মনে কোন কষ্ট থাকিল না।

সাশ্রুনয়নে রঘুনাথ বলিলেন.—প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মী, আমি তোমার সঙ্গে এ সময়ে দেখা না করিয়া কি থাকিতে পারি ?

লক্ষ্মী অঞ্চল দিয়া রঘুনাথের চক্ষের জল মোচন করিয়া বলিলেন,—সত্য ভাই, তোমার দয়ার শরীর, তুমি হৃদয়েশ্বরের জন্য রাজার নিকট যে আবেদন করিয়াছিলে, শুনিয়াছি। আমার ভাগ্যে যাহা ছিল, তাহা হইয়াছে, জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন।

রঘুনাথ। লক্ষ্মী। তুমি বুদ্ধিমতী আমি চিরকালই জানি, এ অসহ্য শোক কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়াছ দেখিয়া তুষ্ট হইলাম। মনুষ্যের জীবন শোকময়, তোমার কপালে যাহা ছিল ঘটিয়াছে, সে শোক সহিষ্ণু হইয়া বহন কর। আইস, আমার গৃহে আইস, ভ্রাতার ভালবাসা ভ্রাতার যত্নে যদি সন্তোষ দান করিতে পারে, লক্ষ্মী, আমি ত্রুটি করিব না!

লক্ষ্মী একটু হাসিলেন। সে হাস্য দেখিয়া রঘুনাথের প্রাণ শুকাইয়া গেল। ঈষৎ হাসিয়া লক্ষ্মী বলিলেন,—ভাই, তোমার দয়ার শরীর, কিন্তু লক্ষ্মীকে জগদীশ্বরই স্বয়ং সান্ত্বনা করিয়াছেন, শান্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, হৃদয়েশ্বর চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন, তিনি জীবদ্দশায় দাসীকে অতিশয় ভালবাসিতেন, দাসী জীবনে তাঁহার প্রণয়িনী ছিল, মরণে তাঁহার সঙ্গিনী হইবে।

রঘুনাথের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তখন তিনি লক্ষ্মীর ভাব-পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝিতে পারিলেন, লক্ষ্মীর শান্তভাবের হেতু বুঝিতে পারিলেন। লক্ষ্মী সহমরণে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছেন।

তখন রঘুনাথ অনেকক্ষণ অবধি লক্ষ্মীর প্রতিজ্ঞাভঙ্গের চেষ্টা করিলেন, অনেক বুঝাইলেন, অনেক ক্রন্দন করিলেন, এক প্রহর রজনী পর্য্যন্ত লক্ষ্মীর সহিত তর্ক করিলেন। ধীর, শান্ত লক্ষ্মীর

একই উত্তর,— হৃদয়েশ্বর আমাকে বড় ভালবাসিতেন, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।

অবশেষে রঘুনাথ সজলনয়নে বলিলেন,— লক্ষ্মী! একদিন আমার জীবন নৈরাশ্যে পূর্ণ হইয়াছিল, আমি জীবনত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। ভগিনী, তোমার প্রবোধে, তোমার স্নেহময় কথায় সে সঙ্কল্প ছাড়িলাম, পুনরায় কার্য্যজগতে প্রবেশ করিলাম। লক্ষ্মী, তুমি কি ভ্রাতার কথা রাখিবে না? তুমি কি ভ্রাতাকে ভালবাস না?

লক্ষ্মী পূর্ব্ববৎ শান্তভাবে উত্তর করিলেন,— ভাই, সে কথা আমি বিস্মৃত হই নাই, তুমি লক্ষ্মীকে ভালবাস, লক্ষ্মীর কথা শুনিয়াছিলে, তাহা বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, পুরুষের অনেক আশা, অনেক উদ্যম, অনেক অবলম্বন, একটি যাইলে অন্যটি থাকে, একটি চেষ্টা নিষ্ফল হইলে দ্বিতীয়টি সফল হয়। ভাই, তুমি সে দিন ভগিনীর কথা রাখিয়াছিলে, অদ্য তোমার কলঙ্ক দূরীভূত হইয়াছে, ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে, সুযশঃ দেশ-দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু অভাগিনী নারীর কি আছে? অদ্য আমি যে নয়নের মণিটি হারাইয়াছি, তাহা কি জীবনে আর পাইব? যে মহাত্মা দাসীকে এত ভালবাসিতেন, এত অনুগ্রহ করিতেন, জীবিত থাকিলে তাঁহাকে কি আর পাইব? ভাই! তুমি লক্ষ্মীকে বাল্যকাল হইতে বড় ভালবাসিয়াছ, অদ্য সদয় হও। লক্ষ্মীর একমাত্র সুখের পথে কণ্টক হইও না, যিনি দাসীকে এত ভালবাসিতেন, তাঁহার সহিত যাইতে দাও।

রঘুনাথ নিরস্ত হইলেন, স্নেহময়ী ভগিনীর অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া বালকের ন্যায় ঝর ঝর অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এ অসার কপট সংসারে ভ্রাতা-ভগিনীর অখণ্ডনীয় প্রণয়ের ন্যায় পবিত্র স্নিগ্ধ

প্রণয় আর কি আছে? স্নেহময়ী ভগিনীর ন্যায় অমূল্য রত্ন এ বিস্তীর্ণ জগতে আর কোথায় যাইলে পাইব?

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় চিতা প্রস্তুত হইল। চন্দ্ররাওয়ের শব তাহার উপর স্থাপিত হইল। হাস্যবদনা লক্ষ্মী সুন্দর পট্টবস্ত্র অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া একে একে সকলের নিকট বিদায় লইলেন।

লক্ষ্মী চিতাপার্শ্বে আসিলেন, দাসীদিগকে অলঙ্কার, রত্ন, মুক্তা বিতরণ করিতে লাগিলেন, স্বহস্তে তাহাদিগের নয়নের জল মোচন করিয়া মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। জ্ঞাতি-কুটুম্বিনীদিগের নিকট বিদায় লইলেন, গুরুদিগের পদধূলি লইলেন। সকলের নয়নের জল অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিলেন, মধুময় বাক্য দ্বারা সকলকে প্রবোধ দিলেন।

শেষে লক্ষ্মী রঘুনাথের নিকট আসিলেন, বলিলেন,—ভাই! বাল্য-কাল অবধি তোমার লক্ষ্মীকে বড় ভালবাসিতে, অদ্য লক্ষ্মী ভাগ্যবতী, অদ্য চিরসুখী হইবে, একবার ভালবাসার কাজ কর, সস্নেহে কনিষ্ঠ ভগিনীকে বিদায় দাও, তোমার লক্ষ্মীকে বিদায় দাও।

রঘুনাথ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, লক্ষ্মীর দুটি হাত ধরিয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। লক্ষ্মীরও চক্ষুতে জল আসিল।

সস্নেহে ভ্রাতার চক্ষুর জল মুছাইয়া লক্ষ্মী বলিতে লাগিলেন,—ছি ভাই, শুভকার্য্যে চক্ষুর জল ফেল কি জন্য? পিতার ন্যায় তোমার সাহস, পিতার ন্যায় তোমার মহৎ অন্তঃকরণ, জগদীশ্বর তোমার আরও সম্মান বৃদ্ধি করিবেন, জগৎ তোমার যশে পূর্ণ হইবে। লক্ষ্মীর শেষ বাসনা এই, জগদীশ্বর যেন রঘুনাথকে সুখে রাখেন। ভাই, বিদায় দাও, দাসীর জন্য স্বামী অপেক্ষা করিতেছেন।

কাতরস্বরে রঘুনাথ বলিলেন,—লক্ষ্মী, তোমা বিনা জগৎ তুচ্ছ জ্ঞান হইতেছে. জগতে আর রঘুনাথের কি আছে? প্রাণের লক্ষ্মী। তোকে কিরূপে বিদায় দিব, তোকে ছাড়িয়া আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব?—আর্ত্তনাদ করিয়া রঘুনাথ ভূমিতে পতিত হইলেন।

অনেক যত্ন করিয়া লক্ষ্মী রঘুনাথকে উঠাইলেন, পুনরায় চক্ষের জল মুছিয়া দিলেন। অনেক সান্ত্বনা করিলেন, অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন,—ভাই, তুমি বীরশ্রেষ্ঠ, পুরুষের যাহা ধর্ম্ম, তাহা তুমি পালন করিতেছ, তোমার লক্ষ্মীকে নারীর ধর্ম্ম পালন করিতে দাও। আর বিলম্ব করিও না, বাধা দিও না! ঐ দেখ, পূর্ব্বদিকে আকাশ রক্তবর্ণ হইয়াছে, তোমার লক্ষ্মীকে বিদায় দাও।

গদ্‌গদস্বরে রঘুনাথ বলিলেন,—লক্ষ্মী, প্রাণের লক্ষ্মী, এ জগতে তোমাকে বিদায় দিলাম, ঐ আকাশে, ঐ পুণ্যধামে আর একবার তোমাকে পাইব; সে পর্য্যন্ত জীবন্মৃত হইয়া রহিলাম।

ভ্রাতার চরণধূলি লইয়া লক্ষ্মী চিতাপার্শ্বে যাইলেন, স্বামীর পদদ্বয়ে মস্তক স্থাপন করিয়া বলিলেন,—হৃদয়েশ্বর! জীবনে তুমি দাসীকে বড় ভালবাসিতে, এখন অনুগ্রহ কর, যেন তোমার পদপ্রান্তে বসিয়া তোমার সঙ্গে যাইতে পারি। জন্ম জন্ম যেন তোমাকে স্বামী পাই, জন্ম জন্ম যেন লক্ষ্মী তোমার পদসেবা করিতে পায়।

ধীরে ধীরে লক্ষ্মী চিতা আরোহণ করিলেন; স্বামীর পদপ্রান্তে বসিলেন, পদদ্বয় ভক্তিভাবে অঙ্কের উপর উঠাইয়া লইলেন। নয়ন মুদিত করিলেন; বোধ হইল যেন, সেই মুহূর্ত্তেই লক্ষ্মীর আত্মা স্বর্গে প্রবেশ করিল।

অগ্নি জ্বলিল; অতিশয় ঘৃত থাকায় শীঘ্র অগ্নি ধূ ধূ শব্দে জ্বলিয়া উঠিল। প্রথমে অগ্নিজিহ্বা লক্ষ্মীর পবিত্র শরীর লেহন করিতে লাগিল, শীঘ্রই সতেজে চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া লক্ষ্মীর মস্তকের উপর উঠিল, নৈশ গগনের দিকে মহাশব্দে ধাবমান হইল। লক্ষ্মীর একটি অঙ্গ নড়িল না, একটি কেশ কম্পিত হইল না।

সম্পূর্ণ